একনায়ক অনেক নায়িকা

গী দে মোপাসাঁর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'বেল আমি'-র অনুবাদ।

ভাষান্তর

শ্রীইন্দুভূষণ দাস



জ্যোতি প্রকাশন

২-এ নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
২-এ, নবীন কুণ্ডু লেন,
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া, ১৩৪১

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্রীভারতী প্রেস
১১৪/১এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

দাম : দশ টাকা মাত্র

ভূমিকা

গী দে মোপাসাঁকে বাঙালী পাঠকদের কাছে নতুন করে পরিচিত করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনে, কারণ বাঙালী পাঠকসমাজ তাঁর নামের সঙ্গে অনেকদিন থেকেই পরিচিত। যাঁরা ইংরেজী ভাষা জানেন না অথবা ইংরেজী উপন্যাস ও গল্প পড়ে তার রসাস্বাদন করতে পারেন না, তাঁরাও মোপাসাঁর বিভিন্ন গল্পের এবং উপন্যাসের ভাষান্তর পড়ে তাঁর রচনাশৈলীর কিছুটা পরিচয় পেয়েছেন। ছোট গল্পে তাঁর জুড়ি নেই বললেই হয়। প্রকৃতপক্ষে ছোট গল্পের লেখক হিসেবেই সারা বিশ্বে মোপাসাঁর নাম এবং খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

মোপাসাঁর লেখার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। মাত্র তের বছরের সাহিত্য-জীবনে তিনি লিখে গেছেন প্রায় তিন'শ ছোট গল্প, ছ'খানা উপন্যাস, ছ'খানা নাটক এবং তিনখানা ভ্রমণ-কাহিনী। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সারা বিশ্বে যখন তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ বছর। যা তিনি লিখতেন তাই পাঠক-সমাজ নির্বিচারে গলাধঃকরণ করতো। শুধু তাই নয়, সে আমলের বহু অখ্যাত লেখক তাঁর গল্পাংশ চুরি করে নিজের নামে চালিয়ে দিয়ে খ্যাতি কুড়োবার চেষ্টাও করতো।

মোপাসাঁর গল্প আর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা প্রায় সবই ভ্রষ্ট-চরিত্র আর কামক্লিষ্ট। নর-নারীর জীবনের পাশবিক প্রবৃত্তির দিকটাই তিনি বেশি করে দেখিয়েছেন এবং নিপুন শিল্পীর মতো সেগুলোকে অঙ্কন করেছেন। কিন্তু তাঁর আঁকা চরিত্র-চিত্রগুলি মোটেই অবাস্তব ছিল না। তৎকালীন ফরাসী সমাজে কলুষিত চরিত্রের নর-নারীর সংখ্যা ছিল অনেক। সেই কলুষিত সমাজের মধ্যে বাস করে তাদের তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছেন বলেই তাঁর গল্প উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে পাঠকদের চোখে।

মোপাসাঁ নিজেও ছিলেন ভ্রষ্ট-চরিত্র এবং উচ্ছৃঙ্খল। গল্প লিখে তিনি যা আয় করতেন তার সবই তিনি ব্যয় করতেন ইন্দ্রিয়বিলাসে। শোনা যায় যে, তাঁর বার্ষিক আয় ছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার ফ্রাঁ। এই বিরাট আয় থেকে বছরে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ মাকে দিয়ে বাকি ত্রিশ হাজার ফ্রাঁ তিনি ব্যয় করতেন ইন্দ্রিয় সেবায়। শরীরের প্রতি এই রকম অত্যাচারের ফলে সাধারণত যা হয়ে থাকে মোপাসাঁরও তাই হয়েছিল। তিনি দুরারোগ্য যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। এবং পাগল অবস্থাতেই ফ্রান্সের এক পাগলা-গারদে মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মোপাসাঁর জন্ম হয় ফ্রান্সের নরম্যাণ্ডি অঞ্চলে রুঁয়ের নিকটবর্তী একটি গ্রামে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে। যে পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন সে পরিবার অভিজাত শ্রেণীর ছিল না। কিন্তু অভিজাত বংশের সন্তান না হয়েও তিনি তাঁর রচনার কল্যাণে অভিজাত শ্রেণীর নরনারীর সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। তৎকালীন বিখ্যাত সাহিত্যিকদের স্নেহ এবং প্রীতিও তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁর রচনা পড়ে তৎকালীন দিকপাল রুশ সাহিত্যিক লিও টলস্টয় লিখেছিলেন Maupassant is a man whose vision has penetrated the silent depths of the human life, and from that vantage ground interprets the struggle of humanity.

সুবিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক আনাতোল ফ্রাঁস মোপাসাঁর রচনাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন! তিনি লিখেছিলেন: Strength, flexibility, proportion nothing in lacking in this robust and masterly storyteller.

গল্প লিখতে গিয়ে মোপাসাঁ কখনো মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিয়ে মাথা ঘামাননি। তাঁর গল্পের গঠন ও প্রকৃতি ছিল ভিন্নতর। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছিলেন: For me psycholgy in a novel or story consists in this: to show the inner man by his life.

মোপাসাঁর গল্প ও উপন্যাস সম্বন্ধে এটিই হলো আসল কথা। ওতে পাত্র-পাত্রী অবশ্যই আছে, কিন্তু তাদের মনোবিশ্লেষণের চেষ্টা কোথাও নেই। পাত্র-পাত্রীদের তিনি পাঠকদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন নিতান্ত বাস্তবানুগ করে এবং তাদের চরিত্র বিশ্লেষণের ভার তিনি পাঠকদের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছেন। মোপাসাঁর সাহিত্যে এইটিই হলো বিশেষত্ব।

মোপাসাঁ যখন সবেমাত্র লেখায় হাত দিয়েছেন তখনই তিনি তৎকালীন বিখ্যাত সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ফ্লবেয়ার, জোলা, টুরগেনিভ এবং দদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওঁরা সবাই, বিশেষ করে ফ্লবেয়ার প্রথম থেকেই মোপাসাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ফ্লবেয়ারই ছিলেন মোপাসাঁর সাহিত্য-গুরু।

এবার 'বেল আমি'উপন্যাসটি সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার বোধ করছি। প্রত্যেক বিখ্যাত লেখকই তাঁর কোনো না কোনো উপন্যাসে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথা কিছুটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে লিখে থাকেন। উদাহরণ হিসেবে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাস-টির কথা বলা চলে। শ্রীকান্তর চরিত্রের সঙ্গে তার স্রষ্টার চরিত্রের যে অনেকাংশে মিল আছে তা শরৎ-সাহিত্যের সমালোচকরা একবাক্যে স্বীকার করে গেছেন। তেমনি'বেল আমি'উপন্যাসের বহু আলোচিত চরিত্র জর্জেস দুরায়ের মধ্যেও আমরা মোপাসাঁকে অনুভব করি। দুরয় জন্মগ্রহণ করে একটি অখ্যাত পরিবারে,মোপাসাঁও তাই। দুরয় তার পরবর্তী জীবনে সাংবাদিক হিসেবে উন্নতির চরম সীমায়

উঠেছিল এবং সাংবাদিক-খ্যাতি অর্জন করে প্যারীর অভিজাত সমাজে মেলামেশা করবার সুযোগ পেয়েছিল। মোপাসাঁ এখানে নিজেকে একটু ঘুরিয়ে প্রকাশ করেছেন। সংবাদপত্রে তিনিও প্রচুর গল্প লিখেছেন। সে সব লেখার পারিশ্রমিক হিসেবে তিনি প্রতি লাইনের জন্যে এক ফ্রাঁ হিসেবে নিতেন এবং ধারাবাহিক লেখার জন্যে নিতেন পাঁচ ফ্রাঁ। এখানেও ডুরয়ের সঙ্গে মোপাসাঁর মিল দেখতে পাই। আবার নিজে যখন বিরাট অঙ্কের টাকা আয় করেছেন তখন মাকে দিয়েছেন বছরে মাত্র পাঁচ হাজার ফ্রাঁ। এখানেও ডুরয়ের চরিত্রের সঙ্গে মোপাসাঁর মিল দেখতে পাওয়া যায়। মোপাসাঁ যেভাবে ইন্দ্রিয় সেবায় জীবন-যাপন করেছেন তাঁর সৃষ্ট জর্জেস ডুরয়ও তাই-ই করেছে।

যাই-হোক ডুরয়ের সঙ্গে মোপাসাঁর জীবনের মিল দেখানোই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। এটা প্রসঙ্গক্রমেই এসে পড়েছে। 'বেল আমি' উপন্যাসটি মোপাসাঁর বিরল সংখ্যক উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী রচনা এবং ফরাসী দেশের তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার ওপর এটি যেন তীব্র এক কশাঘাত। এদিক দিয়ে 'বেল আমি' সার্থক উপন্যাস।

সবশেষে বলতে চাইছি অনুবাদ সম্বন্ধে। প্রথমেই স্বীকার করে রাখছি যে, আমি ফরাসী ভাষা আদৌ জানি না। আমি অনুবাদ করেছি 'বেল আমি'-র ইংরেজী অনুবাদ থেকে। সুতরাং অনুবাদ থেকে পুনরায় অনুবাদ করলে মূল গ্রন্থের রস ও রচনাশৈলী ব্যত্যয় হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে ইংরেজী অনুবাদে আমি যা পেয়েছি তাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। সফল হয়েছি কিনা তা বিচারের ভার পাঠকদের ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি।

শ্রীইন্দুভূষণ দাস

এক নায়ক অনেক নায়িকা

বেল-আমি

॥ এক ॥

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলো জর্জেস দুরয়। কয়েক পা এগোবার পর কি মনে করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে কয়েকটা ফ্রাঁ বের করে আনলো। মোটে পাঁচ ফ্রাঁ। মাসের বাকী কটা দিনের জন্যে এই পাঁচটি ফ্রাঁ-ই মাত্র সম্বল রয়েছে দুরয়ের: মাস কাবার হতে এখনও পুরো সাতটি দিন বাকি। পাঁচ ফ্রাঁতে দুটো দিনও ভালভাবে চলবে না। বাকি পাঁচ দিন স্রেফ উপোষ!

হতাশায় ভেঙে পড়ে দুরয়। ফ্রাঁ ক'টাকে আবার পকেটে চালান করে দিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো পা চালাতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করতে থাকে ও। হাজারো চিন্তা। কি করে বাকি ক'টা দিন চালাবে সেই চিন্তায় মাথাটা গরম হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখন। রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। শত শত লোক চলাচল করছে রাস্তায়। তরুণ তরুণী, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া দোকানে অফিসে এবং কল-কারখানায় কাজ করা মেয়ে-পুরুষ, শিকার সন্ধানী রূপসী এবং আরও নানা শ্রেণীর নরনারী। কিন্তু তাদের দিকে তাকাবার মতো মনের অবস্থা নয় দুরয়ের। অন্যমনস্কভাবে সে এগিয়ে চলতে থাকে বুলভার্দ-এর দিকে।

অসহ্য গরম পড়েছে। গুমোট ভ্যাপসা গরম। হঠাৎ একটি মেয়ের পা মাড়িয়ে ফেলে দুরয়। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে মেয়েটি। দুরয়ের দিকে তাকিয়ে দুটো কড়া কথা বলতে গিয়ে কেন যেন থেমে যায় সে।

দুরয় ক্ষমা প্রার্থনা করে মেয়েটির কাছে। অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে—ক্ষমা করবেন। মেয়েটি ফিরে তাকায় ওর দিকে। মুখে তার মৃদু হাসির রেখা। যেন সে বলতে চায়—'এসো আমার সঙ্গে'! তার চাহনি আর মুখের নীরব ভাষার অর্থ বুঝতে দেরি হয় না দুরয়ের। শিকার-ধরা মেয়েদের সে দেখলেই চিনতে পারে। এ মেয়েটিও যে, তাদেরই একজন। মেয়েটির ভাল লেগেছে তাকে। ভাল লাগারই কথা, কারণ দুরয়ের চেহারাখানা সত্যিই ভাললাগবার মতো—যাকে বলে রমণী মনোলোভা।

হৃদয় কিন্তু মেয়েটির দিকে ফিরেও তাকায় না, পকেটের কথা মনে হতেই প্রেমের নেশা ছুটে পালিয়ে যায় তার মন থেকে। মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতে হলে পয়সা চাই। ট্যাকখালির জমিদার হয়ে প্রেম করা চলেনা এটা সে ভাল করেই জানে, এবং তা জানে বলেই গুটিগুটি পা চালিয়ে দেয় সে।

চলতে চলতে নানা কথা মনে হয় হৃদয়ের। মনে পড়ে বিগত দিনগুলির কথা। সৈনিকের খাতায় নাম লিখিয়ে আফ্রিকায় যুদ্ধ করতে গিয়েছিল সে। আফ্রিকার মরু অঞ্চলে কাটিয়ে আসা দিনগুলির কথা ঘন ঘন হঠাৎ তার মনের কোণে ভেসে ওঠে। কতদিন সে চাষীদের বাড়িতে ঢুকে জোর করে তাদের হাঁস-মুরগী নিয়ে এসেছে। আইনটা সেখানে ছিল রাইফেল আর তরোয়ালের যুগ। যা-খুশি তাই ওরা করতো—ভয়ে টুঁ শব্দটিও করতো না কেউ।

এখানে সে সব অচল। তাছাড়া আজ আর সে সৈনিক নয়। আজ সে রেলের একজন নিম্ন পদস্থ কেরানী। সামান্য ক'টা ক্রাঁর বিনিময়ে পরিশ্রম করবে ব্রিটেনে সে। আজ তার কর্মস্থল রেলের অফিস আর আবাসস্থল একটা ব্যারাকের চিলেকোঠা। কোঠা তো নয়, যেন পায়রার খোপ। মজুর শ্রেণীর মানুষদের জন্য তৈরী চারতলা ব্যারাক-বাড়ীর সবচেয়ে ওপরের তলায় সবচেয়ে ছোট ঘরটিতে বাস করে সে।

উনিশটি মজুর পরিবার বাস করে সেখানে। সে বাদে আর সবাই বিবাহিত। প্রত্যেকের ঘরে গড়পড়তায় একটা করে বউ আর গোটা তিনেক ছেলে মেয়ে। অভাবের মধ্যে যুদ্ধ করে দিন কাটে ওদের। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই ওখানে চিৎকার চেঁচামেচি লেগে আছে। মারধোরও চলে মাঝে মাঝে। মোটকথা, সে এক নারকীয় পরিবেশ।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে পথ চলেছে হৃদয়। হঠাৎ একটি সুবেশ যুবককে সামনের দিক থেকে আসতে দেখে ও। কাছে আসতেই যুবকটিকে চেনা চেনা মনে হয়। কিন্তু কোথায় তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে তা সে মনে করতে পারে না। যুবকটি পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

যুবকটি কয়েক গজ দূরে চলে গেছে তখন। এতক্ষণে হৃদয় চিনতে পারে তাকে। কী আশ্চর্য! ওযে আমাদের হয়েতিয়েচ্‌! এই রেজিমেণ্টের অধীনে এই কোম্পানীতে ওরা কাজ করতো আফ্রিকায়। কতদিন প্যারেড করেছে ওর সঙ্গে।

কথাটা মনে হতেই হৃদয় ছুটে যায় যুবকটির দিকে। কাছাকাছি এসে তার কাঁধে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

যুবকটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ডুরয়ের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে—একি ব্যাপার!

ডুরয় হাসিমুখে বলে—চিনতে পারছো না তো?

—না। কে আপনি?

—আমি জর্জেস ডুরয়। সেনাবাহিনীতে.........

আর কিছু বলার দরকার হয় না। যুবকটি এবার চিনতে পারে ডুরয়কে। সে তখন ডুরয়ের ডান হাতখানা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—কী আশ্চর্য! তুমি! তোমার সঙ্গে যে এইভাবে দেখা হয়ে যাবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি! তারপর, কেমন আছো বলো। করছো কি এখন?

—করছি যা হয় একটা কিছু। কিন্তু তোমার খবর কি? কি করছো এখন?

—আমি এখন লা ফ্রানচাইস পত্রিকায় চাকরি করছি।

—কি কাজ? কেরানীগিরি?

—না, আমি ওই পত্রিকার রাজনৈতিক সম্পাদক।

—বলো কি! তাহলে তো তুমি একজন কেউকেটা ব্যক্তি। পয়সা কড়িও ভালই পাচ্ছো নিশ্চয়?

—তা একরকম ভালই পাচ্ছি। কিন্তু মুস্কিলে পড়েছি আমার শরীরটাকে নিয়ে। দেশে ফিরবার সময় সেই যে ঠাণ্ডা লেগে কাশি হলো, সে কাশি আর গেল না। এখন একটু ঠাণ্ডা লাগলেই একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ি ডাক্তাররা হাওয়া বদল করতে বলছেন।

—তা যাওনা কেন?

—কি করে যাই বলো? একে খবরের কাগজের চাকরি, তার ওপর আবার আমি বিবাহিত। দু-দুটো অফিস ম্যানেজ করতেই জান্ শেষ। নিজের কথা ভাববার আর সময় কোথায়?

—বিয়ে করেছো কতদিন?

—বেশি দিন নয়।

—এখন কি হোম-অফিসের দিকেই চলছো নাকি?

—না, এখন যাচ্ছি পত্রিকার অফিসে। এখনই একটা লীডার লিখে দিয়ে আসতে হবে। তুমিও চলো না! যাবো আর আসবো।

—সে কি! লিখতে সময় লাগবে না?

—মোটেই না, কারণ লেখাটা আমি পকেটে করে নিয়েই চলেছি। কতদিন

পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলো। ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না। অফিস থেকে বেরিয়ে একটু পানানন্দ উপভোগ করা যাবে। মদ্যপানে নিশ্চয়ই তোমার অরুচি নেই?

ত্বরয়ের অ-রাজী হবার কোনো কারণই ছিল না। সে তাই আনন্দের সঙ্গেই রাজী হয়ে গেল বন্ধুর প্রস্তাবে।

দুই বন্ধুতে তখন হাতে হাত দিয়ে চলতে লাগলো ভায় ফ্রানচাইস পত্রিকার অফিসের দিকে। চলতে চলতে ফরেস্তিয়ের জিজ্ঞেস করলে—তুমি কি করছো বললে না তো?

—করছি ভাল কাজই, অর্থাৎ উপোষ মারছি!

—উপোষ মারছো মানে?

—মানে কিছু নেই। স্রেফ উপোষ! নর্দান রেলে একটা কাজ করি বটে, তবে সেখানে যা পাই তাতে মাসের বিশ দিনের খোরাকও জোটেনা।

—ও কাজ করে লাভ কি তাহলে?

—লাভ হলো তিন সপ্তাহের অন্নসংস্থান। ছেড়ে দিলে তো তাও বন্ধ। জানো ব্রাদার! আফ্রিকা থেকে ফিরে আসবার সময় ভেবেছিলাম, প্যারীতে এলে একটা ভাল কাজ নিশ্চয়ই জুটবে। কিন্তু কিছুই হলো না। অভাগা যেদিকে যায়, সাগর শুকায়ে যায়। শুকোবেই বা না কেন? সুপারিশ করবার মতো তো কেউ নেই আমার।

—এটা ভাই বাজে কথা! এখানে টাকা রোজগার করতে হলে সুপারিশের দরকার হয় না। এর জন্যে যা দরকার তা হলো স্বকীয় চেষ্টা আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। খবরের কাগজের সংশ্রবে থেকে আমি বুঝে নিয়েছি যে, টাকা রোজগার করতে হলে তেমন বিরাট রকমের পাণ্ডিত্য না হলেও চলে। চলনসই মতো লেখাপড়া আর সাধারণ মানুষদের চাইতে একটু বেশি বুদ্ধি থাকলেই এখানে মন্ত্রী পর্যন্ত হওয়া সম্ভব। তবে কিনা, নিজের পথটা নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়। সুপারিশের জোরে কেরানীর চাকরি হয়তো মেলে, কিন্তু তাতে জীবনে উন্নতি করা যায় না।

—তোমার মুখে একথা সাজে, কারণ তুমি এখন একটা নামকরা খবরের কাগজের রাজনৈতিক সম্পাদক—মানে, একজন হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তি। আর চেষ্টা করবার কথা বললে, চেষ্টা কি আমি কম করেছি। সত্যি কথা বলতে কি, এখনও আমি চেষ্টা করেই চলেছি।

বন্ধুর কথা শুনে মনে মনে দুঃখিত হলো ফরেস্তিয়ের। হঠাৎ তার মনে

পড়ে গেল যে, ডুরয় ভাল লেখাপড়া জানে। সে তাই ডুরয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো—তুমি তো গ্রাজুয়েট, তাই না ?

—না। দু'বার ফেল মেরে গ্রাজুয়েট আর হতে পারলাম কই ?

—তাতে কিছু আসবে যাবে না। গ্রাজুয়েট না হলেও কাজ চলবে। অভিজাত মহলে মেলামেশা করবার মতো শিক্ষা-দীক্ষা তোমার যথেষ্টই আছে।

—কি বলতে চাইছো তুমি ?

—আমি বলতে···

কথাটা শেষ করবার আগেই কাশি এসে গেল ফরেস্তিয়েরের। হঠাৎ খক্‌খক্ করে কাশতে শুরু করলো সে। সে কাশি আর থামতে চায় না। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো ফরেস্তিয়েরের।

মিনিট তিনেক পরে কাশির টানটা কমলো। কিন্তু কাশি থামলেও হাঁপানির টান থামলো না। হাঁপাতে হাঁপাতে ফরেস্তিয়ের বললে—এই কাশিই হয়েছে আমার যম। গরমের দিনেই এই, শীতের দিনে তো কথাই নেই। জানো ভাই, আমি বোধ হয় বেশি দিন বাঁচবো না।

—কি যা-তা বলছো ?

—যা তা নয় ভাই। সত্যি কথাই বলছি।

কথা বলতে বলতে পত্রিকা-অফিসের সামনে এসে হাজির হলো ওরা। ফরেস্তিয়ের বললে—ওসব কথা পরে বলা যাবে, অফিসে এসে গেছি। এবার ভেতরে চলো, কাজটা শেষ করে আসি।

—আমিও আসবো ?

—নিশ্চয়ই। পনের বিশ মিনিটের মধ্যেই কাজ সেরে ফিরে আসবো আমি। ততক্ষণ তুমি ওয়েটিং রুমে বসবে।

এই কথা বলেই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো ফরেস্তিয়ের। ভেতরে ঢুকে ডুরয়কে ওয়েটিং রুমে বসিয়ে সম্পাদকীয় দপ্তরের দিকে চলে গেল সে। ডুরয় একা একা ওয়েটিং রুমে বসে লোকজনের আনাগোনা লক্ষ্য করতে লাগলো।

'ভায় ফ্রানচাইস' প্যারীর খ্যাতনামা দৈনিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। পত্রিকার প্রচার সংখ্যাও যথেষ্ট। এহেন পত্রিকায় ফরেস্তিয়ের কি করে রাজনৈতিক সম্পাদক হবার সুযোগ পেলো তা সে ভেবেই উঠতে পারছে না। অতীত দিনের কথাগুলো মনে পড়ে গেল ডুরয়ের। সেনাবিভাগে কাজ করবার সময় ও ছিল নিতান্তই গো-বেচারা গোছের মানুষ।

কিন্তু সেদিনের সেই গো-বেচারা আজ প্যারীর অন্যতম বিখ্যাত দৈনিকের রাজনৈতিক সম্পাদক। মাত্র তিনটি বছর ওর সাথে ছাড়াছাড়ি ; কিন্তু এরই মধ্যে ও কেমন গুছিয়ে নিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথাটা মনে হয় দুরয়ের। নিজেকে সে তুলনা করে ফরেস্তিয়েরের সঙ্গে। ও আজ সৌভাগ্যের শীর্ষদেশে, কিন্তু আমি কোথায়!

নিজের কথা মনে হতেই হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে দুরয়। নিজেকে খুবই ছোট মনে হয় ফরেস্তিয়েরের কাছে।

মিনিট পনেরর মধ্যেই ফিরে এলো ফরেস্তিয়ের। তার সঙ্গে আরও একটি যুবক এসেছে। যুবকটির পরনে দামী পোশাক। তার সঙ্গে মিনিট দুয়েক কথাবার্তা বলে ফরেস্তিয়ের বিদায় চাইলো তার কাছে। দুরয় লক্ষ্য করলো, যুবকটিকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করছে ফরেস্তিয়ের।

যুবকটি চলে গেলে দুরয়কে নিয়ে আফিস থেকে বেরিয়ে পড়লো ফরেস্তিয়ের। চলতে চলতে দুরয় জিজ্ঞেস করলো—ভদ্রলোকটি কে, ভাই ?

—আমাদের সম্পাদক। বিখ্যাত সাংবাদিক। সপ্তায় মাত্র দুটি করে প্রবন্ধ লেখেন, তাতেই মাসে তিন হাজার ফ্রাঁ পান ইনি।

দুরয় বিস্মিত হয় ভদ্রলোকের আয়ের কথা শুনে।

সদর দরজার কাছে আসতেই আর একটি যুবকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের। তাকেও বেশ খাতির করে কথা বললো ফরেস্তিয়ের।

রাস্তায় এসে যুবকটির পরিচয় জানতে চাইলো দুরয়। ফরেস্তিয়ের বললে—ওঁর নাম নবার্ত দে ভার্ণে। সুবিখ্যাত কবি। প্রতিটি কবিতার জন্যে পারিশ্রমিক নেন তিনশ' ফ্রাঁ।

কথা বলতে বলতে একটা রেস্তোরাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলো ওরা। বেশ উঁচু দরের রেস্তোরাঁ। দুরয়কে সঙ্গে নিয়ে রেস্তোরাঁর ভেতর ঢুকে পড়লো ফরেস্তিয়ের। এক কোণে নিরালা দেখে একটা টেবিল পছন্দ করে সেখানেই বসে পড়লো দুজনে। বয়কে ডেকে দু গ্লাস ঠাণ্ডা বিয়ারের অর্ডার দিল ফরেস্তিয়ের।

একটু পরেই এসে গেল সফেন সোনালী বিয়ার। ফরেস্তিয়ের একটা গ্লাস তুলে নিয়ে এক চুমুকেই অর্ধেকের বেশি টেনে নিলো। দুরয় কিন্তু আস্তে আস্তে পান করতে লাগলো। পাছে ফুরিয়ে যায় সেই ভয়েই হয়তো।

হঠাৎ কি মনে করে ফরেস্তিয়ের বলে উঠলো—তুমি আমাদের লাইনে আসবে ?

—পারবো কি ?

—কেন পারবে না ? নিশ্চয় পারবে।

—কিন্তু লেখা-টেখা যে আমার হাতে একেবারেই আসে না।

—কে বললে আসে না ? আসলে তুমি চেষ্টা করোনি তাই ! লেখাটা এমন কিছু হাতী-ঘোড়া ব্যাপার নয়। একটু মক্‌সো করলেই ঠিক এসে যাবে। বলো তো কাল থেকেই লাগিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। প্রথম দিকে মাসে শ' দুয়েক হিসেবে পাবে, তাছাড়া বাইরে যেতে হলে ট্রাভেলিং অ্যালাউন্সও মিলবে। যদি রাজী থাকো তাহলে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলি।

দুরয়ের যা অবস্থা তাতে মাসিক দুশ' ফ্রাঁ আয় মানে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া। সে তাই তখুনি মনঃস্থির করে ফেললো। ফরেস্তিয়েরের দিকে তাকিয়ে সে বললে—তুমি যখন বলছো, তখন দেখাই যাক চেষ্টা করে।

—বেশ, তাহলে এই কথাই থাকলো। কালই আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক করে ফেলছি।

—আমাকে কি করতে হবে ?

—বিশেষ কিছু না। সপ্তাহে একটা করে প্রবন্ধ দিলেই চলবে। যুদ্ধের ব্যাপারটা তুমি ভাল বোঝো। সুতরাং যুদ্ধের ওপরেই প্রবন্ধ লিখো তুমি। হ্যাঁ, ভাল কথা। আগামী কাল আমার ওখানে এসো। সতের নম্বর রুয়ে দে কনস্টান্তিনোপল-এ থাকি আমি। আগামী কাল ছোট-খাটো একটা পার্টির আয়োজন করেছি। সস্ত্রীক ম্যানেজিং ডিরেক্টরও আসবেন। সামনা-সামনিই কথা হয়ে যাবে তখন।

বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারলে খুশিই হতো দুরয়, কিন্তু নিজের পোশাক-পরিচ্ছদের দৈন্যের কথা মনে করে সে ইতস্ততঃ করতে লাগলো।

তার ইতস্ততঃ ভাব দেখে ফরেস্তিয়ের বললে—কি হে! ভাবছো কি অতো ?

—না, ভাবছি না। কিন্তু আমার বোধহয় যাওয়া হয়ে উঠবে না।

—কেন বলো তো ? অন্যত্র এনগেজমেণ্ট আছে নাকি ?

—না।

—তবে ?

—পার্টিতে যাবার মতো ডিনার স্যুট আমার নেই।

—বলো কি বন্ধু! পার্টিতে বিছানা না থাকলে বরং চলে, কিন্তু ডিনার স্যুট না থাকলে চলে না।

—সে কথা আমিও জানি, কিন্তু তোমাকে তো বলেছি, রেল অফিসে যে বেতন পাই তাতে ঘরভাড়া দিয়ে সারা মাস খাওয়াই জোটে না।

দুরয়ের কথা শুনে দুঃখিত হলো ফরেস্তিয়ের। সে তখন পকেট থেকে দুটো লুই বের করে দুরয়ের হাতে দিয়ে বললো—তুমি আজই একটা ডিনার স্যুটের অর্ডার দিয়ে দাও। যে দোকানে অর্ডার দেবে সেখান থেকেই আগামী কালের জন্যে একটা ডিনার স্যুট ধার হিসেবে নিও।

লুই দুটোকে পকেটে রেখে দুরয় বললে—তোমার এ দয়ার কথা কোনোদিন ভুলবো না, ভাই।

—না না, দয়া কি বলছো? বন্ধুর বিপদে সামান্য সাহায্য করাকে কি কেউ দয়া বলে? যাই হোক, আর দু'গ্লাস নিই, কি বলো?

—তা নিতে পারো, যা গরম পড়েছে আজ!

পানপর্ব শেষ হলে ফরেস্তিয়ের বললে—চলো একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

—মন্দ কি! চলো না!

—কোন্ দিকে যাওয়া যায় বলো তো?

—ফলিজ বার্জার-এ গেলে কেমন হয়?

'ফলিজ বার্জার-এর নাম শুনে ফরেস্তিয়ের প্রথমটায় একটু ইতস্ততঃ করলেও শেষে বললে—বেশ, তাই চলো।

ফলিজ বার্জার-এ ঢুকতেই কর্তৃপক্ষের একজন এগিয়ে এসে সাদর সম্ভাষণ জানালো ফরেস্তিয়েরকে। বিশেষভাবে খাতির করে একটা বক্সে বসিয়ে দিল ওদের। খবরের কাগজের চাকরিতে এই হলো মজা। বিনে পয়সায় সবচেয়ে ভাল আর দামী আসনে বসতে পারে কাগজের লোকগুলো।

প্রেক্ষাগৃহ তখন লোকে লোকারণ্য। সারা প্যারী শহরের সৌখিন মানুষের দল এসে জুটেছে ওখানে। মেয়েও আছে অনেক, তবে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই দেহজীবিনী।

দুরয়ের দৃষ্টি ঘুরে ফিরে তাদের ওপরেই পড়ছে। একটি মেয়েকে দেখে ও আর চোখ ফেরাতে পারছে না। ওদের পাশের বক্সেই বসেছিল মেয়েটা। সামান্য একটু মোটা হলেও মেয়েটা দেখতে চমৎকার। গায়ে, ঠোঁটে অভিনেত্রীদের মতো পেন্ট করা। লিপষ্টিকের রঙে ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল। চোখ দুটিও বেশ টানা টানা। যাকে বলে পটল চেরা চোখ, তাই। মেয়েটির পরণে হালকা নীল রংয়ের সিল্কের পোষাক। বুকের ওপরের সুপুষ্ট স্তনদুটি

যেন পোষাকের আস্তরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। চেহারাটা তেমন কিছু-মারমার না হলেও কামোত্তেজনা জাগিয়ে তোলবার মতো যৌবনের জৌলুস আছে।

মেয়েটিও আড়চোখে তাকাচ্ছিলো দুরয়ের দিকে। তারপর পাশের মেয়েটার গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে সে বললে—পাশের বক্সের ওই ভদ্রলোকটিকে দেখেছিস? মাত্র দশ ফ্রাঁতে ওর সঙ্গে রাজী আছি আমি।

কথাগুলো যাতে দুরয় শুনতে পায় সেই উদ্দেশ্যে একটু জোরেই বললে মেয়েটি। ফরেস্তিয়ের এবং দুরয় উভয়েই শুনতে পেয়েছিল কথাগুলো। ফরেস্তিয়ের তাই দুরয়ের উরুতে একটা চড় মেরে বললে—তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি বন্ধু। ইচ্ছে হলে জুটে পড়তে পারো ওর সঙ্গে।

দুরয় মৃদু হেসে মন্তব্য করলো—ইচ্ছে থাকলেও সব সময় সব কাজ হয় না, বন্ধু।

একটু পরে ফরেস্তিয়ের বললে—চলো ভাই। বাগানের দিকে যাওয়া যাক।

—তা মন্দ নয়, চলো।

ওরা উঠে পড়তেই মেয়েটিও উঠে পড়লো।

দুই বন্ধুতে গিয়ে বসলো পানশালায়। একটু পরে সেই মেয়েটিও এসে ওদের পাশে বসে পড়লো। ফরেস্তিয়ের তার দিকে তাকাতেই সে অসংকোচে বলে উঠলো—আমি আপনার বন্ধুর প্রেমে পড়ে গেছি।

দুরয় হতবাক হয়ে গেল মেয়েটির প্রগলভতায়। তার মুখ দিয়ে একটা কথাও বের হলো না।

পানীয় সার্ভ করে গিয়েছিলো বয়। পানপাত্র শেষ করে ফরেস্তিয়ের বললে—তুমি বসো। আমি ভেতরে যাচ্ছি।

দুরয় বুঝতে পারলো যে, তাকে মেয়েটির কাছে রেখে যাবার জন্যই ফরেস্তিয়ের ভেতরে যেতে চাইছে। সে তাই লজ্জিত হয়ে বললে—না, না, আমিও ভেতরে যাবো।

এই বলে কোনোরকমে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে উঠে পড়লো দুরয়।

ভেতরে ঢুকে ফরেস্তিয়ের বললে—তোমার চেহারার সম্পদকে নষ্ট করো না বন্ধু। চেহারার দৌলতেই তুমি উন্নতি করতে পারবে, এটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

হৃদয় কোনো কথা বললে না। শুধু একটু মুচকি হাসলো।

একটু পরেই আবার ওরা ফিরে গেল ওদের বক্সে।

ঘণ্টাখানেক পরে ফরেস্তিয়ের বললে—এবার আমাকে উঠতে হবে। তুমি কি আর একটু বসবে?

হৃদয় বললে—আমি ভাবছি, শো-টা শেষ করেই যাবো। রাত এখনো খুব বেশি হয়নি।

—বেশ, তুমি তাহলে বসো। আমি উঠি।

ফরেস্তিয়ের বিদায় নিয়ে চলে গেল। তবে যাবার সময় আগামীকালের ডিনারের কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল হৃদয়কে।

ফরেস্তিয়ের চলে গেলে হৃদয় যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। পকেটে হাত দিয়ে লুই দুটো একবার অনুভব করে নিলো। তারপর মেয়েটির দিকে চোখের ইসারা করে উঠে পড়লো। মেয়েটিও এই রকমই চাইছিল। সেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লো।

ব্যালকনিতে এসে মেয়েটি মৃদুস্বরে বললে—আমার ঘরে চলুন।

হৃদয় বললে—আমার তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু আমার সম্বল মাত্র একটা লুই।

—ওতেই হবে, আসুন।

হৃদয়ের বাঁ হাতখানা টেনে বগলদাবা করে চলতে শুরু করলো মেয়েটি।

চলতে চলতে হৃদয় মনে মনে বললে—ডিনার সুটটা কালকের জন্ম ভাড়া নিলেই চলবে॥

॥ দুই ॥

পরদিন নির্দিষ্ট সময়েই দুরয় হাজির হলো সতের নম্বর রুয়ে দে কনস্তান্তি-নোপল-এর বাড়িখানার সামনে। এই বাড়িটাতেই বাস করে ফরেস্তিয়ের। বাড়ির দরজায় একজন দরোয়ান বসে ছিল। দুরয় তার কাছে ফরেস্তিয়েরের নাম করতেই সে সসম্ভ্রমে বললে—সোজা তিনতলায় উঠে যান। ওখানেই তিনি থাকেন।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠবার সময় দুরয়ের কেবলই মনে হতে লাগলো তার ভাড়া-করা ডিনার স্যুটটার কথা। মোটেই মানায়নি ওটা। এই পোষাকে কি কেউ পার্টিতে যায়! লোকে দেখলে মনে মনে হাসবে। অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকাবে তার দিকে।

একবার তার মনে হলো ফিরে যাবার কথা। এইরকম বে-মানান পোষাক পরে ভদ্রলোকের সমাজে না যাওয়াই ভাল। ফিরে যাবে বলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো দুরয়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো ফরেস্তিয়েরের কথাগুলো। লা ফ্রানচাইস পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর আসছেন। তাঁর সঙ্গে দুরয়ের পরিচয় করিয়ে দেবে ফরেস্তিয়ের। চাকরির ব্যবস্থাও করে দেবে। মাসে দু'শ ফ্রাঁ। অর্থাৎ রেলের চাকরিতে সে যা পায় তার প্রায় ডবল। এ কাজটা হলে সে বেঁচে যাবে স্থতরাং মন থেকে সমস্ত সংকোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার সে ওপরের দিকে পা বাড়ালো।

কয়েক ধাপ উঠবার পরেই একটি স্থবেশ ভদ্রলোককে নেমে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। ভদ্রলোক কিন্তু ফিরেও তাকালেন না তার দিকে। পাশ কাটিয়ে নেমে গেলেন। ভদ্রলোকটি নেমে যেতেই দুরয় আবার ওপরে উঠতে লাগলো।

একটু পরেই তিনতলায় উঠে এলো দুরয়। সিঁড়িটা যেখানে তিনতলার বারান্দায় এসে শেষ হয়েছে তার সামনেই সদর দরজা। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজার পাশে একটা কলিং বেল-এর বোতাম। দুরয় সেই বোতামটা টিপলো। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো একজন আর্দালি।

প্রচলিত প্রথা অনুসারে দুরয় তার টুপি আর ওভারকোট খুলে আর্দালিকে দিতে গেল। হঠাৎ তার নজর পড়লো আর্দালির পোশাকের দিকে। দুরয় লক্ষ্য করলো যে, তার পোষাকের চেয়ে আর্দালির পোষাক অনেক ভাল।

নিজের পোষাকের দৈন্যের জন্তে দুরয় লজ্জিত হলো। আর্দালির সামনে নিজেকে ছোট মনে হলো। আর্দালি তখন টুপি আর ওভারকোট নেবার জন্তে হাত বাড়িয়েছে, তাই বাধ্য হয়েই জিনিস দুটো তার হাতে সমর্পণ করতে হলো।

টুপি আর ওভারকোট যথাস্থানে রেখে আর্দালিটি সসম্ভ্রমে দুরয়কে ভেতরে যাবার পথ দেখিয়ে দিল। প্যারীর অভিজাত পরিবারে এই প্রথম ডিনার পার্টিতে এসেছে দুরয়। ফরেস্তিয়ের তার বন্ধু হলেও আজ সে অভিজাত শ্রেণীর একজন। তার মেলা-মেশা এখন হোমড়া-চোমড়াদের সঙ্গে। দুরয়ের কিন্তু ঠিক উলটো। কদর্য পরিবেশে বাস করে সে। আয়ও যৎসামান্য। ভাল পোষাক কিনবার তার সাধ্য নেই। সে তাই লজ্জায় আর সংকোচে কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে।

ভেতরে ঢুকতেই দেখা হলো একজন সুবেশ মহিলার সঙ্গে। দুরয় বুঝতে পারলো যে, এই মহিলাটিই এখানকার গৃহকর্ত্রী, অর্থাৎ মাদাম ফরেস্তিয়ের। কিন্তু তাকে দেখে বেচারার একেবারে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা! এরকম সুসজ্জিতা সুন্দরী নারীর সঙ্গে কি বলে আলাপ করা যায় তা সে বুঝেই উঠতে পারে না।

দুরয়ের এই রকম হতভম্ব ভাব দেখে মাদাম ফরেস্তিয়ের হাসিমুখে এগিয়ে এসে তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। দুরয় তার সঙ্গে করমর্দন করে সসঙ্কোচে বললে—আমি······

মুখে এক ঝলক হাসি এনে মাদাম ফরেস্তিয়ের বললে—আমি জানি। আপনার কথা গতকালই আমাকে বলেছে চার্লস। আপনি এসেছেন দেখে সত্যিই খুব খুশি হয়েছি আমি।

মাদাম এত কথা বললেও দুরয়ের মুখ থেকে কিন্তু কোনো কথাই বের হলো না। কি বলবে, অথবা কি বলা উচিত তা সে বুঝে উঠতে পারে না। নিজের পোষাকের দৈন্যের কথাই বারবার মনে হতে থাকে তার। কি বিশ্রী পোষাক! এ সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ দিতে পারলে সে যেন বেঁচে যায়!

দুরয়ের এই রকম বাক্যহারা অবস্থা দেখে মাদাম হাসিমুখে বললে—আসুন বসা যাক।

এই বলে একটা সোফা দেখিয়ে দিয়ে সে আবার বললে—ওই সোফাটায় বসুন।

—আপনি বসবেন না? এতক্ষণে বাক্যস্ফূর্তি হলো দুরয়ের।

—হ্যাঁ, আমিও বসছি। আপনি বসুন।

মাদামের নির্দেশমত ত্যুরয় উপবেশন করলো। মাদাম তখন তার সামনে একখানা চেয়ারে বসলো।

এতক্ষণে ত্যুরয়ের সাহস হলো মাদামের দিকে ভাল করে তাকাবার। হাল্‌কা নীল রঙের সিল্কের পোষাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে মাদামকে। নীল গাউনের সাদা লেসগুলো তার বাহুদ্বয় আর গলার নিচের বুকের ওপরে যেন সাদা মেঘের মায়াজাল সৃষ্টি করেছে নীল আকাশের বুকে। মসৃন সোনালী চুলগুলো ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসে ওর সুন্দর মুখখানাকে এক অজানা কুহেলীময় রহস্যে ঢেকে রেখেছে।

মাদামকে দেখে গতরাত্রের সেই মেয়েটার কথা মনে হলো ত্যুরয়ের। এইসময় মাদাম হঠাৎ তাকে প্রশ্ন করলো—প্যারীতে কতদিন আছেন আপনি?

মাদামের প্রশ্নে একটু নড়ে-চড়ে বসলো ত্যুরয়। বললে—বেশীদিন নয়, মাত্র কয়েকমাস হলো এখানে এসেছি। বর্তমানে নদার্ণ রেলওয়েতে চাকরি করছি। ফরেস্তিয়ের বলেছে, তার অফিসে আমাকে একটা সুযোগ করে দেবে।

একটা বিলোল কটাক্ষ হেনে মিষ্টি সুরে মাদাম বললে—আমি তা জানি।

এই সময় বাইরের ঘরে ভ্যালেট-এর ঘোষণা শুনা গেল—মাদাম দে মোরেল। ঘোষণা শুনেই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো মাদাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘর আলো করা রূপের ছটা বিকিরণ করে প্রবেশ করলো একটি যুবতী এবং একটি ছোট মেয়ে। ত্যুরয় বুঝতে পারলো এর কথাই ঘোষণা করেছে ভ্যালেট।

মাদাম ফরেস্তিয়ের হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে স্বাগত জানালো নবাগতা সুন্দরীকে। তারপর ছোট মেয়েটির হাত ধরে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বললে—এসো লরিন।

ত্যুরয়ের সঙ্গে নবাগতার পরিচয় করিয়ে দিলো মাদাম—আমার বান্ধবী ক্লোতিল্দে—আর ইনি হচ্ছেন মসিয়ে ত্যুরয়, আমার স্বামীর বন্ধু।

ত্যুরয় সোফা থেকে দাঁড়িয়ে উঠে মাথা নত করে অভিবাদন করলো মাদামকে মাদাম মোরেলকে। মাদাম মোরেল হাসিমুখে বললে—ভারী খুশি হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে।

এর পরেই এলেন ভায় ফ্রানচাইস পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মসিয়ে ওয়াল্টার এবং তার অর্ধাঙ্গিনী মাদাম ওয়ালটার

নাদুস নুদুস ভুঁড়িওয়ালা আধাবয়সী পুরুষের পাশে লাবণ্যময়ী তন্বী নারী।

দৃশ্যটা বড়ই বে-মানান লাগলো হুয়ের। হুজনের বয়সের ব্যবধানও অনেক বলে মনে হলো তার।

ওঁদের পরেই এলো মশিয়েঁ রিভাল এবং মশিয়ে ভার্ণে। এবং তাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলো মশিয়েঁ নবার্ত। নিমন্ত্রিত অতিথি আর কেউ ছিল না। ডিনারও তৈরী। কিন্তু তখনও ফয়েস্তিয়েরের দেখা নেই। সকালেই সে বেরিয়ে গেছে কি একটা বিশেষ কাজে। যাবার সময় স্ত্রীকে বলে গেছে, যথাসময়েই হাজির হবে সে। কিন্তু এখনও সে ফিরে না আসায় মাদাম ফয়েস্তিয়ের মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছে। কী ভাববেন এঁরা।

মশিয়েঁ ভার্ণে তো জিজ্ঞেস করেই বসলেন তার কথা। মশিয়ে ফরে-স্তিয়েরকে তো দেখছিনে।

তার প্রশ্নের উত্তরে মাদাম ফরেস্তিয়ের কৈফিয়তের সুরে বললে—তিনি একটা বিশেষ কাজে বাইরে গেছেন। এখুনি এসে পড়বেন।

মাদামের কথা শেষ হতে না হতেই ফরেস্তিয়ের এসে গেল। তারপর নিমন্ত্রিত অতিথিদের দিকে তাকিয়ে কৈফিয়ত দেবার সুরে বললে—একটা বিশেষ কাজে আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যেতে হয়েছিল। ভেবেছিলাম আপনারা আসার আগেই ফিরে আসতে পারবো। কিন্তু কাজটা শেষ করতে একটু দেরি হয়ে যাওয়ায় যথাসময়ে হাজির হতে পারিনি। আমার এই ত্রুটির জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

এরপর মাদামের দিকে তাকিয়ে সে বললে—ডিনারের কতদূর ?

মাদাম বললে—সব তৈরী। এখন বসলেই হয়।

ফরেস্তিয়ের তখন অতিথিদের দিকে তাকিয়ে বললে—তাহলে আর দেরি করে দরকার নেই। আসুন, একেবারে টেবিলে গিয়েই বসা যাক।

ডিনারের টেবিলে বসে হুরয় হঠাৎ দেখতে পেল যে, মাদাম মোরলে আর লরিনের মাঝখানে সে বসেছে। এর ফলে রীতিমত অস্বস্তি বোধ করলো সে। ডিনার টেবিলের নিয়ম-কানুন জানা নেই তার। ছুরি, কাঁটা-চামচে আর খাবার জিনিসগুলো নিয়েও ফ্যাসাদে পড়লো সে। সব সময় তার ভয় হতে থাকে, পাছে কোন রকম ভুল করে হাস্যাস্পদ হয়ে পড়ে।

সুপ খাওয়া পর্যন্ত নিঃশব্দেই চললো ভোজন পর্ব। এর পরেই শুরু হলো আলাপ আলোচনা। নানা বিষয় আলোচনা চলতে লাগলো ভোজ্যাদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত শুরু হলো পরের ঘরের কেচ্ছা সম্বন্ধে রসালো

আলোচনা। ছুরয় বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলো যে, কেচ্ছার আলোচনায় নারী পুরুষ উভয়েই সমান আগ্রহী। কুৎসা রটনার এবং নিন্দা শুনবার সুযোগ পেলে সবাই খুশি হয়। এ ব্যাপারে প্যারীর মানুষদের মধ্যে কোনই ভেদা-ভেদ নেই। বস্তীবাসী গরিব এবং প্রাসাদবাসী ধনী—সবাই এ ব্যাপারে সমান। সবাই কেচ্ছা শুনতে ভালবাসে। এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, মেয়েরাও এতে যোগ দিল। কোন্ মহিলা কার সঙ্গে কেলেঙ্কারী করেছে, কোন মেয়েকে নিয়ে কে যাচ্ছেতাই করে বেড়াচ্ছে—এইসব কথা রসালো ভাষায় আলোচিত হতে লাগলো ডিনার টেবিলে।

ডিনার টেবিলে বসলেই এবং বিশেষ করে প্যারীর বিখ্যাত সুরার কিছুটা পেটে পড়লেই দিল খুশ্ হয়ে যায় প্যারীর নরনারীর। এবং সেই খুশ্ দিল শেষ পর্যন্ত দরিয়া হয়ে প্রবাহিত হতে থাকে।

ছুরয়ের কিন্তু সাহস হলো না এসব আলোচনায় যোগ দিতে। বড় ঘরের নর-নারীর সঙ্গে তার আদৌ পরিচয় নেই, সুতরাং ইচ্ছা থাকলেও সে কিছু বলতে পারলো না। সে থাকে শ্রমিক ব্যারাকে। কেচ্ছা ও কেলেঙ্কারী সেখানে লেগেই আছে। কিন্তু সে সব কেচ্ছার কথা এখানে বলা চলে না। গরিব ছোটলোকদের পারিবারিক কেলেঙ্কারী শুনবার জন্যে অভিজাত শ্রেণীর মানুষদের মোটেই আগ্রহ নেই। সে তাই মুখে হাসির পলেস্তারা মাখিয়ে এমন একটা ভাব দেখাতে চেষ্টা করলো যে, এ সব কথা আগে থেকেই জানা আছে তার।

মাঝে মাঝে তার সাধ হচ্ছিলো মহিলাদের সঙ্গে, বিশেষ করে তার পার্শ্ব-বর্তিনী মাদাম মোরেলের সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু কোথা থেকে একটা সঙ্কোচের জড়তা এসে তাকে বাধা দিচ্ছিল। সে তাই চোরা চাহনির মাধ্যমে মেয়েদের সৌন্দর্য উপভোগ করা ছাড়া আর কিছু করতে পারছিল না।

মাদাম দে মোরেলকেই সবচেয়ে বেশি ভাল লেগেছিল তার। কী সুন্দর মুখখানা মাদামের। বুকটাও কেমন উন্নত! এ জিনিসকে যে ব্যক্তি ভোগ করে তার মতো ভাগ্যবান পুরুষ কমই আছে।

ডাইনিং হল-এ যেন খুশির জোয়ার শুরু হয়েছে। গল্পগুজবের সঙ্গে চলছে আহার এবং মদ্যপান। দামী মদ পরিবেশন করা হচ্ছে। এ রকম ভাল মদ অনেকদিন ছুরয়ের ভাগ্যে জোটে নি। সে তাই প্রাণভরে পান করে নিচ্ছে।

পর পর কয়েক পাত্র টেনে নেবার পর তুরয়ের সঙ্কুচিত দিল্‌টা খোলাসা হয়ে গেল। নেশার একটা বড় গুণ এই যে, এর ফলে মানুষ তার অবস্থার কথা সাময়িকভাবে ভুলে যায়। তুরয়ও ভুলে গেল নিজের অবস্থার কথা। পোষাকের দৈন্তের কথাও মনে থাকলো না তার।

এদিকে আলাপ আলোচনার ধারা তখন পাল্‌টে গেছে। কেচ্ছা শেষ হয়ে এবার চলছে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা। একটু পরেই আলোচনাটি ইউরোপ ছেড়ে আফ্রিকায় গিয়ে হাজির হলো।

আফ্রিকায় ফরাসীদের বিরাট হোল্‌ড। উত্তর আফ্রিকার বহু অঞ্চল ওদের কুক্ষিগত। এবং সে সব অঞ্চলের ওপর থেকে ওদের থাবা এতটুকুও শিথিল করতে ওরা রাজী নয়।

আফ্রিকা মহাদেশটা হলো মরুভূমি আর অরণ্যের দেশ। ভাল জমির ওখানে যথেষ্ট অভাব। যেটুকু আছে তাও দখল করে রয়েছে ইউরোপের লোকেরা। আদিবাসীদের বনে জঙ্গলে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের সব জমি ওরা দখল করে বসে আছে। ফরাসীদের অধিকৃত জমিও কম নয়। তাই কথা প্রসঙ্গে মশিয়েঁ রিভাল মন্তব্য করলেন—আফ্রিকায় এখন দরকার হচ্ছে সামরিক গভর্ণমেণ্টের। আমাদের অধিকার চিরস্থায়ী করবার জন্তেই এটা দরকার। এবং এর জন্তে প্রয়োজন হলো, প্রত্যেক সামরিক কর্মচারি রিটায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে ওখানে তাদের যথেষ্ট পরিমাণ জমি দেবার যাতে, তারা ওখানে উপনিবেশ গড়ে তুলতে পারে। এটা করা হলে, ওই সব সামরিক কর্মচারি ধীরে ধীরে স্থানীয় লোকদের ওপরে প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারবে।

এই সময় তুরয় হঠাৎ বলে উঠলো—হ্যাঁ, তা হয়তো পারবে, কিন্তু যেমন জমি তেমনিই পড়ে থাকবে। সামরিক কর্মচারিদের দিয়ে শাসন করা চলে, কিন্তু চাষ-আবাদ চলে না। আমাদের যদি ওখানে সত্যিই উপনিবেশ গড়ে তুলতে হয় তাহলে সবচেয়ে আগে দরকার হলো চাষী শ্রেণীর মানুষদের ওখানে বসবাস করবার সুযোগ দেওয়া। আফ্রিকায় গিয়ে বসবাস করবার জন্তে বর্তমানে যে বাধা-নিষেধ আছে তা যদি তুলে দেওয়া যায় তাহলে সুযোগসন্ধানীর দল ঠিক ওখানে গিয়ে শিকড় গেড়ে বসবে। আমার মতে, ওখানে জমিদারি প্রথা চালু করেই কাজ শুরু করতে হবে আমাদের।

তুরয়ের মুখ থেকে রাজনীতির কথা শুনতে পেয়ে সবাই তার দিকে তাকালো। প্রত্যেকেরই মনে হলো যে, তুরয়ের কথাই ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে

তাদের আরও মনে হলো যে, তুরয়ের রাজনীতি-জ্ঞান কারো চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

তুরয়ের কথা কিন্তু তখনও শেষ হয়নি। সে তখনো তার আগের কথার জের টেনে বলে চলেছে—আফ্রিকার আসল সমস্যাই হলো জমির সমস্যা। ভাল জমির ওখানে খুবই অভাব। আফ্রিকার সবটুকু উর্বরা জমিই রয়েছে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষদের দখলে। তারা ওখানে উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। ওই সব উপনিবেশের জমির দরও আমাদের দেশের চাইতে কম নয়। ওখানকার আদিম অধিবাসীদের বনে জঙ্গলে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের সব জমি ওরা দখল করে বসে আছে। বাদ বাকি যে ভূখণ্ড পড়ে আছে তার বেশিরভাগই মরুভূমি আর গহন অরণ্য। মরু অঞ্চলে জমির অভাবে কিছুই করা যায় না। আবার বনাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেও লাভ নেই।

তুরয়ের কথা শুনে সবাই বিস্মিত হলো। মশিয়েঁ ওয়াল্টার আর চুপ করে থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন—আলজিয়ার্স সম্বন্ধে কিছু জানা আছে কি আপনার?

—আছে বৈ কি। ওখানে প্রায় আড়াই বছর ছিলাম আমি। মরোক্কো, আলজিরিয়া, টিউনিস—সব জায়গাতেই আমি গিয়েছি।

—দয়া করে ওখানকার সম্বন্ধে কিছু বলুন না! বললে মশিয়েঁ ভার্সে।

এখন আর তুরয়ের মনে কোনো রকম জড়তা নেই। মদের কল্যাণে জড়তা কেটে গেছে তার। তাছাড়া সবাই তার কথা শুনতে চাইছে দেখে মনে মনে একটু গর্বও অনুভব করছে সে। মেয়েদের দৃষ্টিও তখন তার দিকেই নিবদ্ধ।

এ সুযোগ নষ্ট হতে দিল না তুরয়। মেয়েদের কাছে নিজেকে প্রচার করবার সুযোগ পুরুষরা সহজে ছাড়তে চায় না। তুরয়ও তাই ফরাসী অধিকৃত আফ্রিকার অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা রূপে-রসে সঞ্জীবিত করে পরিবেশন করতে লাগলো।

তুরয়ের কথা শেষ হলে মাদাম ওয়াল্টার তার দিকে তাকিয়ে বললে—আফ্রিকার ওপরে আপনি তো বেশ কয়েকটা প্রবন্ধ লিখতে পারেন।

মশিয়েঁ ওয়াল্টারও সমর্থন করলো স্ত্রীর প্রস্তাবটা। সে বললে—মাদাম ঠিকই বলেছেন। আপনি যদি আফ্রিকার ওপরে প্রবন্ধ লেখেন, সেগুলো আমি আমার পত্রিকায় প্রকাশ করতে রাজী আছি।

ফরেস্তিয়ের এ সুযোগ নষ্ট হতে দিল না। মশিয়েঁ ওয়াল্টারের দিকে তাকিয়ে

সে বললে—এর কথাই আমি আজ সকালে আপনাকে বলেছিলাম স্যার। আমার মনে হয় রাজনৈতিক সংবাদ বিভাগে একে নিলে ভাল কাজ পাওয়া যাবে।

ফরেস্তিয়েরের কথায় সঙ্গে সঙ্গে কাজ হলো। মশিয়ে ওয়াল্টার বললে—ঠিকই বলেছেন। রাজনীতি সম্বন্ধে, বিশেষ করে আফ্রিকার রাজনীতি সম্বন্ধে ওঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে দেখছি। ঠিক আছে, ওঁকে আগামী কাল বিকেলে আমার কাছে নিয়ে আসুন।

এরপর দুরয়ের দিকে তাকিয়ে বললে—আসবার সময় আলজিয়ার্সের ওপরে একটা প্রবন্ধ লিখে আনতে পারলে ভাল হয়। লেখাটাকে বেশ কায়দা করে টেনে নিয়ে আমাদের ঔপনিবেশিক সমস্যার মধ্যে এনে ফেলবেন। বর্ত্তমানে আফ্রিকার ওপরে বাস্তবধর্মী আলোচনার দাম আছে।

স্বামীর কথার জের টেনে মাদাম ওয়াল্টার বললে—লেখাটার একটা জুৎসই শিরোনামা দিতে হবে। আজকাল লেখার চাইতে শিরোনামার দাম বেশি, তা জানেন তো।

এই বলে মশিয়ে নবার্ত-এর দিকে তাকিয়ে তার সমর্থন পাবার জন্যে সে আবার বললে—কি বলেন মশিয়ে! আমি ঠিক বলিনি?

মশিয়ে নবার্ত-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। ভদ্রলোক একজন বিখ্যাত কবি। ফ্রানচাইস পত্রিকার সাহিত্য বিভাগে এর কবিতা প্রায়ই বের হয়।

মশিয়ে নবার্ত তার মুখের ভেতরের খাদ্যগুলোকে পাকস্থলীতে চালান করে দিয়ে বললে—কথাটা একদিক দিয়ে ঠিকই বলেছেন মাদাম। কিন্তু শুধু শিরোনামাতেই কাজ হয় না। শিরোনামা ভাল হওয়া অবশ্যই দরকার। কিন্তু যে লেখার ওপরে শিরোনামা তা যদি হৃদয়গ্রাহী না হয় তাহলে শিরোনামাটা মাঠে মারা যাবে। তবে কি না, হৃদয়গ্রাহী রচনা লিখবার জন্যে চাই প্রতিভা। লেখকের প্রতিভা না থাকলে লেখা যত তথ্যপূর্ণই হোক না কেন, তা হবে অপাঠ্য।

—কিন্তু মশিয়ে দুরয় এখানে যে ভাবে আলোচনা করলেন তাতে তো মনে হয়, রাজনৈতিক প্রবন্ধ ইনি বেশ ভাল ভাবেই গুছিয়ে লিখতে পারবেন। সমস্ত কিছুকে সামগ্রিক ভাবে দেখবার দৃষ্টিশক্তি ওঁর আছে।

দুরয় খুশি হয়ে উঠলো মেয়ে মহলে পাত্তা পেয়ে। তবে কিনা তার খুশি হবার আসল কারণ হলো মাদাম ফরেস্তিয়েরের সপ্রশংস দৃষ্টি। সে লক্ষ্য করলো, মাদাম ফরেস্তিয়ের তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

সেও তাকালো মাদাম ফরেস্তিয়েরের দিকে। মাদামকে দেখে মনের মধ্যে দোলা লাগলো দুরয়ের। মনে হলো, সে তাহলে কোন হেঁজি-পেঁজি লোক নয়, এ আসরেও তার দাম আছে।

এই কথা মনে হতেই সে মাদামকে লক্ষ্য করে বললে—আপনার কানের দুল দুটি কিন্তু ভারী চমৎকার। সুন্দর মানিয়েছে আপনাকে।

মৃদু হেসে মাদাম বললে—ও দুটো আমি নিজের পছন্দ মত অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছি।

এমনি সব আলাপ-আলোচনার মধ্যে ডিনার শেষ হলো। ডিনার শেষ হলে সবাই এসে বসলেন ড্রয়িং রুমে। এর পরেই শুরু হলো কফি-পান। মাদাম ফরেস্তিয়ের নিজের হাতে কফির পেয়ালা এগিয়ে দিল দুরয়ের সামনে।

দুরয় যখন কফির পেয়ালাটা তার হাত থেকে নিতে গেল, মাদাম তখন ফিস্ ফিস্ করে বললে—মাদাম ওয়াল্টারের সঙ্গে আলাপ করুন।

এই কথা বলেই অন্যদিকে চলে গেল সে।

দুরয় কিন্তু মহা সমস্যায় পড়ে গেল। মাদাম ওয়াল্টারের সঙ্গে কি ভাবে আলাপ শুরু করা যায় তা সে ভেবেই ঠিক করতে পারলো না। এই সময় হঠাৎ তার নজরে পড়লো যে, মাদাম ওয়াল্টার তার কফির পেয়ালাটা খালি করে সেটাকে কোথায় রাখবে তা ঠিক করতে পারছে না। দুরয় হঠাৎ তার কাছে এগিয়ে এসে বললে- পেয়ালাটা আমাকে দিন। আমি রেখে দিচ্ছি।

মাদাম ওয়াল্টার পেয়ালাটা দুরয়ের হাতে দিয়ে মৃদুস্বরে বললে, ধন্যবাদ। কিন্তু ওই 'ধন্যবাদ' পর্যন্তই। আর কোনো কথাই সে বললে না।

দুরয় ভাবতে লাগলো, এরপর কি বলা যায়। অবশেষে অনেক ভেবে-চিন্তে সে বললে—ফ্রানচাইস পত্রিকার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কিন্তু বহু দিনের।

তার কথা শুনে মাদাম বিস্মিত হয়ে বললে—কি রকম?

—আমি যখন আফ্রিকায় ছিলাম সেই সময় অধীর আগ্রহে ফ্রানচাইস-এর জন্যে অপেক্ষা করতাম। সত্যি কথা বলতে কি, ওখানে তায় ফ্রানচাইসই ছিল পড়বার মতো একমাত্র পত্রিকা। আর যে সব পত্র-পত্রিকা আসতো সেগুলো সবই ছিল রাবিশ। শুধু ফ্রানচাইস-এই আমরা পেতাম দেশ-বিদেশের খবর।

মাদাম ওয়াল্টার খুশি হয়ে উঠলো তার স্বামীর পত্রিকার প্রশংসা শুনে। সে তাই দুরয়ের দিকে তাকিয়ে বললে—ফ্রানচাইসকে আপনার ভাল লাগতো জেনে খুশি হলাম। কী পরিশ্রমই না করতে হয়েছে পত্রিকাখানা দাঁড় করাতে।

কথাটা সে এমন ভাবে বললে যা শুনে মনে হয় যে, পত্রিকার জনপ্রিয়তার এবং প্রতিষ্ঠার মূলে তার কৃতিত্বই সর্বাধিক।

হুরয় কিন্তু আবার অসহায় বোধ করলো। পত্রিকার গুণগান করবার ইচ্ছে তার মোটেই ছিল না। সে চেয়েছিল মাদাম ওয়াল্টারের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হতে। কিন্তু তার কথাবার্তার ধরণ-ধারণ দেখে হুরয়ের মন থেকে সে উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল। সে তখন ভাবতে লাগলো যে, এই মহিলার চেয়ে মাদাম মোরেলের সঙ্গে দুটো কথা বললে বরং আনন্দ পাওয়া যেতো।

ভাগ্যটা ওর ভালই বলতে হবে। কারণ, ও যখন মনে মনে মাদাম ওয়াল্টারের কাছ থেকে বিদেয় নেবার কথা ভাবছিল ঠিক সেই সময় মশিয়েঁ ভার্সে এসে তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। সুযোগ বুঝে হুরয় তখন এক পা দু'পা করে মাদাম মোরেলের সামনে গিয়ে হাজির হলো।

ওকে দেখে মাদাম মোরেল হাসিমুখে বললে—আপনি তাহলে সাংবাদিক হচ্ছেন?

হুরয় হাসি মুখে উত্তর দিল—লক্ষণ দেখে তো সেই রকমই মনে হচ্ছে। এতকাল রাইফেল দিয়ে মানুষ মেরেছি, এবার কলম দিয়ে রাজা উজির মারবো।

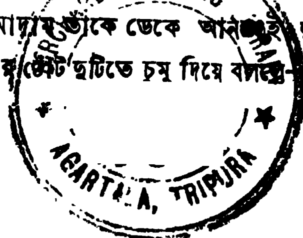
তার কথা শুনে মাদাম মোরেল মৃদু হেসে বললে—ঠিকই বলেছেন। সাংবাদিকের কাজই হলো রাজা উজির মারা। তবে এ কাজে সম্মান আছে। ভাল সাংবাদিক হতে পারলে পয়সাও আছে।

কথা বলতে বলতে মাদামের ডান হাতখানা এসে হুরয়ের বাঁ হাতের ওপরে পড়েছে। মাদাম মোরেলের কিন্তু খেয়ালও নেই সেদিকে। হাতখানা সরিয়ে নেবার কোনো ইচ্ছে দেখা গেল না তার তরফ থেকে।

সুন্দরী নারীর স্পর্শসুখ লাভ করে হুরয়ের মনটা খুশিতে ভরে গেল। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সে তাকালো মাদাম মোরেলের মুখের দিকে। মাদামও তাকালো তার দিকে। হুরয়ের মনে হলো, মাদামের এই দৃষ্টির ভেতর বন্ধুত্বের অন্তরঙ্গতা ছাড়া আরও যেন কিছু লুকিয়ে আছে।

এই সময় হঠাৎ লরিনের দিকে নজর পড়লো মাদামের। লরিন দাঁড়িয়েছিল জানালার পাশে। মাদাম তাকে ডেকে আনতেই হুরয় হঠাৎ তাকে কোলে তুলে নিয়ে তার সুন্দর ঠোঁট দুটিতে চুমু দিয়ে বললে—তোমার নাম কি খুকু?

মেয়েটি বললে—লরিন।



লরিনকে হৃরয়ের কোলে দেখে মাদাম মোরেল হাসি মুখে বললে—আপনার কাছে তো বেশ আদর খাচ্ছে! অথচ এর আগে আর কোনো পুরুষ মানুষকেই ওভাবে আদর করতে দেয়নি ও।

হৃরয় গভীর স্নেহে লরিনের সোনালী চুলগুলোর ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে বললে—তার মানে, এর আগে ওকে আমার মতো আর কেউ ভালবাসেনি।

এই বলে আর একবার চুমু দিল লরিনের মুখে। মায়ের মুখখানার কথা মনে করেই মেয়ের মুখে চুমু দিল সে।

বিদায় নেবার সময় হয়ে এলো এবার। একে একে বিদায় নিতে লাগলো সবাই। হৃরয়কেও বিদায় নিতে হলো।

॥ তিন ॥

ফরেস্তিয়েৱ এবং তার স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে দুরয় যখন রাস্তায় নেমে এলো তখন তার মনটা যেন খুশির হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। খুশির আবেগে তার তখন ছুটতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু রাস্তায় ঘোড়-দৌড় শুরু করলে লোকে কি বলবে ভেবে মনের এই ইচ্ছেটাকে দমন করলো সে। এই সময় হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল যে, আগামীকালই তাকে একটা প্রবন্ধ লিখে নিয়ে মশিয়ে ওয়াল্টারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। প্রবন্ধটার কথা বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন তিনি। কি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে হবে সে কথাও তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে তাই লম্বা লম্বা পা ফেলে রুয়ে দে সন্ত-এর দিকে রওনা হলো। ওই রাস্তাতেই তার ডেড়া।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়িতে হাজির হলো দুরয়। এখানে এসেই তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে হলো, স্বর্গ থেকে হঠাৎ নরকে এসে পড়েছে। ফরেস্তিয়েরের সুসজ্জিত বাসগৃহের সঙ্গে নিজের বাসস্থানকে মনে মনে তুলনা করে নিজের এই নোংরা ঘরের প্রতি তার মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠলো। কী বিশ্রী ঘর! তাছাড়া পরিবেশটাই বা কী বিশ্রী। সিঁড়িটা পোড়া সিগারেটের টুকরো, পেঁয়াজের খোসা আর ছেঁড়া কাগজে ভরতি। ধুলো জমে আছে পুরু হয়ে।

আজ যেন হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেছে দুরয়। বড়লোকরা যেমন নোংরা জায়গা দেখে নাক সিটকায় সেই রকম নাক সিটকে দেশলাই জ্বালতে জ্বালতে নিজের কামরায় এসে হাজির হলো সে। আলো জেলে ঘরের জানালাটা খুলে দিল। তারপর কি মনে করে জানালার গরাদের ওপরে কপাল ঠেকিয়ে স্টেশনের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর দুরয়ের মনে হলো যে, আর দেরি করা ঠিক নয়। এখনই লিখতে শুরু করা দরকার। কথাটা মনে হতেই জানালা ছেড়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। তারপর ঘরের একমাত্র চেয়ারখানাকে টেবিলের সামনে টেনে এনে বসে পড়লো লিখতে।

কিন্তু সমস্যা হলো কাগজের। লেখার মতো কাগজ কোথায়? টেবিলের ড্রয়ারে কাগজ বলতে একখানা চিঠি লেখার প্যাড, ছাড়া আর কিছু নেই।

অগত্যা সেইটিই টেনে বের করে লিখতে বসলো। প্যাডে বেশি কাগজ নেই। এক পৃষ্ঠায় লিখলে চলবে না। সে তাই দু-পৃষ্ঠাতেই লিখবে বলে স্থির করলো।

কলমটাকে দোয়াতে ডুবিয়ে পাকা লিখিয়ের মতো সেটাকে তুলে নিয়ে কাগজের ওপরে বাগিয়ে ধরলো। তারপর খসখস করে লিখে ফেললো শিরোনামা।—'আফ্রিকা প্রবাসের স্মৃতিকথা'। শিরোনামার নিচেই নিজের নামটা লিখলো—জর্জেস দুরয়।

এই আসল অংশটি লেখা হয়ে যাবার পর বাকি অংশ লিখতে শুরু করলো সে। কিন্তু কলম যে খর্মখট করতে চায়! আর যেন এগোতেই চায় না সে। বেশ জুৎসই ভাষায় প্রবন্ধটা শুরু করতে চেয়েছিল, কিন্তু জুৎসই কেন, বে-জুৎসই ভাষাও আসতে চাইছে না। নিবের আগায় কালি শুকিয়ে গেল। আবার কলমটাকে কালিতে ডুবিয়ে নিলো। কিন্তু ভাষাটা কিছুতেই কলমের আগায় আসছে না। লেখাটা যে এত কঠিন কাজ একথা আগে তার মনেই হয়নি। ভেবেছিল, বিষয়টা যখন তার জানা, তখন লিখে ফেলতে মোটেই অসুবিধে হবে না। ডিনার পার্টিতে যেভাবে বলেছিল সেইভাবে লিখে গেলেই চলবে। কিন্তু এবার সে বুঝতে পারছে, বলা এক কথা আর লেখা অন্য কথা। বলতে সে ভালই পারে কিন্তু সেই বর্ণিত বিষয়কে লিখিত ভাষায় রূপ দেওয়া রীতিমত দুরূহ কাজ।

অনেক চেষ্টায়, মনে মনে অনেকবার মক্সো করে সে যা লিখলো তা হলো —"আঠারশ' চুয়াত্তর খ্রীষ্টাব্দের পনেরই মে। যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করবার পর ফরাসীরা আবার নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করতে চেষ্টা করছে তখন।"—কিন্তু এরপর? এরপর কি লেখা যায়?—একবার মনে হলো আলজিয়ার্স-এর একটা বর্ণনা দিলে কেমন হয়? সঙ্গে সঙ্গে তার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো সমগ্র আলজিয়ার্সের একটি চিত্র—পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, স্থানীয় লোকদের বাড়ি-ঘর এবং তাদের জীবনযাত্রা, এমন কি সমুদ্রের দৃশ্য পর্যন্ত ভেসে উঠলো তার মনশ্চক্ষে। কিন্তু ওই ভেসে ওঠা পর্যন্তই। ভেসে ওঠা জিনিসকে ভাষায় রূপ দেওয়া সম্ভব হলো না।

অবশেষে হাল ছেড়ে দিল দুরয়। মনে মনে বললে—দূর ছাই! লেখা-টেখা দেখছি আমার দ্বারা হবে না। কলমটাকে টেবিলের ওপর একরকম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো সে।

হঠাৎ তার নজরে পড়লো খাটের দিকে। একরাশ ময়লা জামা-প্যান্ট

স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে বিছানার ওপর। দেয়ালে আঁটা ওয়াল-পেপারগুলোই বা কি বিশ্রী। নাঃ। এই পরিবেশে কোনো ভদ্রলোক থাকতে পারে? এই নোংরা পরিবেশকে পরিবর্তন করতেই হবে। জানোয়ারের মতো না বেঁচে মানুষের মতো বাঁচতে হবে তাকে!

এই কথা মনে হতেই আবার সে কাগজ-কলম নিয়ে বসলো। আবার শুরু করলো চেষ্টা। আফ্রিকায় অনেক দিন থেকে এসেছে সে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট। আফ্রিকার যে অঞ্চলে সে বাস করে এসেছে সেখানকার সবকিছুই তার নখদর্পণে। যাযাবর আর নিগ্রো জাতির মানুষরা বাস করে সেখানে। জঙ্গলে কত রকম জীবজন্তু। এসব কথা গুছিয়ে লিখতে পারলেই দুই পৃষ্ঠা হয়ে যাবে। আরও কত কি লেখার আছে। বন্ধুদের সে সব কথা সে চমৎকার করে বলে যেতে পারে। কোথাও বাধে না। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে লিখতে বসে। কলমের মুখে ভাষা যেন আসতেই চাইছে না।

এই সময় হঠাৎ তার নজর পড়লো লণ্ড্রির বিলটার দিকে। লণ্ড্রির দরোয়ান এসে দিয়ে গেছে। বিল রেখে যাওয়া মানেই দেনা পরিশোধের জন্যে তাগাদা। দুরয়ের মেজাজটা রীতিমত বিগড়ে গেল বিলটা দেখে। দেনার পরিমাণ বেশি নয়, কিন্তু সেই অল্প পরিমাণ দেনা শোধ করবার মতো ক্ষমতাও তার নেই আজ।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো দুরয়। আবার সে এগিয়ে গেল জানালার পাশে। জানালা দিয়ে রেল লাইন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একটা ট্রেন আসছে। সুড়ঙ্গ পথ পার হয়ে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে ট্রেনটা। এবার ওটা চলছে তার গ্রামের বাড়ির দিকে। সিন-উপত্যকার কাছেই তাদের বাড়ি। সেখানে তার বাবা-মা থাকেন। বাবার একটা সরাইখানা আছে। বাবা চেয়েছিলেন দুরয়কে মানুষের মতো মানুষ করতে। কিন্তু তা আর হলো না। কলেজের শেষ পরীক্ষায় ফেল করলো দুরয়। ওখানেই ইতি হলো পড়াশুনার। এরপর সে ঢুকল সেনা বিভাগে। বলা-বাহুল্য, সর্বনিম্ন পদেই ঢুকতে হয়েছিল তাকে। তবে আশা ছিল, প্রমোশন পেয়ে হয়তো বা অফিসার হতে পারবে। চার বছরের চুক্তিতে সৈন্যদলে ঢুকেছিল। কিন্তু দু বছর পার হলেও যখন বিশেষ কোনো উন্নতি হলো না তখন সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে প্যারীতে চলে এলো ভাগ্যান্বেষণে।

সৈনিক-জীবনের কথা মনে হতেই দুটি মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল দুরয়ের। আফ্রিকায় থাকাকালে ওখানকার এক জোতদারের মেয়ে তাকে বেজায়

ভালবেসে ফেলেছিল। সে যখন আফ্রিকা ছেড়ে আসছিল তখন মেয়েটি তার সঙ্গে চলে আসবার জন্যে সে কি কাকুতি-মিনতি! মেয়েটি একেবারে নাছোড়বান্দার মতো তাকে ধরেছিল। অনেক কষ্টে যদিও বা তার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল, কিন্তু একটি নারী তাকে কিছুতেই ছাড়তে চায়নি। এটি হলো এক উকিলের বউ। দুরয় তার সঙ্গে গোপনে প্রেম করেছিল। এবার প্রেমিকপ্রবর কেটে পড়ছে শুনে সে মনের দুঃখে জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিল।

প্রেমের ব্যাপারে দুরয়ের বেশ কিছুটা হাতযশ ছিল। মেয়েরা যেন পতঙ্গের মতো ছুটে আসতো তার দিকে। এখনও এটা চলছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় 'ফলিজ বার্জার'-এর সেই মেয়েটিকে দেখেই। মেয়েটির নাম র‍্যাচেল। দেহ বিক্রি করাই তার ব্যবসা। কিন্তু দেহপোজিবিনী হয়েও সে দুরয়কে ভালবেসে ফেলেছিল প্রথম দর্শনেই।

ফরেস্তিয়েরও বলেছে এ কথা। 'ফলিজ বার্জার'-এর বক্সে বসে সেদিন সে বলেছিল—"তোমার এই দেহ-সম্পদের কল্যাণেই জীবনে উন্নতি করতে পারবে তুমি।" ওই সব মেয়ের কথা এবং ফরেস্তিয়েরের কথাটা মনে পড়ায় দুরয়ের কেন যেন মনে হলো যে, এই পথেই সে উন্নতি করতে পারবে। কিন্তু একটা সিঁড়িতো চাই? সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতে না পারলে শেষ ধাপে উঠবে কি করে? কোনো ব্যাঙ্কার বা বড়দরের ব্যবসায়ীর মেয়েকে যদি লটকে ফেলা যায় তাহলেই আর দেখতে হবে না! তখন আর তাকে ঠেকায় কে?

দুরয় যখন এইসব কথা ভেবে নিজের মনেই মশগুল হয়ে পড়েছে সেই সময় হঠাৎ রসভঙ্গ করে বিকট ভাবে সিটি দিতে দিতে একটা ইঞ্জিন বেরিয়ে এলো সুড়ঙ্গ থেকে।

হঠাৎ এইভাবে চিন্তাসূত্র কেটে যাওয়ায় বিরক্ত হলো দুরয়। 'দুত্তোর' বলে সে সরে এলো জানালা থেকে। তার মনে হলো যে, মদটা একটু বেশি খাওয়া হয়েছে বলেই লেখাটা আসছে না। যাকগে, কাল সকালে চেষ্টা করলেই চলবে। এখন শুয়ে পড়া যাক।

মনে মনে এই কথা ভেবে সে ঘরের জানালা বন্ধ করে এবং বিছানার ওপরে কাপড়-চোপড়গুলো সরিয়ে ফেলে শুয়ে পড়লো।

পরদিন খুব ভোরেই ঘুম ভাঙলো দুরয়ের। মাথার মধ্যে লেখাটার কথা ঘুরপাক খাচ্ছিলো বলেই অতো সকালে ঘুম ভাঙলো।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল লেখার কথাটা। সে তাই কোনো রকমে হাত-মুখ ধুয়েই বসে গেল লিখতে। কিন্তু এবারেও ঠিক আগের বারের মতই অবস্থা হলো। কিছুতেই ভাষা যোগাচ্ছে না কলমের মুখে। যোগাবেই বা কি করে? আগে তো লেখার অভ্যাস করেনি। লেখাটা একটা অভ্যাসের ব্যাপার। অন্যান্য কাজের মতো লেখাটাও শিখতে হয়। সে তাই কলম নামিয়ে রেখে উঠে গিয়ে পোশাক পরতে লাগলো। মনে মনে সে ঠিক করেছে যে, ফরেস্তিয়েরের বাড়িতে গিয়ে লেখার ব্যাপারে তার সাহায্য নেবে। সে একটু সাহায্য করলেই লেখাটা হয়ে যাবে।

মনে মনে এইরকম স্থির করে তখনই সে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। কিন্তু রাস্তায় এসেই তার মনে হলো, এত সকালে ফরেস্তিয়েরের বাড়িতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। সে হয়তো এখনও ঘুমুচ্ছে। দুরয় তাই ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলো। যাবার পথে একটি পার্ক পড়ে। সেই পার্কে ঢুকে একটা বেঞ্চে বসলো সে। অদূরে একটি যুবক পায়চারি করছে। তার চাল-চলন দেখে দুরয়ের মনে হলো, সে হয়তো কারো জন্তে প্রতীক্ষা করছে। দুরয়ের অনুমানই সত্যি হলো। একটু পরেই একটি তরুণী এসে হাজির হলো তার কাছে। যুবকটি তখন তরুণীটিকে বাহুবন্ধনে বেঁধে পার্ক থেকে বেরিয়ে গেল।

ওদের দেখে দুরয়েরও ইচ্ছে জাগলো ওইভাবে কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে। কিন্তু না, আর দেরি করা চলে না। প্রেমের কথা পরে ভাবলেও চলবে। তার আগে লেখাটা শেষ করা চাই। এবার একটু দ্রুত পায়েই হাঁটতে লাগলো সে।

ফরেস্তিয়েরের বাড়ির সদর দরজায় এসে সিঁড়িতে পা দিতেই ফরেস্তিয়েরের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা, হয়ে গেল। তাকে দেখে ফরেস্তিয়ের বললে—কী খবর বন্ধু? লেখাটা নিয়ে এসেছো নাকি?

দুরয় একটা ঢোক গিলে বললে—কই আর হলো? লেখা-টেখা দেখছি আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না। শত চেষ্টা করেও দু লাইনের বেশি লিখতে পারি নি।

তাই নাকি! তবে তো বড় মুস্কিল। লেখা না নিয়ে মশিয়ে ওয়াল্টারের সঙ্গে দেখা করবে কি করে?

সেই জন্যেই তো তোমার কাছে এলাম। তুমি এ ব্যাপারে একটু সাহায্য না করলে—মানে, বুঝতেই তো পারছো, লেখার অভ্যাস না থাকলে যা হয়—

ফরেস্তিয়ের দুরয়ের কাঁধে হাত দিয়ে বললে—হ্যাঁ, অভ্যাস না থাকলে এই রকমই হয়; কিন্তু আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারছিনে ভাই।

—তাহলে উপায়?

—ঘাবড়াও মাত.। আমি না থাকলেও চলবে। তুমি ওপরে গিয়ে মাদামের সঙ্গে দেখা করো। তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন।

—কিন্তু, তাঁকে বিরক্ত করা কি উচিত হবে?

—নিশ্চয়ই উচিত হবে। তুমি যাও তো। স্টাডিতেই তাঁকে পাবে।

—কিন্তু……

—আবার 'কিন্তু'। আমি বলছি, তুমি তাঁর কাছে যাও। তিনি বাঘ-সিঙ্গি নন যে তোমাকে খেয়ে ফেলবেন।

এই বলে ফরেস্তিয়ের এক রকম জোর করেই দুরয়কে ওপরে পাঠিয়ে দিয়ে বাইরের দিকে পা বাড়ালো। দুরয় তখন অনেকটা বাধ্য হয়েই ওপরে উঠতে লাগলো।

ফরেস্তিয়েরের ফ্লাটের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো দুরয়। তার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। বন্ধু বাড়িতে নেই, এ অবস্থায় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করাটা কি ঠিক হবে? তিনি যদি দেখা না করেন?

একবার তার মনে হলো, ফিরে যাবে। কিন্তু লেখার কথাটা মনে হতেই হাত বাড়িয়ে কলিং বেলটা টিপলো।

একটু পরেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন চাকর। দুরয়ের দিকে তাকিয়ে সে বললে—মালিক বাড়িতে নেই, মশিয়েঁ।

—আমি তা জানি। এই মাত্র নিচে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। তিনি আমাকে একটা কাজে মাদামের কাছে পাঠিয়েছেন। মাদামকে তুমি খবর দাও যে, তার স্বামীর বন্ধু জর্জেস দুরয় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

দুরয়ের কথা শুনে চাকরটা বললে—আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি মাদামকে খবর দিতে যাচ্ছি।।

একটু পরেই আবার সে ফিরে এসে বললে—আসুন মশিয়েঁ।

স্টাডির দরজায় এসে চাকরটা বললে—মাদাম এই ঘরে আছেন।

মাদাম্ ফরেস্তিয়ের একখানা শাল গায়ে দিয়ে টেবিলের পাশে বসে লিখছিল। দুরয়কে দেখে মৃদু হেসে বললে—এত সকালে?

মাদামের কথা শুনে দুরয়ের মনে হলো, সে অসময়ে এসে পড়ায় মাদাম

বিরক্ত হয়েছেন। সে তাই আমতা আমতা করে বললে—অসময়ে এসে বিরক্ত করার জন্তে দুঃখিত। দয়া করে ক্ষমা করবেন। আমি এসেছিলাম ফরেস্তিয়েরের কাছে। তার সঙ্গে নিচে দেখা হয়েছে। সেই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। একটা বিশেষ প্রয়োজনেই আসতে হয়েছে। কিন্তু আপনাকে সে কথাটা বলতে সংকোচ বোধ করছি।

মাদাম একখানা চেয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হাসিমুখে বললে—আপনি বসুন।

ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল মাদামকে। একটু আগেই স্নান করে এসেছে। তার সদ্যস্নাতা চেহারাটা দেখাচ্ছে তাজা ফুলের মতো সুন্দর। কাঁধের উপর থেকে শালের প্রান্তটা একটু সরে গেছে। সেখানে ওর সুন্দর কাঁধটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

দুরয় কিছু বলছে না দেখে মাদাম আবার বললে—এবারে কাজের কথা বলুন।

দুরয় সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো মাদামের প্রশ্নে। কি বলা যায় মাদামকে? অবশেষে সমস্ত সংকোচ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে আমতা আমতা করে বললে—আপনি তো জানেন, মশিয়েঁ ওয়াল্টার আমাকে আলজিরিয়ার ওপরে একটা প্রবন্ধ লিখে আজই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন! কিন্তু লিখতে বসে দেখতে পেলাম যে, কাজটা যত সহজ ভেবেছিলাম আসলে মোটেই তত সহজ নয়। এই জন্যেই ফরেস্তিয়েরের কাছে এসেছিলাম। মানে, সে যদি এ ব্যাপারে একটু সাহায্য করে—

দুরয়ের কথার উত্তরে মাদাম প্রাণখোলা হাসি হেসে বললে—তাই বুঝি সে আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। ঠিক আছে। সে না থাকলেও কোন অসুবিধে হবে না। আপনি বরং আমার এই চেয়ারটায় বসুন। আমি পাশে বসে আপনাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি। কাগজ কলম সব কিছুই টেবিলে রয়েছে, কোনোই অসুবিধে হবে না আপনার।

এই কথা বলেই মাদাম উঠে পড়লো চেয়ার ছেড়ে। তারপর ম্যাণ্টেলপিস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে বললে—সিগারেট না খেয়ে আমি লেখার কাজ করতে পারি নে।

সিগারেটটা ধরিয়ে গোটা দুয়েক টান দিয়ে মাদাম আবার বললে—এবার বলুন।

কিন্তু কি বলবে দুরয়! কোন কথাই তার মনে আসছে না। সে যেন

বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তার অবস্থা দেখে মাদাম বললে—ঠিক আছে। আপনাকে প্রশ্ন করছি। আপনি শুধু আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

গীর্জার প্রধান ধর্মযাজক কারো স্বীকারোক্তি নেবার সময় যেভাবে প্রশ্ন করতে থাকেন, মাদামও ঠিক সেইভাবে দুরয়কে প্রশ্ন করতে লাগলো আর দুরয় সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলো। এবারে আর কোনো অসুবিধে হলো না তার।

মিনিট পনের ধরে চললো প্রশ্নোত্তর। অবশেষে মাদাম বললে—এবার তাহলে শুরু করা যাক, কেমন? প্রবন্ধটা এমন ভাবে লেখা হবে যেন আপনি আপনার কোনো বন্ধুকে চিঠি লিখছেন। এতে অনেক তুচ্ছ কথাও লেখা চলবে, যাতে লেখাটা বেশ সুখপাঠ্য হবে। নিন, এবার শুরু করুন—

'প্রিয় হেনরি,

"তুমি আমার কাছে আলজিরিয়ার খবরাখবর জানতে চেয়েছো। আমি তাই যতটা পারি তোমাকে জানাতে চেষ্টা করছি। কতটা পারবো জানি না। তবুও আমার সাধ্যমত সব কথাই তোমাকে জানাতে চেষ্টা করছি। তুমি তো জানো, আমি এখানে সেনা বিভাগে চাকরি করছি। আমাদের কর্ণেল আমাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখেন। কর্ণেলের একটা চমৎকার ঘোড়া আছে। তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁর সেই ঘোড়াটাকে আমি মাঝে মাঝে ব্যবহার করি। ঘোড়ায় চড়া আমার ভালই অভ্যাস আছে। তবে ঘোড়া চালাতে জানলেও জলযান চালাতে আদৌ জানিনে। আমাকে বলতে পারো ডাঙার জীব। ডাঙার জীবের মতো জল দেখলেই আমার ভয় হয়। তবে ডাঙায় আমি বে-পরোয়া। যাই হোক, এবার কাজের কথায় আসছি।

এখানে এসে যা দেখেছি এবং এখনও দেখছি তার মধ্যে অনেক মজার কথাও থাকবে। মজার কথা মানে নারীঘটিত ব্যাপার। সবই তোমাকে লিখছি। তবে আমার বিশেষ অনুরোধ, এ চিঠি তোমার কোনো মহিলা বন্ধুকে দেখিও না।"

এরপর কিছু ব্যক্তিগত কথা লিখে আফ্রিকা সম্বন্ধে লেখা শুরু হলো।

"এবার এই দেশটা সম্বন্ধে বলছি। পৃথিবীর মানচিত্রে আফ্রিকা মহাদেশের অবস্থান নিশ্চয়ই দেখেছ। বিশাল এই মহাদেশ। আয়তন আমাদের ইয়োরোপের চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু বড় হলে কি হয়, এর বেশির ভাগ অংশই জুড়ে রয়েছে মরুভূমি আর অরণ্য। সাহারা মরুভূমির নাম নিশ্চয় জানো। কিন্তু এ যে কী ভীষণ—কী রকম ভয়ঙ্কর তা নিজের চোখে না দেখলে বুঝতে পারা যায় না। আফ্রিকার উত্তর অঞ্চলের এক বিরাট অংশ

জুড়ে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম এই মরুভূমি। এর আয়তন পঁয়ত্রিশ লক্ষ বর্গ-মাইল। এ থেকেই বুঝতে পারছো কী বিশাল এ মরুভূমি। এই বিশাল মরুভূমির উত্তরে যে কটি দেশ আছে, তাদের মধ্যে একটি এই আলজিরিয়া—আমরা যেখানে উপনিবেশ গড়ে তুলেছি। আলজিরিয়ার অবস্থান এমন জায়গায় যার ফলে এই দেশটিকে আফ্রিকা মহাদেশে প্রবেশ করবার দরজা বলা চলে।"

এর পরেই শুরু হলো যাত্রাপথের বিবরণ। ফ্রান্স থেকে আলজিরিয়ায় যাবার পথে দুরয় যা যা দেখেছে সে সব কথা বেশ রসিয়ে রসিয়ে লেখা হলো। এর মধ্যে কিছু নারীঘটিত ব্যাপারও স্থানলাভ করলো। নারীঘটিত ব্যাপার, অর্থাৎ কেচ্ছা জাতীয় লেখা পেলে ফরাসীরা সে লেখাকে যেন গোগ্রাসে গিলতে থাকে। সাংবাদিকতায় সিদ্ধহস্ত মাদাম ফরেস্তিয়ের সে কথা ভালই জানেন। এই জন্যেই কিছু কেচ্ছা ঢুকিয়ে দেওয়া হলো লেখাটার ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে আলজিরিয়ার ভৌগোলিক বিবরণ এবং ওখানকার রাজনৈতিক অবস্থার কথাও লেখা হলো সরল ভাষায়।

আলজিয়ার্সে পৌঁছে দুরয় কি কি দেখেছে এবং কি কি করেছে সে কথাও লেখা হলো। এই প্রসঙ্গে একটি মেয়ের সঙ্গে সে কি ভাবে প্রেম করেছে সে কথাও বাদ দেওয়া হলো না। শেয়াল, হায়না আর বুনো কুকুরের ডাক শুনতে শুনতে মেয়েটিকে নিয়ে সে কি ভাবে পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে তার রসালো বর্ণনা দিয়ে অবশেষে লেখা হলো, "পরবর্তী চিঠিতে আরও অনেক কথা জানাবার ইচ্ছে রইল।"

এখানেই সমাপ্ত হলো দুরয়ের পত্র-সাহিত্য তথা আলজিয়ার্স সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ।

মাদাম বললেন—নিন, এবার সইটা করে ফেলুন।

কথাটা শুনে লজ্জিত হলো দুরয়। লজ্জিত হবার কথাই। এর একটা লাইনও তার রচনা নয়। সে শুধু লিখে গেছে মাদামের ডিকটেশন মতো। এখানে তার ভূমিকা হলো টাইপ রাইটার যন্ত্রের মতো। চাবি টিপেছে মাদাম ফরেস্তিয়ের, আর যন্ত্রের মতো অক্ষরের পর অক্ষর বসিয়ে গেছে দুরয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নাম সই করলো লেখাটার নিচে।

মাদাম ডিকটেশন দিচ্ছিল ঘুরে ঘুরে। সিগারেট টানতে টানতে। একটা সিগারেট শেষ করে আর একটা ধরিয়েছে সে। লেখাটা শেষ হলেও মাদাম আগের মতই পায়চারি করছিল। হঠাৎ সে দুরয়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো—আমার বন্ধু মাদাম মোরেলকে কেমন লাগলো আপনার?

—চমৎকার। সুন্দর।

তুরয়ের বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, 'তবে আপনার মতো নয়'—কিন্তু সে কথা বলতে সাহস হলো না তার।

মাদাম বললে—ক্লতিলদে সত্যিই চমৎকার মেয়ে। যেমন চেহারা তেমনি মিশুকে। দিলটাও ওর খুব দরাজ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ওর স্বামী সুনজরে দেখেন না।

—কি করেন, ভদ্রলোক?

—রেলের ইনস্‌পেক্টর। প্রায় সব সময়ই বাইরে থাকেন। মাসে একটা সপ্তাহ শুধু প্যারীসে এসে বাড়িতে থেকে যান। ক্লতিলদের জন্যে আমার দুঃখ হয়। সময় পান তো মাঝে মাঝে ওর সাথে দেখা করবেন। ওর সঙ্গে কথা বললে আনন্দ পাবেন।

এই সময় এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন সেখানে। ঘরে ঢোকার আগে মাদামের অনুমতি নেবারও দরকার বোধ করেননি তিনি। ভদ্রলোক হয়তো ভেবেছিলেন যে, ঘরে মাদাম ফরেস্তিয়ের ছাড়া আর কেউ নেই; কিন্তু তুরয়কে সেখানে দেখতে পেয়ে তিনি বেশ একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। মাদামের মুখখানাও রাঙা হয়ে উঠলো। পরক্ষণেই সে সামলে নিয়ে আগন্তুকের সঙ্গে তুরয়ের পরিচয় করিয়ে দিল।

"ইনি জর্জেস তুরয়, চার্লসের পুরোনো বন্ধু, আর ইনি হলেন আমাদের পরিবারের বিশেষ সুহৃদ কাউন্ট দে ভাত্রেক।"

কাউন্ট শিষ্টাচার দেখিয়ে বললেন—ভারী খুশি হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে।

তুরয়ও শিষ্টাচার কামনা করলো। তারপর মাদামের দিকে তাকিয়ে বললে—আমি তাহলে এখন আসি, মাদাম। আপনার সাহায্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তুরয়। এত তাড়াতাড়ি বিদায় নেবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ভাত্রেক সাহেবের শুভাগমনে, বিশেষ করে তাঁর চোখ-মুখের ভাব দেখে তুরয় বুঝতে পারে যে, তাকে ওখানে দেখে কাউন্ট মহোদয় মোটেই খুশি হন নি। লোকটাকে আত্মসুখী বলেই মনে হলো তুরয়ের।

তুরয় আশা করেছিল যে, দুপুরের লাঞ্চটা ফরেস্তিয়েরের বাড়িতেই জুটবে। হয়তো জুটতোও। কিন্তু ওই বুড়োটা এসে পড়তেই সে গুড়ে বালি

পড়েছে। মেজাজটা বিগড়ে গেল দুরয়ের। আরে বাপু, আসতেই যদি হয় তাহলে লাঞ্চের পরে এলেই পারতিস।

মনে মনে গজর গজর করতে করতে রাস্তায় নেমে এলো দুরয়। তারপর ধীরে ধীরে চলতে লাগলো সামনের দিকে। এখন পথে দুরয়। তিনটে বাজতে এখনও অনেক দেরি। তিনটের আগে তো কাগজের অফিসে যাওয়া চলবে না! সে তাই অনির্দিষ্টভাবে এপথে সেপথে ঘুরতে লাগলো। পকেটে বিশেষ কিছু নেই। ডিনার স্যুটের ভাড়া দিয়ে যে ক'টা ফ্রাঁ অবশিষ্ট ছিল তা থেকেও কিছু খরচ হয়ে গেছে। যা আছে তাতে ভাল রেস্তোরাঁয় গিয়ে লাঞ্চ খাওয়া চলবে না! সে তাই সস্তা দরের একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে কোনরকমে লাঞ্চটা সেরে নিল। তারপর ধীরে ধীরে পা চালিয়ে দিল 'ভায় ফ্রানচাইস' পত্রিকার অফিসের দিকে।

বেলা ঠিক তিনটের সময় সে পত্রিকার অফিসে হাজির হলো। অফিস তখনও ঢিমে তালে চলছে। পত্রিকা-অফিসে কাজ শুরু হয় সাড়ে তিনটেয়। তখন থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত চলে। রিপোর্টাররা তখনও আসেনি। সবে দু' একজন আসতে শুরু করেছে। অন্যান্য বিভাগেও তেমন কাজ-কর্ম চলছে না।

দুরয় একজন বেয়ারাকে ডেকে বলল—আমি মশিয়ে ওয়াল্টারের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি আমাকে আসতে বলেছেন।

বেয়ারা বলল—তিনি এখন মিটিং-এ বসেছেন, মশিয়ে। আপনি ভিজিটারদের ঘরে বসুন।

এই বলে ভিজিটারদের ওয়েটিং রুমটা দেখিয়ে দিল বেয়ারা। সেখানে গিয়ে দুরয় দেখতে পেলো যে, অনেক লোক বসে আছে সেখানে। সবাই এসেছে কোনো না কোনো কাজের জন্যে। দুরয় শেষে বেকার বসে চুপচাপ করে অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও তার ডাক এলো না দেখে আবার সে পূর্বোক্ত বেয়ারাকে ডেকে বললে—মশিয়েঁ ফরেস্তিয়েরের সঙ্গে দেখা হতে পারে কি? তাঁকে বলো যে, তাঁর বন্ধু জর্জেস দুরয় এসেছে।

এবার আর অপেক্ষা করতে বললে না বেয়ারা। দুরয়কে বললে—আসুন।

একটা কড়িডোর দিয়ে দুরয়কে সে একটা হল ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে

এসে ছুরয় দেখলো যে, ফরেস্তিয়ের এবং আরও তিনজন লোক কাপ বল খেলছে। ছুরয়কে দেখে ফরেস্তিয়ের বলল—এসে গেছো দেখছি! লেখাটা এনেছো কি?

—হ্যাঁ, এনেছি।

—আচ্ছা, একটু দাঁড়াও।

এরপর খেলা বন্ধ করে খেলার সাজ-সরঞ্জামগুলো গুছিয়ে রেখে ছুরয়কে সঙ্গে করে মশিয়েঁ ওয়াল্টারের ঘরে নিয়ে গেল সে। কিন্তু কোথায় মিটিং! ছুরয় দেখলো, ওয়াল্টার এবং আর তিনজন ভদ্রলোক একটা বড় টেবিলের চার দিকে বসে তাস খেলছে।

ফরেস্তিয়ের ছুরয়কে নিয়ে তার একেবারে পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালো। বাজীটা শেষ না হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে লাগলো সে। একটু পরেই শেষ হলো বাজী। ওয়াল্টারই জিতলে। এই সুযোগে ফরেস্তিয়ের তার বক্তব্য পেশ করলো—আমার বন্ধু ছুরয় এসেছে।

মশিয়েঁ ওয়াল্টার ঘাড় ফিরিয়ে ছুরয়ের দিকে তাকালো তারপর জিজ্ঞেস করলো—লেখাটা এনেছেন?

—হ্যাঁ, স্যার, এই যে।

ভাঁজ করা কয়েকখান কাগজ পকেট থেকে বের করে ওয়াল্টারের হাতে দিলো।

কাগজগুলো হাতে নিয়ে ওয়াল্টার খুশি হয়ে বললো—আপনি তাহলে কথা রেখেছেন দেখছি।

কথাটা বলেই আবার সে পরবর্তী বাজী শুরু করতে যাচ্ছিলো। এই সময় ফরেস্তিয়ের তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে নিম্নকণ্ঠে বললে—ম্যারামবতের জায়গায় ছুরয়কে নেবার কথা বলেছিলেন। আপনি তো এখন ব্যস্ত। এ ব্যাপারটা আমিই মিটিয়ে ফেলতে পারি কি?

—নিশ্চয়ই পারেন। আপনি ওঁকে কি কাজ করতে হবে তা বুঝিয়ে দিন। আজ থেকেই ওঁকে এখানে নেওয়া হলো।

ফরেস্তিয়ের তখন খুশি মনে ছুরয়কে সঙ্গে করে আবার হাজির হলো সেই হল-ঘরে। এটাই সম্পাদকদের আফিস। বিভিন্ন বিভাগের সম্পাদকের জন্যে বিভিন্ন টেবিল রয়েছে সেখানে। এছাড়া একটা লম্বা সাইজের টেবিলও রয়েছে এককোণে। সেখানেই কাপ বল খেলা চলছিল।

ফরেস্তিয়ের সেই লম্বা টেবিলের কাছে গিয়ে আবার শুরু করলো খেল

খেলতে খেলতেই সে দুরয়কে বললে—আর কি! এই তো হয়ে গেল চাকরি। আগামীকাল তিনটের অফিসে আসবে। তখন তোমাকে জানিয়ে দেওয়া হবে কি করতে হবে বা কোথায় কোথায় যেতে হবে। আমিই সে সব বলে দেবো তোমাকে। তাছাড়া পুলিশের ওপরওয়ালার সঙ্গেও তোমাকে পরিচিত করে দেবো। সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি তোমাকে যথেষ্ট সাহায্য করবেন।

—নিয়োগ-পত্র কবে পাবো?

—নিয়োগপত্রের কোনো ঝামেলা এখানে নেই। এখানে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম হচ্ছে। তবে বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধের বিষয় অবশ্যই নির্ধারিত হয়ে থাকে। তুমি এখন মাসে দু'শ ফ্রাঁ হিসেবে পাবে। এছাড়া তোমার লেখা কোনো বিশেষ প্রবন্ধ ছাপা হলে তারদরুন আলাদা পারিশ্রমিক মিলবে। প্রবন্ধের প্রতিটি লাইনের জন্যে তুমি পাবে দুই 'স্যু' হিসেবে।

খেলাটা ইতিমধ্যে জমে উঠেছে। ফরেস্তিয়ের এবং তার চারজন সহকর্মীর ভেতর খেলা চলছে তখন। প্রতিযোগিতামূলক খেলা। শেষ অবধি ফরেস্তিয়েরই জিতলো।

খেলা শেষ হলে এলো বিয়ার আর কাচের গ্লাস। সবাই খুশি মনে বিয়ার পান করলো। দুরয়ও পান করলো এক গ্লাস বিয়ার।

গ্লাসটা খালি করে দুরয় বললে—এখন আমাকে কি করতে হবে?

—কিছুই করতে হবে না। ইচ্ছে হলে তুমি এখন চলে যেতে পারো। তবে আগামী কাল তিনটের সময় হাজিরা দিতেই হবে। ইত্যবসরে আর একটা প্রবন্ধ লিখতে শুরু করে দাও। তোমার এ প্রবন্ধটা আগামী কালের কাগজেই ছাপা হবে। প্রুফটা আমিই দেখে দেবো।

দুরয় তখন ফরেস্তিয়ের এবং তার সহকর্মীদের সঙ্গে করমর্দন করে খুশি মনে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নতুন চাকরি পাবার আনন্দে রাত্রে ভাল করে ঘুমই হলো না দুরয়ের। সাংবাদিকের চাকরিতে অনেক সম্মান। সরকারী বে-সরকারী সব মহলেই সাংবাদিকের খাতির। বিছানায় শুয়ে শুয়ে নতুন চাকরির কথাই বারবার মনে হতে থাকে দুরয়ের। তার লেখা প্রবন্ধটাও আগামী কালই বের হবে কাগজে। হাজার হাজার নরনারী পড়বে তার লেখা। সবাই জানবে, জর্জেস দুরয় আফ্রিকার ওপরে প্রবন্ধ লিখেছে।

কিন্তু প্রবন্ধটা যদি কোনো কারণে না বের হয়! এই কথা মনে হতেই

উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে সে।

ভোর হতে না হতেই ড়ুরয় বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। দ্রুত পদক্ষেপে চৌমাথার দিকে যায়। ওখানে দৈনিক পত্রিকা বিক্রি করে হকাররা। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে হতাশ হয়। হকাররা তখনও আসেনি। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় যে, স্টেশনে কাগজ পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে সে চলতে থাকে স্টেশনের দিকে। কাগজের স্টল এইমাত্র খোলা হয়েছে' একটি মেয়ে এসে স্টলটা খুলেছে। একটু পরে এক বাণ্ডিল প'ত্রিকা নিয়ে একটি লোক এসে দাঁড়ায় স্টলের সামনে। মেয়েটি হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেয় কাগজগুলো।

ড়ুরয় তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে মেয়েটিকে বললে—"আমাকে এক কপি 'ভায় ফ্রানচাইস' দিন তো!"

—ও পত্রিকা তো নেই আমার কাছে!

—সে কি! ভায় ফ্রানচাইস রাখেন না?

—রাখি বৈ কি! তবে ওটা এখনো এসে পৌঁছায়নি।

ড়ুরয় পেছন ফিরলো। অন্য কোনো কিয়োস্ক-এ গিয়ে কিনতে হবে কাগজটা।

এবার আর তাকে বিফলমনোরথ হতে হলো না। একটা কিওস্ক-এ গিয়ে পেয়ে গেল পত্রিকা। পকেট থেকে তিনটে শু বের করে কিনে ফেললো এক কপি।

কিন্তু কোথায় তার প্রবন্ধ? প্রথম পৃষ্ঠায় তো কেবলই বড় বড় হেডিং আর খবর। বুকটা কেন যেন কেঁপে উঠলো তার। প্রবন্ধটা বেরিয়েছে তো?—

পাতা ওল্টাতে থাকে ড়ুরয়। আরে, এই তো তার প্রবন্ধ। বেশ বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে প্রবন্ধের শিরোনামা—'আফ্রিকা প্রবাসীর স্মৃতি কথা"—শিরোনামার নিচেই তার নামটা ছাপা রয়েছে—জর্জেস ড়ুরয়।"

আনন্দে বে-সামাল হয়ে পড়ে সে। হকারদের মতো চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়—"এই যে! পড়ে দেখুন, জর্জেস ড়ুরয়ের লেখা 'আফ্রিকা প্রবাসীর স্মৃতিকথা!"

কিন্তু অনেক কষ্টে মনের ইচ্ছেটাকে দমন করলো সে। এবার তার ইচ্ছে হলো, অনেক লোকের সামনে প্রবন্ধটা পড়তে। সে তাই কাগজখানা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে সে একটা কাফেতে ঢুকে পড়লো। অনেক লোক ভিড় করেছে সেখানে। সকালে কফি পান করতে এসেছে ওরা। ড়ুরয়

একটা টেবিলের পাশে বসে দোকানের একজন বয়কে ডেকে বললে—ভায় ক্রানচাইস পত্রিকাটা দাও তো।

—ও কাগজ তো এখানে রাখা হয় না, মশিয়েঁ।

—সে কি! ভায় ক্রানচাইস রাখো না! আচ্ছা, তুমি বরং এক কপি কিনে নিয়ে এসো। এই নাও দাম।

ছুরয় একখানা ভায় ক্রানচাইস কিনে আনালো বাইরে থেকে। ছুরয়ের সামনে এসে বললে—এই নিন।

ছুরয় হাত বাড়িয়ে কাগজখানা টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় এসে থেমে গেল। তারপর নিজের মনেই বলতে লাগলো—"বাঃ! সুন্দর! চমৎকার লিখেছে!

অনেকেই তাকালো তার দিকে। ছুরয় বললে—জর্জেস ছুরয়ের লেখা প্রবন্ধটা পড়ে দেখবেন। নূতনত্ব আছে।

কফি পান শেষ করে কাগজখানা টেবিলে রেখেই উঠে পড়ে ছুরয়। কফির দাম মিটিয়ে দিয়ে বাইরের দিকে চলতে থাকে।

বয় তাকে ডেকে বলে—আপনার পত্রিকাটা রেখে গেলেন যে! নিয়ে যান।

—থাক। ওটা আর নেবো না। খরিদ্দারদের পড়তে দিও। ভারী চমৎকার একটা লেখা বেরিয়েছে আজ। জর্জেস ছুরয়ের লেখা।

কাফে থেকে বেরিয়ে রেল অফিসের দিকে পা বাড়ালো ছুরয়। গত মাসের বেতনটা নিতে হবে। তাছাড়া সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদেয়ও নিতে হবে। শুধু তাই নয়, খেঁকুরে স্বভাবের অপিস-ম্যানেজারকেও আজ সে দু'কথা শুনিয়ে দেবে।

বেলা ঠিক দশটায় রেল অফিসে হাজির হলো ছুরয়। প্রথমেই গেল সে ক্যাশ অফিসে। সেখান থেকে বেতনটা নিয়ে পকেটে ফেললো। তারপর গদাইলস্করী চালে হেলতে দুলতে নিজের অফিসে হাজির হলো।

অফিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মশিয়ে পোতেন তাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন —ম্যানেজার সাহেব আপনাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। আগে সেখানে যান। তিনি খুব চটে গেছেন।

—চটেছেন বুঝি? তাহলে তো ভারী মুস্কিল হলো! হয়তো আমার মুণ্টি কেটে ফেলবেন তিনি

হৃদয়ের শ্লেষমাখা কথা শুনে ঘাবড়ে গেলেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে, হৃদয় তাঁকে অনুরোধ করবে তার হয়ে ম্যানেজারকে কিছু বলতে ; কিন্তু একি ব্যাপার!

ব্যাপারের কিন্তু এখানেই শেষ নয়। হৃদয় আর একটা বোমা নিক্ষেপ করলো তার দিকে। বললে—ম্যানেজার ফ্যানেজারের তোয়াক্কা আমি করিনে।

হৃদয়ের বাত-চিত্ শুনে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মশাই তো 'থ'। বলে কি লোকটা? ওকি জানে না যে, ম্যানেজার ইচ্ছে করলেই ওকে ডিসচার্জ করতে পারেন।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের মুখ থেকে তখন শুধু একটি কথাই বের হলো, "আপনি প্রকৃতিস্থ আছেন তো?"

হৃদয় তেড়ে উঠলো—বলেন কি মশাই? অপ্রকৃতিস্থতার কি দেখলেন? আপনাদের এই রাবিশ চাকরিতে আমি আজই ইস্তফা দিচ্ছি। গতকাল থেকে 'ভায় ফ্রান্চাইস' পত্রিকায় জয়েন করেছি। ওখানে সাব-এডিটরের কাজ পেয়ে গেছি আমি। মাইনে পাঁচশ' ক্রাঁ, এছাড়া যেসব বিশেষ প্রবন্ধ লিখবো তার জন্যে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পাবো।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল হৃদয়ের কথা শুনে। কেরানী বাবুদের ও তথৈবচ। হৃদয়ের সৌভাগ্যের কথা শুনে তারা মনে মনে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লো। হৃদয় তখন তাদের দিকে তাকিয়ে বললে—আমি এখন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ফিরে এসে আপনাদের কাছ থেকে বিদেয় নেবো।

ম্যানেজার সাহেব হৃদয়কে দেখেই খেঁকিয়ে উঠলো—কী ব্যাপার মশাই? চাকরি করবার ইচ্ছে আছে, না নেই?

—আরে রেখে দিন মশাই আপনার চাকরি! রেলের এই থার্ড ক্লাশ চাকরি আমি আর করবো না। আপনি আমাকে মেজাজ দেখাবেন না।

হৃদয়ের বচন শুনে ম্যানেজার সাহেব একেবারে চুপসে গেল। কোনো রকমে বললে—কি বলতে চান আপনি?

—বলতে চাই যে, আপনার অধীনে আর আমি চাকরি করবো না। আমি জার্নালিজমে ঢুকেছি। খুব ভাল চাকরি। মাইনেও ভাল। এখানে যা পাই তার চারগুণ। যাইহোক আপনার এখানে দাঁড়িয়ে আমি আর সময় নষ্ট করতে রাজী নই। আমি আপনার কাছে এসেছি চাকরিতে ইস্তফা

দিতে। আজ মুখে বলে গেলাম। লিখিত ইস্তফা-পত্র ডাকে পাঠিয়ে দেবো।

এই কথা বলেই বীরদর্পে ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তুরয়। এবার কেরানী বাবুদের পালা। তুরয় তার সহকর্মীদের কাছে আসতেই তারা তাকে অভিনন্দন জানাতে লাগলো। তাদের অভিনন্দনের উত্তরে তুরয় বললে— আপনাদের সবাইকে একদিন আমি কোনো ভাল রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দেবো।

রেল-অফিস থেকে তুরয় যখন বেরিয়ে এলো তখন প্রায় বারোটা বাজে। খিদেও পেয়েছে বেশ। সে তাই একটা সস্তা রেস্তোরাঁয় ঢুকে লাঞ্চ খেয়ে নিলো। তারপর একটা দোকানে গিয়ে কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনলো এবং একটা ছাপাখানায় গিয়ে নিজের নামের কার্ড ছাপবার অর্ডার দিল।

এইসব কাজ শেষ করতেই বেলা আড়াইটে বেজে গেল। সে তখন ধীর পদক্ষেপে নতুন অফিসের দিকে রওনা হলো।

অফিসে আসতেই ফরেস্তিয়ের বললে—এই যে বন্ধু, এসে গেছ দেখছি। বসো, হাতের কাজটা সেরে নিয়ে তোমাকে কাজ দিচ্ছি।

একজন মোটা মতো ভদ্রলোক গভীর মনোযোগ সহকারে কি যেন লিখে চলেছে। তার দিকে তাকিয়ে ফরেস্তিয়ের বললে—সেণ্ট পোতিন, আপনি কখন বেরুচ্ছেন?

সেণ্ট পোতিন, অর্থাৎ সেই মোটা লোকটি মুখ তুলে ফরেস্তিয়েরের দিকে তাকিয়ে বললে—চারটেয়।

—যাবার সময় তুরয়কে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন ওকে।

এরপর তুরয়ের দিকে তাকিয়ে বললে—প্রবন্ধটা এনেছ?

—না তো।

—তার মানে? যে প্রবন্ধটা ছাপা হয়েছে তার পরবর্তী অংশ চাই যে। আমি তো ভেবেছিলাম, আজই তুমি ওটা নিয়ে আসবে।

—লেখার ইচ্ছে তো ছিল, কিন্তু ও ব্যাপারে…

তার কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ফরেস্তিয়ের বললে—তুমি কি ভেবেছো যে, তোমার লেখাটা আমরাই লিখে দেবো, আর তুমি শুধু দাম নেবে? এটা

যদি ভেবে থাকো তাহলে মহা ভুল করেছো। ভায় ফ্রানচাইস তোমাকে এখানে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেবে না।

ফয়েন্তিয়েরের কথা শুনে অপমানিত বোধ করলো দুরয়। লজ্জায় আর অপমানে চোখ মুখ লাল হয়ে গেল তার। সে তাই অনুচ্চ কণ্ঠে বললে—আগামী কাল ওটা নিয়ে আসবো।

—বেশ, তাই এনো। মশিয়ে ওয়াল্টারকে আমি বলে রাখবো যে, প্রবন্ধটা আগামী কাল দিচ্ছো তুমি।

এরপর অন্য কথা শুরু করলো ফরেস্তিয়ের। বললে—শোনো বন্ধু! গত দুদিনে দু'জন জাঁদরেল ব্যক্তি প্যারীতেএসেছেন। একজন হলেন চীনের প্রধান সেনাপতি লি চেঙ কঙ—ইনি উঠেছেন কন্টিনেন্টালে, আর অপরজন হচ্ছেন রাজা তপোসাহেব রামজী রাও—ইনি উঠেছেন ব্রিস্টলে। এঁদের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

তারপর সেন্ট পোতিনের দিকে তাকিয়ে বললে—ওঁদের কাছ থেকে চীন আর ভারতবর্ষ ইংরেজদের সম্বন্ধে কি রকম মনোভাব পোষণ করে তা জেনে নিতে চেষ্টা করবেন।

সেন্ট পোতিন মৃদু হেসে বললে—আজই আমি ওঁদের সঙ্গে মোলাকাত করবো। রিপোর্টটা আগামী কালই পেয়ে যাবেন।

ফরেস্তিয়ের খুশি হলো সেন্ট পোতিনের কথা শুনে। এবার সে দুরয়ের দিকে তাকিয়ে বললে—সেন্ট পোতিন বাঘা রিপোর্টার। এর সঙ্গে থেকে রিপোর্টিংয়ের কায়দাটা শিখে নেবে।

এই কথা বলেই নিজের কাগজপত্রে মনোনিবেশ করলো সে।

চারটে বাজতেই সেন্ট পোতিন দুরয়কে সঙ্গে নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লো। রাস্তায় বেরিয়ে এসে সেন্ট পোতিন বললে—"হামবাগ!"

কথাটা শুনে দুরয় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালো। কাকে 'হামবাগ' বলছে তা সে বুঝতে পারলো না। সেন্ট পোতিনও কথাটা নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য না করে অন্য কথা বললে—গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে হতো না?

—নিশ্চয়ই।

কাছেই একটা 'বার' ছিল। দুরয়কে নিয়ে সেখানে ঢুকে পড়লো সেন্ট পোতিন। একজন বয়কে ডেকে হুকুম দিল—দুগ্লাস ঠাণ্ডা বীয়ার নিয়ে এসো।

একটু পরেই এসে গেল্ পানীয়। সেন্ট পোত্তিন একচুমুকে গ্লাসের অর্ধেকটা খালি করে ফেললো। তারপর গ্লাসটি নামিয়ে রেখে শুরু করলো বকর বকর। প্রথমেই শুরু করলো মশিয়েঁ ওয়াল্টারের শ্রাদ্ধ।

—জানেন মশিয়ে। ইহুদী জাতটিই হলো অর্থ পিশাচ। ওরা কেবল অর্থটাই চেনে। বালজাক যে সব লোকেদের নিয়ে গল্প লিখেছেন, তারা সবাই ইহুদী।

বালজাকের কোনো গল্প দুরয় পড়েনি। তবুও একটা কিছু বলা দরকার মনে করে সে বলে উঠল—বালজাক ঠিকই লিখেছেন।

সেন্ট পোত্তিন এরপর ভার্গে, রিভাল এবং ওয়ালটারের নামে খিস্তি শুরু করলো।

তারপরেই সে ফরেস্তিয়েরকে নিয়ে পড়লো। বললে—লোকটার বরাত ভালো, নইলে এমন একটি বউ জোটে। বউয়ের কল্যাণেই ও আজ খবরের কাগজের অফিসে জাঁকিয়ে বসতে পেরেছে।

—বউয়ের কল্যাণে মানে? জিজ্ঞেস করলো দুরয়।

—ও, জানেননা বুঝি? ওর সব লেখাই তো লিখে দেয় ওর বউ।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ, তাই। ওস্তাদ মেয়ে যাকে বলে। আগে ছিল কাউন্ট ভার্দেকের উপপত্নী। এখন প্রমোশন পেয়ে পত্নীরূপে ফরেস্তিয়েরের স্কন্ধে চেপেছে।

মাদাম ফরেস্তিয়ের সম্বন্ধে এই রকম ইতর মন্তব্য শুনে দুরয় মনে মনে রেগে গেল। অনেক কষ্টে রাগটা মনের মধ্যে চেপে রেখে অন্য কথা শুরু করলো সে। বললে—আপনার নামটা কি সত্যিই সেন্ট পোত্তিন?

—না, ওটা আমার ছদ্মনাম। আসল নাম হলো টমাস।

গ্লাসের পানীয় শেষ হয়ে গিয়েছিল তখন। দুরয় তাই বলে উঠলো—চলুন, এবার ওঠা যাক। দুই মহামাননীয়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে তো।

—দেখা করতে হবে না ঘোড়ার ডিম! ওদের সঙ্গে আমি আদৌ দেখা করবো না।

—বলেন কি? এ কখনও হয় নাকি!

—আপনি দেখছি এ ব্যাপারে নিতান্তই নাবালক। কন্টিনেণ্টালে আর ব্রিস্টলে কে যাবে ওই দুই উজবুকের সঙ্গে দেখা করতে! চীন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ওরা যা বলবে সে কথা আমি আগে থেকেই জানি। ও সম্বন্ধে লিখেছিও। সেই লেখাই নতুন করে ঝালিয়ে নিয়ে ইণ্টারভিউ হিসেবে

চালিয়ে দেবো। এবং দুজনের ট্রাভেলিং খরচ বাবদ পাঁচ ফ্রাঁ হিসেবে দশ ফ্রাঁর বিল করবো।

কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেছিল দুজনে। অনেকটা যাবার পর সেন্ট পোতিন বললে—আপনার কোনো কাজ থাকলে যেতে পারেন। আমার সঙ্গে থাকার আর দরকার নেই।

সেন্ট পোতিনের কথা শুনে খুশি হলো দুরয়। এবার সে বাড়িতে গিয়ে লেখা নিয়ে বসতে পারে। আলজিয়ার্সের ওপরে যে প্রবন্ধটা লেখা হয়েছে তার পরবর্তী অংশটা আগামী কালই দিতে হবে। সে তাই সেন্ট পোতিনের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে বাড়ির দিকে চলতে লাগলো। চলতে চলতে প্রবন্ধের কথাটাই ভাবছিল সে। ফরেস্তিয়েরের যা-তা বলেছে তাকে। তার হয়তো ধারণা যে, তার সাহায্য ছাড়া আমি লিখতেই পারবো না। এবার তাকে দেখিয়ে দেবো যে, কারো সাহায্য ছাড়াই আমি লিখতে পারি।

একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে কিছু খেয়ে নিয়ে বাড়িতে চলে গেল সে। নিজের ঘরে এসেই সে বসে গেল কাগজ কলম নিয়ে।

কিন্তু এবারেও সেই আগের মতই অবস্থা হলো। 'মেয়েদের যেমন বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না'—তার অবস্থাও প্রায় সেইরকম। বুকের মধ্যে কথাগুলো ভীড় করে এলেও কলমের নাগায় আসছে না কিছুতেই।

অনেকবার চেষ্টা করলো দুরয়, কিন্তু লেখা কিছুতেই বের হলো না। অবশেষে বিরক্ত হয়ে কাগজ কলম রেখে উঠে পড়লো সে। মনে মনে বললে—দুত্তোর লেখা! এ কাজ দেখছি আমাকে দিয়ে হবে না। আর একবার আমাকে তালিম নিতে হবে মাদাম ফরেস্তিয়েরের কাছে। আগামী কাল সকালেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবো।

মাদাম ফরেস্তিয়েরের সঙ্গে আর একবার দেখা হবে এই কল্পনাতেই দুরয়ের মনটা খুশি হয়ে উঠলো।

পরদিন বেলা প্রায় দশটার সময় ফরেস্তিয়েরের ফ্লাটে গিয়ে হাজির হলো দুরয়। কলিং বেল টিপতেই ফরেস্তিয়েরের চাকর এসে দরজা খুলে দিল। দুরয় বললে—মশিয়েঁ ফরেস্তিয়ের বাড়িতে আছেন কি?

—আছেন, কিন্তু তিনি এখন খুব ব্যস্ত।

—তা হোক, তুমি তাঁকে বলো যে, তাঁর বন্ধু দুরয় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

দুন্ময়ের কথা শুনে চাকরটা আবার ভেতরে চলে গেল। দুন্ময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ফরেস্তিয়েরের আহ্বানের জন্য।

মিনিট দুই পরে আবার ফিরে এলো চাকরটা। বললে—আসুন।

আগের দিন যে ঘরে সে বসেছিল সেই ঘরেই তাকে নিয়ে এলো আবার। সেখানে যেতেই দুন্ময় দেখলো যে, ফরেস্তিয়ের একখানা চেয়ারে বসে লিখছে আর তার স্ত্রী আগের দিনের মতোই সাদা শালটি গায়ে জড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে ডিক্টেট করছে।

দুন্ময় ঘরে ঢুকে বললে—অসময়ে এসে আপনাদের বিরক্ত করলাম বলে দুঃখিত।

ফরেস্তিয়ের বিরক্ত হয়েছিল তাকে দেখে। বেশ একটু রাগত স্বরেই সে বললে—কি চাই তোমার?

—না, চাইনে কিছু, মানে···

—মানে বুঝতে আমার দেরি হয়নি। কিন্তু তুমি যদি মনে করে থাকো যে, আমরা তোমার হয়ে লিখে দেবো তাহলে মহা ভুল করেছো। তোমার জন্যে প্রবন্ধ লিখে দেবো এরকম কোনো সর্ত তোমার সঙ্গে করা হয়েছে কি?

ফরেস্তিয়েরের কথা শুনে দুন্ময় হতাশ ভাবে মাদাম ফরেস্তিয়েরের দিকে তাকালো। তার মুখে তখন মৃদু হাসি। হাসিটাকে বিষের ছুরির মতো মনে হলো দুন্ময়ের। মনে হলো, ফরেস্তিয়ের তাকে অপমান করায় সে যেন খুশিই হয়েছে।

সে তাই ফরেস্তিয়ের দম্পতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

ফরেস্তিয়েরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের ঘরে এসে সে কাগজ কলম নিয়ে বসলো। এবার সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসেছে যে, লেখা সে আজ শেষ করবেই।

এবার কিন্তু বিশেষ বাধলো না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লেখাটা শেষ করতে পারলো সে।

তিনটের কিছু আগেই সে পত্রিকা অফিসে হাজির হলো। সেখানে যেতেই সেণ্ট পোতিনের সঙ্গে দেখা। সেণ্ট পোতিন মৃদু হেসে বললে—আমার রিপোর্টটা পড়েছো?

—না, কাগজ পড়ার সময়ই পাইনি। সকালে উঠেই বসতে হয়েছিল প্রবন্ধ লিখতে।

চীন এবং ভারতবর্ষের দুই মহারথীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কি রকম বিবরণ দেওয়া হয়েছে পড়ে দেখতে পারেন।

—পড়বো বৈ কি। সাক্ষাৎ না করেই কিভাবে সাক্ষাৎকারের বিবরণ লেখা হয় তা দেখার জন্তে আমি খুবই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

এই কথা বলে দুরয় তার আসনে গিয়ে বসলো। তারপর সেদিনের পত্রিকাখানা টেনে নিয়ে সেন্ট পোতিনের রিপোর্টটা পড়তে শুরু করলো।

একটু পরেই ফরেস্তিয়ের হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে সেখানে এসে হাজির হলো। সেন্ট পোতিনের দিকে তাকিয়ে একটা রাজনৈতিক ব্যাপারের উল্লেখ করে বললে—এই খবরটা আজই চাই।

এরপর দুরয়ের দিকে তাকিয়ে বললে—প্রবন্ধটা এনেছ কি?

দুরয় পকেট থেকে তার লেখা প্রবন্ধটা বের করে ফরেস্তিয়েরের হাতে দিয়ে বললে—এই নাও।

ফরেস্তিয়ের সেটার ভাঁজ না খুলেই বললে—ঠিক আছে, এখুনি এটাকে মালিকের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এই কথা বলেই ফরেস্তিয়ের চলে গেল সেখান থেকে।

সেন্ট পোতিন তখন দুরয়কে ডেকে বললে—ক্যাস অফিসে গিয়েছিলেন কি?

—কেন বলুন তো?

—মাইনের টাকাটা আগাম নেবার জন্তে।

—সেকি! মাইনে আগাম নেওয়া যায় নাকি?

—হাঁ। এ অফিসে এটাই নিয়ম। চলুন। আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে।

ক্যাশ অফিশে গিয়ে দুরয় তার একমাসের মাইনে দুশ' ফ্রাঁ ছাড়া আরও আটাশ ফ্রাঁ বেশি পেলো। বাড়তি ফ্রাঁগুলো হলো তার প্রবন্ধের দরুন পারিশ্রমিক। রেল অফিস থেকে সে পেয়েছিল একশ কুড়ি ফ্রাঁ। তা থেকে আট ফ্রাঁ খরচ হয়ে হাতে ছিল একশ বারো ফ্রাঁ। ওর সঙ্গে দুশ' আটাশ ফ্রাঁ যোগ হয়ে মোট দাঁড়ায় তিনশ চল্লিশ ফ্রাঁ। এতগুলো ফ্রাঁ এর আগে একসঙ্গে সে কোনদিনই পায়নি।

দুরয় যখন নোটগুলো পকেটে ঢোকাচ্ছিল তখন তার দিকে তাকিয়ে পোতিন বলল—চলুন, এবার বেরিয়ে পড়া যাক।

দুরয় বলল—বেশ। চলুন।

সেন্ট পোতিন ওস্তাদ লোক। সে দুরয়কে সঙ্গে করে বিভিন্ন পত্রিকার অফিসে গিয়ে গিয়ে অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ওইসব পত্রিকার

রিপোর্টারদের সঙ্গে আড্ডা মেরেই ফরেস্তিয়ের যে রাজনৈতিক সংবাদ জানতে চাইছিল তা জেনে নিল।

তারপর দুরয়ের দিকে তাকিয়ে বললে—আমি এবার অফিসে যাচ্ছি। আপনার ইচ্ছে হলে বাড়িতে চলে যেতে পারেন। আপনার আজকের কাজের এখানেই ইতি।

ছুটি পেয়ে দুরয় ফলিজ বার্জারের দিকে পা বাড়ালো। আজ তার পকেটে রেস্ত আছে। সুতরাং আজ একবার র‍্যাচেলের কাছে গেলে মন্দ হয় না।

ফলিজ বার্জারে গিয়ে পাশের যোগাড় করতে দেরি হলো না দুরয়ের। ভায় ফ্রানচাইসের রিপোর্টার শুনে তখুনি পাশ দিয়ে দিল কর্তৃপক্ষ। পাশটা পকেটস্থ করে পেছন ফিরতেই র‍্যাচেলের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল তার। র‍্যাচেলই প্রথমে কথা বললে—এই যে ডার্লিং! কেমন আছো?

—ভাল, তুমি?

—আমাদের আর থাকা না থাকা! মক্কেলদের খুশি করতেই দিন যায় আমাদের। তবে এরই মধ্যে তোমার কথা কয়েকবার মনে হয়েছে। দু'বার স্বপ্নে দেখেছি তোমাকে। যাইহোক, আসছ তো আমার ঘরে?

—আসতে আপত্তি নেই। তবে পকেটের অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। মাত্র দশটি ক্রাঁ পড়ে আছে পকেটে।

—আমি কি তোমাকে দর দাম নিয়ে কোনো কিছু বলেছি? যা পারো দিও। যাইহোক, চলো আগে কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে একটু পানাহার করে নেওয়া যাক। তারপর তোমাকে নিয়ে অপেরায় যাবো। সবাই দেখুক।

সে রাতটা র‍্যাচেলের ঘরেই কাটালো দুরয়। পরদিন যখন তার ঘুম ভাঙলো তখন রোদ উঠে গেছে। তাড়াতাড়ি জামা-প্যাণ্ট ঠিক করে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো সে। বাইরে বেরিয়ে প্রথমেই একখানা ভায় ফ্রানচাইস কিনে ফেললো। কিন্তু তার প্রবন্ধটা কোথায়? প্রত্যেক পৃষ্ঠা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার প্রবন্ধটা দেখতে পেলো না। মেজাজটা বিগড়ে গেল তার। বাড়ি এসে পোশাক না বদলেই বিছানায় শুয়ে পড়লো।

বিকেলে অফিসে গিয়ে প্রথমেই সে দেখা করলো মশিয়েঁ ওয়াল্টারের সঙ্গে। বললে—আমার প্রবন্ধটা বের হয়নি তো!

ওয়ালটার বললে—না, ওটা ছাপা সম্ভব হলো না। আপনার বন্ধু ওটা বাতিল করেছেন। বললেন, ওটা চলবে না। নতুন করে লিখতে হবে।

কথাটা শুনে মনে মনে রেগে গেল দুরয়। রাগটা ফরেস্তিয়েরের ওপরেই

বেশি। সে তাই সোজা ফরেস্তিয়েরের কাছে গিয়ে বললে—আমার লেখাটা তুমি বাতিল করেছো শুনলাম।

—হ্যাঁ, ওটা কি লেখা হয়েছে নাকি? ছাই-মাথা মুণ্ড সব গুলিয়ে একাকার করে ফেলেছো। ওরকম বাজে লেখা ফ্রানচাইসে ছাপা হয় না। নতুন করে লিখতে হবে তোমাকে।

একটু থেমে ফরেস্তিয়ের আবার বললে—হ্যাঁ শোনো। আজ তোমাকে একবার পুলিশ অফিসে যেতে হবে। ওখান থেকে অনেক খবর পাওয়া যাবে আজ।

কোন্ কোন্ খবর ওখান থেকে জেনে আসতে হবে সে কথাও জানিয়ে দিলে ফরেস্তিয়ের।

সংবাদ সংগ্রহের কাজটা ভালভাবেই সম্পন্ন করলো দুরয়। ফরেস্তিয়ের খুশি হলো তার রিপোর্ট দেখে। বললে—ঠিক আছে। এবার তুমি প্রবন্ধটা নতুন করে লিখে আনো। আগের প্রবন্ধটা যে কায়দায় লেখা হয়েছে ঠিক সেইভাবেই লিখতে হবে।

দুরয় তিন চারবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। মনোনীত হলো না তার প্রবন্ধ। সে তখন মনে মনে বুঝে নিলো যে, ফরেস্তিয়েরের কিংবা তার স্ত্রীর সাহায্য ছাড়া ও কাজ তার দ্বারা হবে না।

তবে প্রবন্ধ লেখার কাজটা না হলেও রিপোর্টিংয়ের কাজটা ভালভাবেই করতে লাগলো সে। মার্লিকও খুশি হলো তার কাজ দেখে। ফরেস্তিয়েরও খুশি হলো। সে তাই দুরয়কে রিপোর্টিংয়ের কাজটাই রপ্ত করে নিতে উপদেশ দিল। দুরয় তখন চুটিয়ে লেগে গেল সংবাদ-শিকারের কাজে।

কয়েক দিনের মধ্যেই রিপোর্টারের কাজে হাত পাকিয়ে ফেললো দুরয়। নানা মহলের নানা খবর—ছোট বড় মাঝারি—টক ঝাল মিষ্টি—সবকিছু সংগ্রহ করে আনতে লাগলো সে। মশিয়ে ওয়ালটার বেজায় খুশি। হ্যাঁ, এবারে একজন সত্যিকারের কাজের লোক পাওয়া গেছে।

আর্থিক দিক থেকেও এখন আর আগের মতো দুরবস্থা নেই দুরয়ের। মাসে দু'শ ফ্রাঁ তো আছেই, তার ওপর রাহা-খরচও পাওয়া যাচ্ছে অফিস থেকে। কিন্তু তাহলে কি হয়। অন্যান্য রিপোর্টাররা যেভাবে খরচ করে তার ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারছে না দুরয়। সে ভেবেই পায় না, ওরা অতো টাকা পায় কোথায়। কেউ ফাঁসও করে না অর্থপ্রাপ্তির গোপন কথাটা। এর জন্যে রাগ হয় তার। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, যেমন করেই হোক, টাকা রোজগারের গোপন পথের সন্ধান সে বের করবেই।

॥ পাঁচ ॥

খবরের কাগজের চাকরিতে দু'মাস কেটে গেছে হৃদয়ের। ইতিমধ্যে সে আরও পাকা হয়ে উঠেছে। শুধু সংবাদ সংগ্রহেই নয়, লেখাতেও হাত পেকেছে কিছুটা। মাঝে মাঝে তার লেখা প্রবন্ধও এখন ছাপা হচ্ছে দু'চারটে। কিন্তু পদমর্যাদার দিক থেকে এখনও সে নিচেই রয়ে গেছে। সম্পাদকীয় বিভাগের লোকেরা তাকে নিজেদের সমকক্ষ বলে মনে করে না। এমনকি তার বন্ধু ফরেস্তিয়েরও না। হৃদয়ের সঙ্গে সে ব্যবহার করে ওপর-ওয়ালার মতো। শুধু তাই নয়, ডিনারের নিমন্ত্রণও আর সে করে না।

মাদাম ফরেস্তিয়েরের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে হয় হৃদয়ের। কিন্তু সেদিনের সেই অপমানসূচক ব্যবহারের পরে ওখানে আর যেতে ইচ্ছে হয় না তার। তাই মনের ইচ্ছেটাকে মনেই চেপে রাখে সে।

মাঝে মাঝে তার মনে হয় নিজের অবস্থার কথা। সম্মান, প্রতিপত্তি, অর্থ—এর কিছুই সে পায়নি। অর্থের কথাটাই বেশি করে মনে হয়। অর্থ রোজগার করতে না পারলে জীবনটাই বৃথা। কিন্তু তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার কোনো লক্ষণই সে দেখতে পায় না। তবে একটা জিনিস সে লক্ষ্য করে যে, মেয়েরা তাকে দারুণভাবে পছন্দ করে। দেহবিলাসিনী গণিকা থেকে শুরু করে বড় ঘরের মেয়েরা পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বলে খুশি হয়।

মেয়েদের কথা মনে হতেই মাদাম মোরেলের কথা মনে পড়ে হৃদয়ের। মাদাম তাকে দেখা করতে বলেছিল। যে কোনো দিন বেলা তিনটের আগে যেতে বলেছে। তিনটে অবধি রোজই সে বাড়িতে থাকে।

কথাটা মনে হতেই সে রওনা হয় রুয়ে দে ভার্নেল অভিমুখে। ওই রাস্তারই একটা বাড়িতে থাকে মাদাম। পাঁচ তলার ফ্লাটে।

নির্দিষ্ট ঠিকানায় হাজির হয়ে কলিং বেলের বোতাম টেপে সে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দেখা দেয় একজন পরিচারিকা।

হৃদয় জিজ্ঞাসা করে—মাদাম দে মোরেল বাড়িতে আছেন কি?

—হ্যাঁ আছেন, কিন্তু তিনি এখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেননি। আপনি ভেতরে এসে বসুন। আমি তাঁকে খবর দিচ্ছি।

বসবার ঘরে ঢুকে আসন গ্রহণ করে হৃদয় বলে—মাদামকে বলবেন, মশিয়েঁ হৃদয় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

একটু পরেই মাদাম মোরেল এসে হাজির হলো। তুরয়কে দেখে খুশি হয়ে বললে—আপনি আসবেন সে কথা আমি ভাবতেই পারিনি। আমি তো ভেবেছিলাম। আপনি আমাকে ভুলেই গেছেন।

তুরয় সোফা থেকে উঠে মাদামের কাছে এগিয়ে এসে তার হাতে চুমো দিয়ে বললে—আপনার কথা আমার রোজই মনে হয়েছে, মাদাম।

তুরয়ের চেহারাটা আজ্ আরও সুন্দর মনে হলো মাদামের। তার পোশাক-পরিচ্ছদও সেদিনের চেয়ে অনেক ভাল। মাদাম তাই খুশি খুশি চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললে—আপনাকে আজ যে কী সুন্দর দেখাচ্ছে তা আর কি বলবো!

এরপর আর আলাপ আলোচনায় কোনো বাধা রইলো না। দুজনে পাশাপাশি বসে নানা কথা আলোচনা করতে লাগলো। মাদামের কথাবার্তা, হাব-ভাব সবই ভাল লাগলো তুরয়ের। মাদাম ফরেস্তিয়ের তার সঙ্গে যে ভাবে দূরত্ব রেখে কথা বলেছিল মাদাম মোরেল আগের সে রকম নয়।

তুরয়ের বার বার ইচ্ছে হচ্ছিল মাদামের উন্নত বক্ষস্থলে হাত লাগাতে। কিন্তু পাছে সে রেগে যায় এই ভয়ে নিজের ইচ্ছাটাকে কার্যকরী করতে সঙ্কোচ-বোধ করছিল সে।

এই সময় দরজার বাইরে একটা শব্দ হলো। মাদাম বললে—লরিন এসেছে মনে হচ্ছে।

সত্যিই তাই। এক সেকেণ্ডের মধ্যেই লরিন ঘরে ঢুকে পড়লো।

ঘরে এসে তুরয়কে দেখে ভারী খুশি হলো সে। সোজা তার সামনে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল।

তুরয় তার দুই গালে চুমো দিয়ে কোলের ওপর তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলো। মেয়ে তুরয়ের কাছে আদর খাচ্ছে দেখে মাদাম খুশি হয়ে বললে—লরিন দেখছি আপনাকে বেজায় ভালবেসে ফেলেছে।

তুরয় বললে—আমিও লরিনকে ভালবেসে ফেলেছি। কি বলো লরিন?

ঘড়িতে তিনটে বাজতেই উঠে পড়লো তুরয়। বললে—এবার আমাকে যেতে হচ্ছে। অফিসে যাবার সময় হয়ে এসেছে।

মাদামও দাঁড়িয়ে উঠলো তুরয়ের সঙ্গে সঙ্গে। বললে—ফরেস্তিয়েরদের ওখানে আর যে আপনাকে দেখতে পাইনে। কী ব্যাপার বলুন তো?

—ব্যাপার কিছু নয়। মানে কাজের চাপেই যাওয়া হয়ে ওঠে না।

—আমার কাছে আসতে পারবেন তো? না, কাজের কথা বলে ডুব মারবেন?

—না, আমি সময় পেলেই আপনার কাছে আসবো।

মাদাম মোরেলের বাড়িতে যে হৃদয়ের যাতায়াত চলছে একথা ফরেস্তিয়েরকে বলেনি হৃদয়। সে এখন ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে একাদশীকে ফাঁকি দিয়ে।

মাদামের বাড়িতে তার এখন অবারিত দ্বার। যখন খুশি আসে। এসে লরিনকে আদর করে, সেই সঙ্গে তার মাকেও।

কয়েকদিন পরে হৃদয় আবার এলে মাদাম বললে—আসছে শনিবার আমি একটা ডিনার পার্টি দিচ্ছি, কাফে রিভিতে। আপনাকে আগেই নিমন্ত্রণ করে রাখছি। বেশি লোককে বলিনি। ওখানে আসবে ম্যাচলিন আর তার স্বামী আর থাকবেন আপনি। সেদিন আসা চাই-ই। কোনো রকম ওজর-আপত্তি চলবে না।

হৃদয় খুশি মনেই গ্রহণ করলো মাদামের নিমন্ত্রণ।

শনিবার সন্ধ্যা সাতটার আগেই হৃদয় এসে হাজির হলো কাফে রিভিতে। ওয়েটারকে মাদাম মোরেলের ডিনারের কথা বললে সে ওকে তিনতলার একটা ঘরে পৌঁছে দিল। ঘরটা ভারী সুন্দর। হৃদয় দেখলো, সেখানে চার জনের বসার জায়গা করা হয়েছে টেবিলের দুপাশে। তখনও কেউ আসেনি। হৃদয় একা একা বসে জানালা দিয়ে বাইরের পথ দেখতে লাগলো।

একটু পরেই ফরেস্তিয়ের এসে হাজির হলো সেখানে। হৃদয়কে দেখে খুশির সঙ্গে আলাপ করতে লাগলো। অফিসে সে যে ভাবে ভাঁট নিয়ে থাকে এখানে তার কোনো চিহ্নই দেখতে পেলো না হৃদয়।

একটু পরেই মাদাম ফরেস্তিয়েরকে সঙ্গে নিয়ে হোস্টেস, অর্থাৎ মাদাম মোরেল এসে হাজির হলো। মাদাম ফরেস্তিয়ের হৃদয়কে ওখানে দেখে মৃদু হেসে বললে—আমাদের কি আপনি ভুলে গেছেন নাকি? তারপর মাদাম মোরেলের দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে আগের কথার জের টেনে বললে—এখন দেখছি আমাদের চেয়ে আমার এই বন্ধুকেই আপনার বেশি পছন্দ।

মাদাম ফরেস্তিয়েরের কথা শেষ হতে না হতেই একজন ওয়েটার এসে হাজির হলো। মাদাম মোরেলের দিকে তাকিয়ে সে বললে—কি পানীয় দেওয়া হবে মাদাম?

মাদাম বললে—এরা যা চান তাই এনে দাও। হ্যাঁ, শোনো। তুমি স্যাম্পেন আর হুইস্কি নিয়ে এসো।

ওয়েটার চলে গেলে মাদাম মোরেল বললে—আমার যে আজ কী ভাল লাগছে, সে কথা আর কি বলবো। আজ আমার মাতাল হতে ইচ্ছে হচ্ছে।

এদিকে ফরেস্তিয়েরের তখন খুক্ খুক্ করে কাশতে শুরু করেছে। সে তাই মাদাম মোরেলের দিকে তাকিয়ে বললে—কিছু যদি মনে না করেন তাহলে জানালাটা বন্ধ করে দিই।

মাদাম বললে—নিশ্চয়ই বন্ধ করবেন।

ফরেস্তিয়ের তখন উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের আসনে এসে বসলো।

একটু পরেই শুরু হলো খানাপিনা। খাবারগুলো খুবই সুস্বাদু হয়েছিল। সবাই খুশি মনে খেতে লাগলো সেগুলো। খেতে খেতে শুরু হলো গল্প। গল্প মানেই কেচ্ছা। কোন্ মহিলা কার সঙ্গে কবে কি করেছে; কোন্ এক প্রিন্স কোন্ মহিলাকে নিয়ে যাচ্ছেতাই করে বেড়াচ্ছে, এইসব কথায় খাবারগুলি যেন আরও সুস্বাদু হয়ে উঠলো।

কেচ্ছা শেষ হতেই শুরু হলো প্রেমের কথা। দুরয় বললে—প্রেম যে, দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এতে কোনোই সন্দেহ নেই। তবে কি না, এ পথের বাধা হলো ঈর্ষা।

মাদাম মোরেল বললে—প্রেমের মতো মধুর জিনিস আর কিছু হতে পারে না। তবে, পুরুষরা সময় সময় এত বেশি দাবি করে বসে যা পূরণ করা অনেক মেয়ের পক্ষেই অসম্ভব হয়ে ওঠে।

দুরয় বললে—আমি কিন্তু তেমন কিছু দাবি করিনে। বেশী কচলাতে গেলে লেবু তেতো হয় সে কথা আমার ভালই জানা আছে। এই সময় মাদাম ফরেস্তিয়ের বললে—প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়ে উভয়কে ভালবাসবে, একজন আর একজনকে ভালবাসার কথা শুনাবে, এটাই তো সুখ।

তার কথার উত্তরে মাদাম মোরেল বললে—আমি কিন্তু ওইটুকুতে খুশি নই। আমি আরো বেশি কিছু চাই।

এই সময় ফরেস্তিয়ের বললে—আপনার এই স্পষ্ট উক্তিটি প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু এ ব্যাপারে মশিয়েঁ মোরেলের মতটা কি জানতে পারি কি?

—তিনি এ সব নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামান না।

এমনি সব কথাবার্তার মধ্যে অবশেষে ভোজ পর্ব সমাপ্ত হলো। ভোজের পর আবার এলো মদ! তারপর কফি।

কফি পানের পর ফরেস্তিয়ের এমন কাশতে লাগলো যে, বেচারার একেবারে দম বন্ধ হবার উপক্রম। সে তাই স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে—চলো, এবার বাড়ি ফেরা যাক।

মাদাম মোরেল তখন ওয়েটারকে ডেকে বিল আনতে বললো। বিল যখন এলো তখন মাদাম মোরেলের বে-এক্তার অবস্থা। সে তখন পুরোদস্তুর মাতাল হয়ে পড়েছে। এমন অবস্থা যে, পার্স থেকে টাকা বের করবার মতো ক্ষমতা নেই।

সে তাই পার্সটা দুরয়ের হাতে দিয়ে বললে—বিলের দামটা দয়া করে মিটিয়ে দিন। আমি আর চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিনে।

বিল হয়েছে একশ' ত্রিশ ফ্রাঁ। দুরয় পার্স থেকে নোট বের করে বিল মিটিয়ে ওয়েটারকে দুই ফ্রাঁ বকসিস দিল। তারপর মাদামের দিকে তাকিয়ে বললে—অন্যান্য ওয়েটারদের জন্যে কত রেখে যাবো, মাদাম?

মাদাম স্খলিত কণ্ঠে বললে—রাখুন না! যা খুশি।

দুরয় তখন আরও পাঁচ ফ্রাঁ প্লেটের ওপর রেখে দিল। তারপর মাদামের দিকে তাকিয়ে বললে—আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব?

তাহলে তো খুবই ভাল হয়। আমার যা অবস্থা তাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই পারব না।

দুরয় তখন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে নিচে নেমে এলো তারপর ওয়েটারদের সাহায্যে দুখানা গাড়ি ডেকে আনিয়ে একখানা গাড়িতে ফরেস্তিয়ের দম্পতিকে তুলে দিয়ে অন্য গাড়িটিতে মাদাম মোরেলকে নিয়ে উঠে বসলো।

গাড়ির ঝাঁকুনিতে মাঝে মাঝেই মাদামের দেহটি দুরয়ের দেহের ওপরে এসে পড়ছে। দুরয়ের তখন ইচ্ছে হচ্ছে, ওকে বুকের মধ্যে চেপে ধরতে। ডিনারের সময় প্রেমের প্রসঙ্গে মাদাম যা বলেছিল সেই কথাটা মনে করেই দুরয়ের এইরকম ইচ্ছে হচ্ছিলো। কিন্তু ও রকম কিছু করতে গেলে মাদাম যদি একটা নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করে বসে এই ভয়ে সে নিজেকে সংযত করে রাখছিলো।

কিছুক্ষণ পরে মাদামের পা দুটো থর থর করে কেঁপে উঠলো। দুরয়ের মনে হলো, এটা ওর যৌন আবেদনের অভিব্যক্তি। কথাটা মনে হতেই তার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুত-প্রবাহ বয়ে গেল। সে দুই হাত দিয়ে মাদামকে

জাপটে ধরে আসনের ওপরে শুইয়ে ফেললো। মাদাম প্রথমটায় একটু বাধা দেবার চেষ্টা করলেও পরে ওর কাছে অত্মসমর্পণ করলো।

রতিক্রিয়ার পরে মাদামের অবস্থা যেন আরও কাহিল হয়ে পড়লো। সে আর নড়তে পারছে না দেখে তুরয় তুহাত দিয়ে তাকে তুলে বুকের ওপর চেপে ধরে বললে—শরীরটা কি খুবই খারাপ লাগছে?

মাদাম মোরেল মৃতুস্বরে বললে হুঁ।

একটু পরেই গাড়িটা মাদামের বাড়ির সামনে এসে থামলো। তুরয় তখন মাদামকে ধরে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে গাড়োয়ানকে বললে—তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি মাদামকে তাঁর ফ্লাটে পৌছে দিয়ে আসছি।

মাদাম মোরেলের পা তুটি তখন তুলছে। তুরয় তাকে তুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তার ফ্লাটের দরজার সামনে এনে কলিং বেল টিপলো।

সঙ্গে সঙ্গে মাদামের পরিচারিকা দরজা খুলে দিল। তুরয় তখন মৃতুস্বরে মাদামকে বললে—আবার কবে দেখা হবে আমাদের?

মাদাম বললে—আগামী কাল আমার এখানে লাঞ্চে এসো।

এই কথা বলেই দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

তুরয় তখন নিচে নেমে এসে গাড়োয়ানকে পাঁচ ফ্রাঁর একখানা নোট বকসিস দিয়ে বললে—তুমি এখন যাও। আমি হেঁটেই যাবো।

গাড়োয়ান চলে গেলে তুরয় বিজয়ী বীরের মত লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে শুরু করলো। চলতে চলতে সে নিজের মনে মনেই বললে—এই তো হয়ে গেল! আর কি! ওকে আমি পেয়ে গেছি।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই তুরয়ের মনে হলো মাদাম মোরেলের কথা। মাদাম আজ তাকে লাঞ্চের নিমন্ত্রন করেছে। তুরয় তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। তারপর একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে প্রাতঃরাশ সেরে নিয়ে আবার ফিরে এলো নিজের ঘরে। এসেই স্নান করলো সে। তারপর পোষাক পরে ফেললো। কিন্তু একি! ন'টাও বাজেনি যে! সময় আর কাটতে চাইছেনা আজ। ঘড়ির কাঁটা যেন ধীরে ধীরে চলছে!

অবশেষে এগারোটা বাজতেই সে বেরিয়ে পড়লো। হাঁটতে লাগলো গদাই লস্করী চালে। বারোটার আগে ওখানে যাওয়া উচিত হবে না। সে তাই সময় কাটিয়ে নেবার জন্যে একটা পার্কে গিয়ে বসলো। পার্কের বেঞ্চে

বসে নানা কথা মনে হতে লাগলো তার। "গতরাত্রে মাতাল হয়ে পড়েছিল মাদাম। মাতাল অবস্থায় তার মনের অবস্থা যা ছিল, সুস্থ অবস্থায় সেরকম না-ও থাকতে পারে। আজ সুস্থ অবস্থায় তার মনটা যদি বদলে গিয়ে থাকে তাহলে সে হয়তো আমার সঙ্গে দেখাই করবে না। হয়তো বাড়িতে ঢুকতেই দেবে না।"

আবার মনে হলে, "না, মাদাম ও-কাজ জেনে-শুনেই করেছে। আমি তাকে পেয়ে গেছি। সে এখন পুরোপুরিভাবে আমার মুঠোর ভেতরে।"

এই কথা মনে হতেই উঠে পড়লো হৃদয়।

মাদাম মোরেলের ফ্লাটের দরজার সামনে গিয়ে কলিং বেল টিপলো হৃদয়। মাদামের পরিচারিকা দরজা খুলে হৃদয়কে ড্রয়িং রুমে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে মাদামকে খবর দিতে গেল। হৃদয় তখন দেয়ালে টাঙানো আয়নার কাছে এসে চুল আর টাই ঠিক করে নিতে লাগলো। এই সময় হঠাৎ আয়নায় মাদাম মোরেলের প্রতিকৃতি দেখা গেল। হৃদয় তাকে দেখতে পাচ্ছে আয়নার মাঝে। মাদামও দেখছে তাকে। মুখে তার মৃদু হাসি।

হৃদয় ফিরে দাঁড়ালো। মাদাম তখন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। হয়তো হৃদয়ের জন্যেই অপেক্ষা করছে। হৃদয় দ্রুতপদে ছুটে এলো তার কাছে। মৃদুস্বরে বললে—আপনাকে আমি যে কী ভাল বেসেছি তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

মাদাম দুই হাত প্রসারিত করে ঝাঁপিয়ে পড়লো হৃদয়ের বুকে। মুখখানা তুলে ধরলো হৃদয়ের মুখের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিত হলো দুজনের ওষ্ঠাধর।

চুম্বনের পরে কোনো কথা বের হলো না হৃদয়ের মুখ থেকে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো মাদামের মুখের দিকে।

মাদামের মুখে মৃদু-হাসি। সে হাসি যেন বলছে, আমি তোমার।

মাদামই প্রথমে কথা বললো—বাড়িতে আজ কেউ নেই। নরিনকে তার এক বন্ধুর বাড়ি লাঞ্চ খেতে পাঠিয়েছি।

হৃদয় তখন মাদামের মুখে আর একবার চুমু দিয়ে বললে—এই জন্যেই তো তোমায় আমি এত ভালবাসি।

মাদাম হৃদয়ের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে একটা সোফায় বসালো। মাদামও বসলো তার পাশে। এমনভাবে বসলো যে, যেন ওরা স্বামী-স্ত্রী।

হৃদয় বললে—রাগ করোনী তো আমার ওপর?

—চুপ! ওসব কথা এখন নয়। পাশের ঘরে পরিচারিকা লাঞ্চের আয়োজন করছে, শুনে ফেলতে পারে।

শুনে উঠে পড়লো তুরয়। বললে—না, তোমার এত কাছে আমি বসতে পারবো না। পাগল হয়ে যাবো!

ওই সময় দরজা খুলে পরিচারিকা প্রবেশ করলো ঘরে। বললে—লাঞ্চ দেওয়া হয়েছে মাদাম।

খবরটা জানিয়ে দিয়েই সে চলে গেল। ওরা দুজনে তখন খাবার ঘরে গিয়ে পাশাপাশি হয়ে বসলো। এর পরেই শুরু হলো গল্প আর খানাপিনা।

মাদামের একখানা পা এগিয়ে এসেছে তুরয়ের পায়ের দিকে। তুরয় তার পা দিয়ে জোরে চেপে ধরলো মাদামের পা-টা।

লাঞ্চের পর আবার ওরা ড্রয়িং রুমে এসে আগের মতোই পাশাপাশি বসলো। তুরয় মাদামকে বুকে জড়িয়ে ধরবার জন্য হাত বাড়াতেই সে সরে বসলো। এরপর শুরু হলো লুকোচুরি খেলা। তুরয় ওর কাছে যত এগোতে চায় ও ততই সরে যায়।

—সরে যাচ্ছো কেন, ডার্লিং!

—কেউ এসে পড়তে পারে।

—কিন্তু আমি যে আর সহ্য করতে পারছি নে। তোমাকে একা কবে পাচ্ছি বলো!

তুরয়ের কথার উত্তরে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে মাদাম বললে—শীগগিরই একদিন তোমার ঘরে যাচ্ছি আমি।

—আমার ঘরে! সেটা যে একেবারেই বিশ্রী।

—তা হোক! আমি তো আর তোমার ঘর দেখতে যাচ্ছিনে। আমি যাবো তোমাকে দেখতে।

—বেশ, কবে যাবে বলো!

—এই সপ্তাহের শেষের দিকে।

—না, অতো দেরি আমার সইবে না। তুমি কালই এসো।

—বেশ, তাই হবে। কাল বিকেল পাঁচটায় আসছি। থাকতে পারবে তো ও সময়?

—থাকতেই হবে! আফিস থেকে একটা বাহানা করে বেরিয়ে পড়বো।

ঐই সময় কলিং বেলের আওয়াজ শুনা গেল। মাদাম বললে—জরিন এলো বোধহয়।

সত্যিই তাই। একটু পরেই লরিন এসে হাজির হলো ওদের সামনে। তুরয়কে দেখে খুশি হয়ে সে বললে—কী মজা। বেল-আমি এসেছে।

—'বেল-আমি'।

মাদাম বললে—লরিন আপনার নাম রেখেছে বেল-আমি। আমিও এখন ওই নামেই ডাকবো আপনাকে।

তুরয় লরিনকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলো।

তিনটে বাজতেই উঠে পড়লো তুরয়। মাদাম সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিল তাকে। সিঁড়িতে পা দিয়ে তুরয় বললে—মনে থাকে যেন, কাল বিকেল পাঁচটায়।

—হ্যাঁ, মনে থাকবে।

সেদিন আফিস থেকে ফিরবার পথে তুরয় কিছু জিনিসপত্র কিনলো ঘর সাজাবার জন্যে। পর্দা, ছবি, ফুলদানি এবং আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস। তাছাড়া কিছু কেক, এক বোতল ম্যাডিরা, দুখানা প্লেট আর দুটো গ্লাসও কিনলো।

পরদিন অফিসে হাজিরা দিয়েই বেরিয়ে পড়লো তুরয়। রিপোর্টারদের এ ব্যাপারে স্বাধীনতা আছে। নোট বই আর পেনসিল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হলো। তুরয় তাই চারটে বাজতেই বেরিয়ে পড়লো আফিস থেকে। তারপর সোজা চলে এলো নিজের ঘরে।

মাদাম এলো পাঁচটা পনের মিনিটের সময়। ঘরে ঢুকেই সে বললে—বাঃ। এই তো খাসা ঘর। কিন্তু সিঁড়িটা বড্ড নোংরা।

তুরয় ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে ওর মুখে চুমুর পর চুমু দিতে লাগলো।

এর পরেই একেবারে খাটে।

দেড় ঘণ্টা পরে মাদামকে গাড়িতে তুলে দিল তুরয়। বিদায় দেবার সময় তার হাতে চুমু দিয়ে বললে—সামনে মঙ্গলবার, ঠিক এই সময়, মনে থাকবে তো?

—নিশ্চয়ই মনে থাকবে।

মাদাম মুখ বাড়িয়ে দিল গাড়ির জানালা দিয়ে। তুরয় আবেগভরে একটা চুমু দিল মাদামকে।

মঙ্গল বার ঠিক সময়ই এলো মাদাম। সেদিনও ঠিক আগের দিনের মতোই রতিক্রিয়া চললো।

এমনি চলতে লাগলো দিনের পর দিন। কোনোদিন সকালে, কোনোদিন বা দুপুরের পরে। তিন সপ্তাহ যাবৎ এমনি চললো।

'এরপর একদিন দুরয় যখন বিকেলের দিকে মাদামের জন্যে অপেক্ষা করছে সেই সময় নিচে হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গেল। কে একজন কি একটা যেন বললে। তারপর একটি স্ত্রীলোকের কণ্ঠ—"ওই কুত্তীটা রোজ আসে জার্নালিস্টের ঘরে। আজ আমাদের নিকোলাসকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে।"

এরপর পুরুষ কণ্ঠে কে বললে—"ওকে আর এ বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। চলো, কথাটা জানিয়ে দিয়ে আসি জার্নালিস্টকে।"

সিঁড়িতে দুমদাম পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

পরক্ষণেই দরজায় করাঘাতের শব্দ। দুরয় দরজা খুলতেই মাদাম মোরেল পাগলের মতো ঘরে ঢুকে বললে—শুনেছো!

দুরয় যেন কিছুই জানে না এই রকম ভাব দেখিয়ে বললে—কি হয়েছে?

—ওরা আমাকে অপমান করেছে। যাচ্ছেতাই অপমান।

—কারা?

—নিচের ওই পশুগুলো।

এই কথা বলেই কান্নায় ভেঙে পড়লো মাদাম।

দুরয় তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আদর করে তার চোখের জল মুছে দিল। তারপর হাত পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলো তাকে।

মাদাম বললে—তুমি এখুনি ওদের শায়েস্তা করে এসো। শেষ করে দাও ওদের।

—অবুঝ হয়ো না ডার্লিং! ওদের সঙ্গে লাগতে যাওয়া মানে নিজেদের বিপদ ডেকে আনা। ওদের শায়েস্তা করতে হলে আমাকে থানায় যেতে হবে, তাতে হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে।

—কেন?

—কেন তা কি বুঝতে পারছো না? পুলিশ এলেই তোমাকে জেরা করবে। কেন এসেছো, এখানে কি দরকার—এইসব। ফলে কাগজে কাগজে তোমার নামটা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাতে কেলেঙ্কারীর একশেষ হবে।

—তাহলে আমাদের দেখা হবে কি করে? এ বাড়িতে আমি আর আসছি নে।

—না, এ বাড়িতে তোমাকে আসতে হবে না। আমি শীগ্‌গিরই কোনো ভদ্র পল্লীতে একটা ফ্লাট নেবো।

কিন্তু তাতে তো সময় লাগবে।

এর পরেই কি একটা কথা মনে পড়ায় হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো মাদাম। বললে—ঠিক আছে। তোমাকে এ ব্যাপারে কিছু করতে হবে না। আমিই ব্যবস্থা করবো। কি হয় না হয় কালই খবর পাবে। টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেবো তোমাকে।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মাদামের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। কি সে করবে সে কথাটা প্রকাশ না করে দুরয়কে দুহাত দিয়ে জাপটে ধরলো। আর কোনো ক্ষোভ নেই তার মনে। অতএব্……

পরদিন বেলা এগারটার সময় মাদামের টেলিগ্রাম পেলো দুরয়। টেলিগ্রাম লেখা—"পাঁচটায় ১২৭ রুফে দে কনস্তান্তিনোপলে এসো। মাদাম দুরয়ের ফ্লাটে। ক্লো।"

পরদিন বিকেল চারটের দুরয় হাজির হলো সেই নির্দিষ্ট বাড়িতে। দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করলো—মাদাম দুরয় এখানে ফ্লাট নিয়েছেন?

—হ্যাঁ, মশিয়ে। আপনিই কি মশিয়ে দুরয়?

—হ্যাঁ।

দরোয়ান তখন নিচের তলায় একটা ছোট ফ্লাটের দরজা খুলে দিয়ে বললে—এইটিই আপনাদের ফ্লাট, মশিয়ে।

ভেতর ঢুকে দুরয় দেখতে পেলো, ড্রয়িং রুমটা বেশ সাজানো গোছানো। শোবার ঘরটাও বেশ সুন্দর। ছোট হলেও ঘরটা বেশ। একখানা খাট, তাতে নরম বিছানা। এক পাশে ছোট একটা টেবিল আর একখানা চেয়ারও আছে।

ফ্লাটটা দেখে খুশি হলো দুরয়। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তিতও হলো। এই ফ্লাটের দরুন মোটা টাকা বেরিয়ে যাবে তার।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। দুই হাত প্রসারিত করে মাদাম এগিয়ে এলো দুরয়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দুরয় তাকে বুকে টেনে নিলো।

দুরয়ের বক্ষলগ্না হয়ে মাদাম বললে—ফ্লাটটা চমৎকার হয়েছে, তাই না?

—হ্যাঁ, বেশ ভাল।

—আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো কি ?

—কি জিনিস ?

—এখানে ঢুকতে সিঁড়ি ভাঙতে হবে না আমাদের। দুজনের কাছে দুটো চাবি থাকবে। যখন খুশি আসা যাবে। আপাততঃ তিন মাসের জন্তে নেওয়া হয়েছে ফ্লাটটা।

—ঠিক আছে, ভাড়া দেবার সময় হলে আমাকে বলো।

—ভাড়া আমি দিয়ে দিয়েছি। তিন মাসের ভাড়াই আগাম দিয়েছি।

—বেশ, ওটা তাহলে আমার কাছে পাওনা রইল। শীগগিরই দিয়ে দেবো।

—এটা তোমাকে দিতে হবে না। আমাদের ভালবাসার দাম হিসেবে এটা আমার খরচ।

কথাটা শুনে দুরয় মনে মনে খুশি হলেও মুখে অসন্তোষের ভাব দেখিয়ে বললে—না, এটা কখনও হতে পারে না।

মাদাম তখন তার কাঁধে হাত দিয়ে বললে—রাগ করো না, ডার্লিং। তুমি আর আমি তো আলাদা নই। আমাদের ভালবাসার জন্তে আমাকে কিছু খরচ করতে দেবে না ? বলো, তোমার এতে আপত্তি নেই।

দুরয় বললে—তুমি যখন এত করে বলছো, তাহলে তাই হোক।

এর পরেই অবাধ মিলন। আজ আর কোনো চিন্তা নেই। কেউ তাদের দিকে তাকাবে না, কেউ কিছু বলবে না। প্রেমিক আর প্রেমিকা তাই মনের আনন্দে শুয়ে পড়লো খাটের ওপরে।

এরপর থেকে রোজই ওদের মিলন চলতে লাগলো সেই নতুন ফ্লাটে।

এখন আর মাদাম বলে ডাকে না দুরয়। তার ক্লতিলদে নামটিকে সংক্ষিপ্ত করে সে ডাকে 'ক্লো' বলে। আর মাদাম তাকে বলে, 'বেল-আমি।'

কয়েক দিন পরে ক্লতিলদের কাছ থেকে একখানা টেলিগ্রাম পেলো দুরয়। তাতে লেখা—"আজ স্বামী আসছেন। এক সপ্তাহ দেখা হবে না। দুঃখিত।-ক্লো।"

টেলিগ্রামটা পড়ে মনে মনে দুঃখিত হলো দুরয়। রাগ হলো ক্লতিলদের স্বামী নামক অচেনা ব্যক্তিটির ওপর। কোথাকার কে এক মশিয়ে মোরেল এসে তাদের গোপন মিলনে বাধা সৃষ্টি করেছে! আর ক'দিন পরে এলে কি তার চলতো না ?

কিন্তু কি আর করা যায়! বাধ্য হয়েই এক সপ্তাহ নিরামিস আহার চলবে।

সপ্তাহ শেষ হলে আর একটা টেলিগ্রাম এলো।

"আজ পাঁচটায় থেকো—ক্লো।"

সাতদিন পরে দুজনের দেখা। দুরয় তো উপোষী ছাড়পোকা হয়ে ছিল। ক্লতিলদেকে পেয়েই সে তাকে নিয়ে শুয়ে পড়লো।

মিলন পর্ব শেষ হলে ক্লতিলকে বললে—চলো, আজ কোনো রেস্তোরায় গিয়ে ডিনার খেয়ে নিই।

—কোথায় খেতে চাও?

—যেখানে তোমার খুশি।

সন্ধ্যার পরে বেরিয়ে পড়লো দুজনে। চলতে চলতে ক্লতিলদে বললে—আজ আমাকে কোনো সস্তা দরের রেস্তোরায় নিয়ে চলো। যেখানে গরিব কুলি-মজুর আর মেহেনতি মানুষরা খানা খায়।

দুরয়ের এমন কোনো রেস্তোরা জানা ছিল না। সে তাই প্রেমিকাকে বললে—এ রকম কোনো রেস্তোরাঁ আমার জানা নেই। চলো, রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে দেখে নেওয়া যাবে একটা।

—বেশ, তাই চলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা নিম্নশ্রেণীর রেস্তোরাঁ দেখে ঢুকে পড়লো দুজনে। ভেতর ঢুকে ওরা দেখতে পেলো যে, পরিবেশটা নোংরা হলেও মেয়েদের জন্তে আলাদা কেবিন আছে গোটাকয়েক। এমনি একটা কেবিনে ঢুকে পড়লো ওরা। সামনের হলঘরে অনেকে বসে খাচ্ছে। একটা টেবিলে দুজন সৈনিকের সঙ্গে দুটি মেয়ে বসেছে। মেয়ে দুটির মাথায় টুপি নেই। আর এক টেবিলে বসেছে তিনজন আধ-বুড়ো লোক। তাদের দেখলে গাড়োয়ান বলে মনে হয়। আর একটা টেবিলে একটি লোক বসে পাইপ টানছে। তার চেহারা আর পোষাক দেখলে হাসি পায়।

মাদাম দে মোরেলের মতো অভিজাত শ্রেণীর একজন মহিলা আর একজন সুবেশ যুবককে ওখানে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল।

ওরা কেবিনে বসলে একজন বয় এসে সসম্মানে বললে—কি আনবো আপনাদের জন্তে?

—কি কি আছে?

—মাটন ও বীফ্।

—ঠিক আছে। মাটন আর ব্রেড দাও। স্যালাডটা একটু বেশি দিও। হ্যাঁ, পানীয় কি আছে?

পরিচারক একরকম সস্তা মদের নাম করলো। (অনেকটা আমাদের দেশের চোলাই মদের মতো) মাদাম শুনেই খুশি। বললে—দুই গ্লাস নিয়ে এসো।

খেতে খেতে ক্লাতিলদে বললে—শোনো ডিয়ার, আমায় একদিন কোনো সস্তা নাচঘরে নিয়া চলো। রেনি ব্ল্যান্সি নামে এই রকম একটি নাচঘর আমার জানা আছে। কয়েকবার গেছি সেখানে।

মাদামের কথা শুনে দুরয় তো অবাক! বললে—'রেনি ব্ল্যান্সি'-তে গেছো নাকি? কার সঙ্গে?

ক্লাতিলদে বুঝতে পারলো যে, দুরয়কে কথাটা বলা ঠিক হয়নি। সে তাই একটু থেমে বললে—সে লোকটা মারা গেছে।

এতদিন এ রকম কিছু মনে হয়নি দুরয়ের। আজই সে প্রথম বুঝলো যে, ওর জীবনের একটা অতীত ইতিহাস আছে। এবং সে ইতিহাস বিশেষ স্বচ্ছ নয়। যে লোকটার কথা এইমাত্র বললে ক্লাতিলদে, সেই অজ্ঞাত ব্যক্তিটিও যে, তারই মতো ওর প্রেমাস্পদ ছিল সে কথাটা মনে হতেই দুরয়ের মনটা ব্যথিত হলো। রাগও হলো সেই নাম-না-জানা লাভারের ওপরে।

দুরয় কোনো কথা বলছে না দেখে ক্লতিলদে আবার তাকে বললে—নিয়ে যাবে একদিন ওখানে। ভারী মজা হবে তাহলে!

দুরয় বললে—নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো। তোমার সঙ্গে নরকে যেতেও রাজী আছি আমি।

—না, অতোটা যেতে হবে না। রেনি ব্ল্যান্সি পর্যন্ত গেলেই চলবে।

কথাটা বলে হেসে উঠলো ক্লতিলদে।

দুরয়ও ইতিমধ্যে তার মনঃস্থির করে ফেলেছে। কি হবে ওর অতীত ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামিয়ে! সে তো আর ওকে বিয়ে করতে যাচ্ছে না!

খানা শেষ হলে রাস্তায় বেরিয়ে এলো ওরা।

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে ক্লতিলদে বললে—শোন ডার্লিং, এবার কার্নিভ্যালে আমি স্কুলের মেয়ে সাজবো। কেমন চমৎকার মানায় দেখতে পাবে।

দিন তিনেক বাদেই ওরা রেনি ব্ল্যান্সিতে গেল। ওখানে সমাজের নিচু

শ্রেণীর মানুষদের ভীড়। ক্লতিলদে তাদের সঙ্গে নাচলো। এতেই তার আনন্দ।

এরপর আরও অনেক নিম্নস্তরে জায়গায় চলতে লাগলো ওদের আনাগোনা। যেন পাশবিক আনন্দে মেতে উঠেছে দুজনে।

একদিন ক্লতিলদে এসে হাজির হলো পরিচারিকাদের মতো পোষাক পরে। দুরয়কে বললে—তুমি আজ একটা মিস্ত্রীর পোষাক পরে নাও। তারপর চলো কোনো থার্ড ক্লাস রেস্তোরাঁয় গিয়ে পানাহার করে আসি। কথাটা বলেই হেসে ফেললো ক্লতিলদে।

দুরয় কিন্তু মিস্ত্রীর পোষাক পরতে কিছুতেই রাজী হলো না। বললে না,—আমি ও রকম পোষাক পরে রাস্তায় বের হতে পারবো না।

ক্লতিলদে বললে—বেশ। তবে ভদ্রলোক হয়েই চলো। লোকে ভাববে বড় ঘরের সৌখিন যুবক বাড়ির পরিচারিকাকে নিয়ে এসেছে।

এমনি করে চলতে লাগলো ওদের অভিসার। সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের সঙ্গে বসে পানাহার করতে ভারী মজা লাগে ক্লতিলদের।

একদিন একটা নিকৃষ্ট রেস্তোরাঁয় ঢুকে ওরা দেখে যে, সেখানে গুণ্ডা শ্রেণীর একদল লোক বিশ্রী রকম হল্লো আর মুখ-খারাপ করছে। তাদের দেখে ক্লতিলদের ভয় ভয় করতে লাগলো। কোনোরকমে খানাপিনা শেষ করে বেরিয়ে এসে দুরয়কে বললে—ওরা যদি আমাকে অসম্মান করতে আসতো, তাহলে তুমি কি করতে?

—কি করতাম মানে। আমি তাহলে ওদের সঙ্গে লড়তাম। আমার সামনে কেউ তোমার গায়ে হাত দিতে এলে তাকে আমি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবো।

কথাটা শুনে খুশি হলো ক্লতিলদে। তার জন্যে দুই মরদে লড়াই করছে আর আসপাশের মানুষেরা তা দেখছে, এই দৃশ্যটি মনে মনে কল্পনা করে খুশি হলো যে।

এদিকে দুরয়ের পকেটের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হচ্ছে তার। চাল-চলনও এখন তার বড় মানুষের মতো। কিন্তু সেই বড়লোকী ঠাট বজায় রাখতে এবং বিশেষ করে প্রেমিকার জন্যে প্রতিদিন খরচ হওয়ায় তার অবস্থা রীতিমতো সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। এখন তার মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে যে, এর চেয়ে রেলের কেরানির জীবনও ভাল ছিল। তখন পেট ভরে খেতে না পেলেও কোনো দেনা ছিল না।

কিন্তু খবরের কাগজে চাকরিতে এসে এখন দেনায় মাথার চুল পর্যন্ত বিক্রী হয়ে যাবার মতো অবস্থা। এখন ত্রিশ ফ্রাঁর কমে তার দিন চলেনা। কিন্তু আয় আর কত? বেতন হিসেবে দুশ' ফ্রা। আর রাহা খরচ বাঁচিয়ে পঞ্চাশ ষাট ফ্রা'র মতো।

দুরয়ের এখন এমন অবস্থা যে, কেউ আর ধার দিতেও চায় না তাকে। আগে যাদের কাছে ধার নিয়েছিল তাদের দেনা শোধ না দেওয়াতেই আর কেউ ধার দিতে চায় না।

১৫ই ডিসেম্বর দুরয় দেখলো যে, তার পকেট একেবারে খালি। সে তাই লাঞ্চ না খেয়েই অফিসে গেল সে দিন। মেজাজ তার রীতিমতো তিরিক্ষে হয়ে আছে। পেটে খাদ্য না পড়লে প্রেম-ট্রেম কিছুই ভাল লাগে না। দুরয়েরও সেই অবস্থা। বেলা চারটের সময় ক্লতিলদের কাছ থেকে তার এলো—

"আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরো। ডিনার খেতে যাবো।"

দুরয়ের ইচ্ছে হলো তখুনি টেলিগ্রাম করে ক্লতিলদেকে আসতে নিষেধ করবে। কিন্তু টেলিগ্রাম করবার মতো পয়সাও আজ তার নেই। তাছাড়া ওকে আসতে নিষেধই বা করবে কেমন করে? সে তাই একখানা চিরকুট লিখে অফিসের একজন বয়ের মারফতে ক্লতিলদের কাছে পাঠিয়ে দিল। চিরকুটে লিখলো—

"রাত ন'টার সময় এসো।"

সাতটা বেজে গেছে। অফিসে তখন সম্পাদকের আর্দালী ছাড়া আর কেউ নেই। রাত ন'টায় ক্লতিলদে আসবে। এখন তাহলে কি করা যায়? অনেক ভেবে চিন্তে সে কলিং বেল টিপলো। সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকের আর্দালী এসে হাজির হলো তার কাছে।

সে আসতে দুরয় বললে—শোন ফকার্দ। ভুলে পার্স'টা বাড়িতে রেখে এসেছি। তুমি আমাকে তিনটে ফ্রা। ধার দিতে পার?

ফকার্দ তখনই তার পকেট থেকে তিনটে ফ্রা। বের করে দুরয়কে দিয়ে বললে—আর কিছু লাগবে কি?

—না, এতেই হয়ে যাবে, ধন্যবাদ।

দুরয় আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়লো অফিস থেকে। পথে একটা সস্তা রেস্তোরায় ঢুকে কিছু খেয়ে নিল। তারপর ফ্লাটে গিয়ে ক্লাতিলদের জন্তে অপেক্ষা করতে লাগলো।

নির্দিষ্ট সময়েই ক্লাতিলদে এসে হাজির হলো। তার চোখ মুখ খুশিতে

ঝলমল করছে। দুরয়ের দিকে তাকিয়ে সে বললে—চলো, বেরিয়ে পড়া যাক্।

—বাইরে গিয়ে কি দরকার! এখানেই বেশ আছি।

—না, চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে। চলো বাইরে যাওয়া যাক।

—না ডার্লিং, আজ আর বেরুতে ইচ্ছে করছে না। একটু তিক্ত কণ্ঠেই কথাটা বললে দুরয়।

দুরয়ের কথার স্বর শুনে ক্লতিলকে রীতিমতো বিস্মিত হলো। রাগও হলো কিছুটা। বললে—কি এমন দোষের কথা বলেছি তোমায়? একটু বাইরে বেড়াবার কথা বলেছি, তাতে রাগ দেখাবার কি আছে? বেশ, তুমি না যেতে চাও আমি একাই বের হচ্ছি! কারো মেজাজী কথা শোনার আমার অভ্যাস নেই।

ক্লতিলদের কথা শুনে দুরয় বুঝতে পারে যে, ওর সঙ্গে ওভাবে কথা বলাটা ঠিক হয়নি। সে তাই ক্লতিলদের হাত দুটি ধরে তাতে চুমু দিয়ে বললে—আমাকে ক্ষমা করো ডার্লিং। আমার অন্যায় হয়েছে। অফিসে আজ বড্ড ঝামেলা গেছে, তাই মেজাজটা······

দুরয়ের কথায় বাধা দিয়ে ক্লতিলদে বললে—তোমার আফিসের ব্যাপারে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। তাছাড়া অফিসে মেজাজ খারাপ হলে সেটা তুমি অফিসেই দেখিও, আমাকে নয়।

দুরয় বুঝতে পারে যে, ক্লতিলদে তার ওপরে রীতিমতো চটে গেছে। সে তখন ক্লতিলদেকে বুকে টেনে নিয়ে বললে—তুমি দুঃখ পাবে ভেবেই কথাটা তোমাকে বলিনি। আজ আমার মাথার ঠিক নেই, তাই কি যে আমার মুখ থেকে বেরিয়েছে তা আমি নিজেই জানি নে।

এই কথা বলেই দুরয় হাঁটু গেড়ে বসলো ক্লতিলদের পায়ের কাছে। তারপর দুহাত দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরে বললে—তুমি আমায় ক্ষমা করো ডার্লিং। বলো, ক্ষমা করেছো।

এবার ক্লতিলদের মনটা একটু নরম হলো। কিন্তু তবুও তার কণ্ঠে স্নিগ্ধতা এলো না। সে বললে—বেশ, আর কখনো এ রকম করে কথা বলো না আমার সঙ্গে। যাই হোক, এবার চলো বেরিয়ে পড়া যাক।

দুরয় তখন ক্লতিলদের কোমর ছেড়ে দিয়ে হাঁটু দুটি জড়িয়ে ধরেছে। সেই অবস্থাতেই সে বললে—আজকের দিনটা তুমি এখানেই থাকো, শুধু আজকের দিনটা।

—না, আমি তোমার কোনো কথা শুনতে রাজী নই। হয় তুমি আমার সঙ্গে বাইরে যাবে, না হয় এখানেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে।

—শোনো ডার্লিং, বিশেষ কোনো কারণেই আমি এ কথা বলছি।

—বেশ. তুমি তোমার কারণ নিয়ে থাকো, আমি চললাম।

ক্লতিলদে নিজেকে তুরয়ের বাহু বেষ্টনী থেকে মুক্ত করে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালো। তুরয় তখন ছুটে গিয়ে আবার তাকে জড়িয়ে ধরে বললে—আমার কথাটা একবার শোনো।

তুরয় তার মুখে চুমু দিতে চেষ্টা করলো। ক্লতিলদে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেকে তার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হলো।

তুরয় তখন মিনতি-ভরা কণ্ঠে বললে—ক্লো, ডার্লিং, আমার কথাটা একবার শোনো। কথাটা তোমাকে আমি বলতে চাইনি ; কিন্তু আমাকে ভুল বুঝে চলে যাচ্ছো দেখে বলতে বাধ্য হচ্ছি। আজ আমার পকেটে একটা স্যু-ও নেই।

কথাটা শুনে চমকে উঠলো ক্লতিলদে। তুরয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—বলছো কি তুমি!

—ঠিকই বলছি। আজ যে তোমাকে এক গ্লাস সস্তা পানীয় খাওয়াবো এমন পয়সাও আমার পকেটে নেই।

ক্লতিলদে তখনও তাকিয়ে আছে তুরয়ের মুখের দিকে। অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে—সত্যি বলছো?

তুরয় তখন আর কোনো কথা না বলে তার জামার পকেটগুলি উল্টে দেখালো। তারপর বললে—এবার বিশ্বাস হলো তো?

ক্লতিলদের মনে আর কোনো রাগ নেই। রাগের পরিবর্তে এখন তার মনটা ভরে উঠেছে দুঃখে আর অনুশোচনায়। সে তাই আবেগ ভরে তুরয়ের গলা জড়িয়ে ধরে বললে—আমাকে তুমি ক্ষমা করো ডার্লিং। তোমার অবস্থার কথা না জেনে তোমার মনে যে আঘাত দিয়েছি তার জন্যে আমি অত্যন্ত দঃখিত। কিন্তু, এ অবস্থা তোমার কি করে হলো বলো তো?

তুরয় অম্লান বদনে মিথ্যে কথা বললে—বাবা খুব অসুবিধেয় পড়ে আমার কাছে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। আমি তাই আমার কাছে যা ছিল তা তো পাঠিয়েছিই, উপরন্তু কিছু ধার করেও পাঠাতে হয়েছে। এখন আমার এমন অবস্থা যে, আগামী দুটি মাস আমাকে অর্ধাসনে থাকতে হবে।

• তুরয়ের কথা শুনে ক্লতিলদে দুঃখিত হয়ে বললে—তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহলে আমার কাছ থেকে কিছু ধার নিতে পারো।

—তুমি যে আমাকে কতখানি ভালবাসো তা আমি জানি, কিন্তু ডার্লিং তাই বলে আমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবার কথা তুমি মুখেও এনো না। একথা শুনলে আমি মনে বড় কষ্ট পাই।

এরপর আর কোনো কথা হলো না টাকা সম্বন্ধে। ক্লতিলদে তখন তুরয়কে তুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বিছানায় শুয়ে পড়লো। সেদিন যে ভাবে ওদের মিলন হলো সে কথা ওরা কেউ কল্পনাও করেনি আগে।

মিলন পর্ব শেষ হলে তুজনে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। ক্লতিলদে বললে—চলো, আজ হেঁটেই যাওয়া যাক।

চলতে চলতে ক্লতিলদে বললে—শোনো ডার্লিং, তোমার মতো অবস্থায় পড়ে কেউ যদি দেখে যে তার পকেটে একটা লুই পড়ে আছে, অথবা লাইনিং-এ আটকে আছে তাহলে কেমন হয় বলো তো!

তুরয় বললে—তাহলে সত্যিই খুব আনন্দ হয়।

ক্লতিলদের বাড়ির দরজায় এসে তুরয় তার কাছ থেকে বিদায় নিল। নিম্ন কণ্ঠে বললে—আগামী পরশু, আবার এই সময়, কেমন?

রাত্রে বাড়িতে ফিরে আলো জ্বালবার জন্তে পকেট থেকে দেশলাই বের করতে গিয়ে তার হাতে কি যেন ঠেকলো। আলো জেলে জিনিসটা বের করে নিয়ে দেখে, ত্রিশ ফ্রাঁর একটা মুদ্রা!

ওটা কি করে পকেটে এলো তা বুঝতে তার দেরি হলো না। রাগও হলো তার। মনে মনে স্থির করলো যে, সামনের তারিখেই ওটা সে ফিরিয়ে দেবে ক্লতিলদেকে।

পরের দিন তুরয় একটু বেলা করে উঠলো। তার শরীরটা এতই নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল যে, বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে হলো না। নিজের মনেই সে বললে—আজ তুটো অবধি শুয়ে থাকবো। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো যে, পকেটে একটা ফ্রাঁও নেই। যে ত্রিশটি ফ্রাঁ ক্লতিলদে তার পকেটে চালান করে দিয়েছে তা সে খরচ করবে না। আগামী কাল যখন সে আসবে তখন ওটা তাকে ফিরিয়ে দেবে।

সে তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে পড়লো বিছানা থেকে। তারপর জামা-প্যাণ্ট বদলে বেরিয়ে পরলো অর্থের সন্ধানে। কিছু অর্থ আজ তাকে ধার করতেই হবে।

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে একটা রেস্তোরাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলো সে। সঙ্গে সঙ্গে খিদেটা যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। সে তাই গুটি গুটি

পায়ে ঢুকে পড়লো রেস্তোরাঁর ভেতরে। কম করেই খেলো সে। পানীয় নিলে না একেবারেই। কিন্তু তাতেও খরচ হয়ে গেল আড়াই ফ্রাঁ।

বিকেলে অফিসে গিয়ে আর্দালির সেই তিনটে ফ্রাঁ-ও পরিশোধ করে দিল সে। মনে মনে বললে—কারো কাছ থেকে কিছু ধার করে এই সাড়ে পাঁচ ফ্রাঁ পূরণ করে দিলেই চলবে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না।

এদিকে ক্লতিলদেও নিয়মিত ভাবেই আসছে তার কাছে। এবং প্রায় প্রতিদিনই দুরয়ের পকেটে কিছু ফ্রাঁ চালান করে দিচ্ছে। একবার তার জুতোর মধ্যেও ঢুকিয়ে দিয়েছিল কয়েকটা ফ্রাঁ।

প্রথম প্রথম খুবই রাগ হতো দুরয়ের। মনে করতো, ক্লতিলদেকে এ কাজ করতে সে নিষেধ করে দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো কথাই বলা হয়নি। ব্যাপারটা যেন গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল তার।

ক্লতিলদেও তাকে ও বিষয়ে কিছু বলবার সুযোগ দেয়নি। দুরয় কিছু বলতে চেষ্টা করতেই সে তাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে তার মুখে চুমু খেতে থাকতো যে, কথা বলবার ইচ্ছে থাকলেও সে বলতে পারেনি।

এই সময় ক্লতিলদে একদিন বায়না ধরলো 'ফলিজবার্জার'-এ যাবার জন্যে। দুরয়কে বললে—আমি কোনোদিন 'ফলিজ বার্জার'-এ যাইনি। একদিন নিয়ে চলো সেখানে।

কথাটা শুনে দুরয় প্রথমে একটু ইতস্তত: করতে লাগলো। তার ইতস্তত: ভাব দেখে ক্লতিলদে বললে—ঘাবড়ে যাচ্ছো দেখছি! কি হলো?

—না, ঘাবড়ে যাবো কেন? আমি ভাবছি ওখানে তোমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

—নিশ্চয়ই ঠিক হবে। আমি আজই যাবো ওখানে।

দুরয়ের মনে হলো যে, ওখানে গেলেই র‍্যাচেলের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে। ক্লতিলদেকে তার সঙ্গে দেখলে ... কি কাণ্ড করে বসে কে জানে!

এই কথা মনেকরে সে আরএকবার ক্লতিলদেকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ক্লতিলদে জেদ ধরে বসলো, সে যাবেই।

দুরয় তখন বাধ্য হয়েই সম্মত হলো। নিজের মনকে সে এই বলে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করলো যে, সে তো আর ক্লতিলদের স্বামী নয়। তাছাড়া আগে-ভাগে গিয়ে একটা বক্সে বসলে র‍্যাচেল হয়তো দেখতেই পাবে'না তাদের।

মনে মনে একটু খুশিও হলো দুরয়। সে ক্লতিলদেকে বক্সে বসিয়ে শো

দেখাবে। ও মনে করবে যে, হুরয় ওর জন্তে যথেষ্ট খরচ করছে। সে যে পাশ পায় সে কথা তো আর ক্লতিলদে জানে না।

'ফলিজ বার্জার'-এ গিয়ে ক্লতিলদেকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে সে পাস নিয়ে এলো। তারপর চাল দেখিয়ে, তাকে নিয়ে একটা বক্সে গিয়ে বসলো।

ক্লতিলদের কিন্তু স্টেজের দিকে নজর নেই। ওখানে যে সব মেয়ে এসেছে তাদের দিকেই সে লক্ষ্য করছে। হঠাৎ সে দেখতে পেলো যে, মোটা মতো একটা মেয়ে বার বার তাদের দিকে তাকাচ্ছে। সে তাই দুরয়কে বললে—ওই দেখ, একটি মেয়ে আমাদের দিকে বার বার তাকাচ্ছে। ও বোধ হয় তোমাকে চেনে।

দুরয় বললে—না, না, তুমি ভুল করছো।

কিন্তু মুখে একথা বললেও সে মনে মনে বুঝতে পারছে যে, র‍্যাচেল হয়-তো এবার একটা কাণ্ড করে বসবে। দুবার সে দুরয়কে ইসারা করে ডেকেছে। কিন্তু দুরয় তাতে সাড়া দেয় নি। যেন তাকে দেখেনি এই রকম ভাব দেখিয়ে অন্ত দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু আর তা সম্ভব হলো না। র‍্যাচেল তাদের কাছে এসে দুরয়ের কাঁধে একটি মৃদু চাপড় দিয়ে বললে—কিগো! চিনতেই পারছো না যে?

দুরয় কোন উত্তরই দিল না তার কথায়।

র‍্যাচেল তখন রেগে গেছে। বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই সে বললে—কী ব্যাপার! বোবা হয়ে গেলে যে! এই মাগীটাকে আবার কোথা থেকে জোটালে? আগে তো একে কোনোদিন দেখিনি এখানে!

এবার আর চুপ করে থাকা সম্ভব হলো না দুরয়ের। সে বললে—তুমি এখুনি এখান থেকে দূর হও। নইলে আমি পুলিশ ডাকবো।

আর যায় কোথায়! পুলিশের কথা শুনে র‍্যাচেল একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললে—তবে রে ড্যাকরা মিনসে, আমাকে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছিস্। ডাক্ না তোর পুলিশ বাবাদের। তাদের আমি থোড়াই কেয়ার করি। তুই এত বড় শয়তান তা আমি আগে বুঝতে পারিনি। নতুন মাগী পেয়ে আজ তুই আমাকে ভুলেছিস। এ মাগীটাকে কোথা থেকে জোটালি বল্ তো?

ব্যাপার দেখে মাদাম মোরেলের তখন চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে। সে তখন ওখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। সে তাই তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে বক্স থেকে বেরিয়ে ছুটতে লাগলো।

সে চলে যাচ্ছে দেখে, তুরয়ও ছুটলো তার পেছনে। এদিকে র‍্যাচেল তখনও সমানে চিৎকার করে চলেছে—তোমরা ওই মাগীটাকে ধরো। ও আমার নাগরকে চুরি করে পালাচ্ছে।

ব্যাপার দেখে চারদিকে হাসির হুল্লোড় শুরু হলো। এই সুযোগে দুজন লোক ক্লতিলদের জামা ধরে টান মারলো।

তুরয় ছুটে গিয়ে তাদের সরিয়ে দিয়ে ক্লতিলদেকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

সামনে একটি খালি গাড়ি দেখে ক্লতিলদে উঠে পড়লো তাতে। তুরয়ও উঠে পড়লো। গাড়োয়ানকে বললে—রুয়ে দে কনস্তান্তিনোপলে চলো।

গাড়িতে বসে ক্লতিলদে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। তুরয় কি বলবে তা বুঝেই উঠতে পারলো না। অবশেষে সে ক্লতিলদের পিঠে হাত দিয়ে বললে—শোনো ডার্লিং। ওই মেয়েটার সঙ্গে আমার অনেক আগে পরিচয় ছিল, এখন আর ওর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমাকে বিশ্বাস করো…

তার কথায় বাধা দিয়ে ক্লতিলদে সাপের মতো ফোঁস করে উঠলো—তুমি একটি ইতর, পশু, লম্পট। আমার দেওয়া ফ্রাঁগুলো তুমি ওই মাগীর পেছনে খরচ করেছো। তুমি পশুর চেয়েও অধম।

এই বলে গাড়োয়ানের জামা ধরে টেনে সে বললে—গাড়ি থামাও।

গাড়ি থামলে ক্লতিলদে রাস্তায় নেমে পড়ে গাড়োয়ানের হাতে পাঁচ ফ্রাঁর একখানা নোট দিয়ে বললে—ওই লোকটা যেখানে যেতে চায় পৌঁছে দাও।

॥ ছয় ॥

পরদিন ঘুম ভাঙতেই গত রাত্রের কথাটা মনে পড়ে গেল হৃদয়ের। মাদাম মোরেলের সঙ্গে তার চির দিনের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। কী কুক্ষণেই যে ফলিজ-বার্জার-এ নিয়ে গিয়েছিলাম ওকে! না গেলেই হতো! কিন্তু এখন আর উপায় নেই। আর আশা নেই পুনর্মিলনের।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে দুঃখে মনটা ভরে উঠলো তার। সে তখন মনে মনে তার দেনার হিসেব করতে লাগলো। হিসেব করে দেখলো, মোট ছশ' আশি ফ্রাঁ সে ধারে মাদামের কাছে। এটা শোধ করে দিতেই হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। মনে মনে স্থির করলো, কারো কাছ থেকে চারশ' ফ্রাঁ ধার নিয়ে আজই মাদামের দেনাটা শোধ করে দেবে। এই কথা মনে হতেই সে তাড়াতাড়ি পোষাক বদলে বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে। প্রথমেই গেল ফরেস্তিয়ের-এর কাছে। কিন্তু তার কাছে থেকে কুড়ি ফ্রাঁর বেশি পেলো না। এরপর সে আরও অনেকের কাছে ধার করলো। শেষ পর্যন্ত আশি ফ্রাঁ হাতে এলো তার। এখনও দুশ' ফ্রাঁ বাকি। সে তখন নিজের মনেই বললে —দূর হোক্ গে ছাই। দেনাটা না হয় পরেই শোধ করা যাবে।

দিন পনের হৃদয় আর কোথাও বের হলো না। শুধু অফিস আর বাড়ি। কিন্তু তার পর থেকেই আবার তার মনটা ছোঁক্ ছোঁক্ করতে লাগলো নারী সঙ্গের জন্যে। অবশেষে আর থাকতে না পেরে র‍্যাচেলের কাছে গিয়ে হাজির হলো। র‍্যাচেল এবার আর তাকে পাত্তা দিল না। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে।

এদিকে আফিসেও খিটিমিটি চলছে ফরেস্তিয়ের-এর সঙ্গে। অসুখ বেড়ে যাওয়ায় তার মেজাজটা তিরিক্ষে হয়ে গেছে। সামান্য সামান্য ব্যাপারেই সে এখন চটে যায়। সেদিন একটা জরুরী খবর সংগ্রহের ভার দিয়েছিল হৃদয়কে। হৃদয় তা আনেনি বলে ফরেস্তিয়ের যাচ্ছেতাই বললে তাকে। এমন বিশ্রী-ভাবে সে কথাগুলো বললে যে, হৃদয়ের মনে হলো এখুনি ওর মুখে একটা ঘুসি বসিয়ে দেয়। কিন্তু অফিসের মধ্যে ও কাজটা করা তো সম্ভব নয়। সে তাই মনে মনে বললে—দাঁড়াও, এর শোধ আমি তুলছি। তোমার বউকে আমি আমার অঙ্কশায়িনী করছি।

এই মহৎ উদ্দেশ্যটা মনে রেখেই একদিন সে মাদাম ফরেস্তিয়েরের সঙ্গে

দেখা করলো। মাদাম একখানা সোফায় চিৎ হয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিল। শোয়া অবস্থাতেই দুরয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে—গুড্ মর্নিং বেল-আমি।

দুরয় চমকে উঠলো তার মুখে 'বেল-আমি' নামটি শুনে। বললে—এ নামে ডাকলেন কেন, বলুন তো?

মন ভোলানো হাসি হেসে মাদাম বললে—গত সপ্তাহে ফ্রতিলদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কথায় কথায় সে বললে যে, তার মেয়ে আপনাকে ওই সুন্দর নামটি দিয়েছে। আমারও ভাল লাগলো নামটা. তাই বলে ফেললাম।

দুরয় তার চোখ দুটি দিয়ে যেন গিলছিল মাদামকে। তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ, প্রতিটি খাঁজ, প্রতিটি উঁচু নীচু দুরয়ের মনে কামনার আগুন জেলে দিচ্ছে। সে তাই কায়দা করে বললে—আপনার সঙ্গে আমি দেখা করতে কেন আসিনে জানেন।

—কেন?

—আমার মনে হয়, এখানে না আসাই ভাল।

—কেন বলুন তো?

—আপনি কি তা বোঝেন না?

—না-বললে কি করে বুঝবো?

—আপনাকে আমি ভালবাসি, মানে আপনার প্রেমে পড়ে গেছি আমি।

—তাই নাকি! তবে তো বড় মুস্কিল দেখছি।

—মুস্কিল কেন?

—মুস্কিল কেন জানেন না বুঝি? তবে শুনুন! প্রেমে পড়া মানুষগুলো কেমন যেন ভেড়ার মতো হয়ে যায়। দেহের খিদের জন্যে যারা প্রেমে পড়ে বা প্রেমের কথা বলে আমার চোখে তারা পাগলা কুকুর ছাড়া আর কিছু নয়। আমি তাদের কাছ থেকে সব সময় দূরে থাকতে চেষ্টা করি।

মাদামের মুখে এখন আর হাসি নেই। বেশ গম্ভীর হয়ে গেছে মুখখানা।

দুরয় একটু ঘাবড়ে গেল তার মুখভাবের পরিবর্তন দেখে। মাদাম কিন্তু তখনও তার কথা শেষ করেনি। আগের কথার জের টেনে সে বলে চলেছে—শুনুন মশিয়ে দুরয়! আপনি যদি আমাকে আপনার প্রণয়িনী হিসেবে পাবেন বলে আশা করে থাকেন, তাহলে এখানে আর আসবেন না। তবে আপনি যদি আমাকে বন্ধু হিসেবে ভাবতে পারেন, তাহলে আমার দরজা আপনার জন্যে সব সময়ই খোলা থাকবে।

দুরন্ত বুঝতে পারলো যে, আর বেশি চটকাতে গেলে লেবু তেতো হয়ে যাবে। সে তাই বললে—আপনার বন্ধু হতে পারলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করবো।

দুরন্তের কথায় আন্তরিকতার সুর শুনে মাদাম তার হাত দুটি বাড়িয়ে দিল তার দিকে।

দুরন্ত সসম্মানে তার হাত দুটিতে চুমু দিয়ে বললে—আপনার মতো কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে জীবনে সুখী হতে পারতাম আমি।

কথাটা মাদামের মনটাকে দোলা দিল। সে তাই দুরন্তের হাতে হাত রেখে বললে—আমরা যখন উভয়ে উভয়ের বন্ধু হলাম তখন বন্ধুভাবে আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে চাই।

—নিশ্চয়ই দেবেন। আপনার পরামর্শ মতোই চলবো আমি।

—শুনুন। আপনাকে ওপরে উঠতে হবে। অনেক ওপরে। রিপোর্টারের কাজ নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। আমি তাই আপনাকে ওপরে ওঠবার সিঁড়ির সন্ধান দিচ্ছি। আপনি মাদাম। ওয়াল্টারের সঙ্গে দেখা করুন। লোক ভাল। আমার মনে হয় তাতে কাজ হবে।

—অশেষ ধন্যবাদ, মাদাম। আমি আপনার কথা মতোই কাজ করবো।

এরপর দুজনের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা হলো। মাদামের সঙ্গ যে দুরন্তের ভাল লাগে তা বুঝাবার জন্যে সে অনেকক্ষণ রইলো তার কাছে। অবশেষে বললে—এবার তাহলে আসি!

—হ্যাঁ, আসুন।

—হ্যাঁ, আর একটি কথা! আপনি যদি কোনোদিন বিধবা হন তাহলে আমার নামটা যেন মনে থাকে। তখন তো আমাদের বিয়েতে আর কোনো বাধা থাকবে না।

কথাটা বলেই দুরন্ত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মাদামের উত্তর শুনবার জন্যে সে আর দেরি করলো না।

মাদাম ফরেস্তিয়েরের কথাটা ভুলতে পারেনি দুরন্ত। সে তাই মনে মনে স্থির করে ফেললো যে, দু'এক দিনের মধ্যেই মাদাম ওয়াল্টারের সঙ্গে সে দেখা করবে।

সে তাই একদিন সকালে বাজারে গিয়ে কুড়িটি পীয়ার কিনে ফেললো। তারপর সেগুলিকে টিস্যু পেপার দিয়ে জড়িয়ে একটি চুপড়িতে এমন ভাবে

সাজানো যে, দেখলে মনে হয়, ওগুলো বাইরে থেকে পার্শেল হয়ে এসেছে।

চুপড়িটাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুরয় একখানা কার্ডে লিখলো—মাননীয়া মাদাম ওয়াণ্টারকে জর্জেস তুরয়ের যৎসামান্য উপহার।

কার্ডখানা চুপড়ির ওপরে আটকে দিয়ে সেটাকে নিয়ে তুরয় হাজির হলো মশিয়ে ওয়াণ্টারের বাড়িতে। বাড়ির দরোয়ানের হাতে চুপড়িটা দিয়ে সে বললে—এটাকে মাদাম ওয়াণ্টারের কাছে পৌছে দাও।

চুপড়িটা দারোয়ানকে দিয়েই সে চলে এলো সেখান থেকে।

পরদিন অফিসে গিয়ে সে একখানা চিঠি পেলো। চিঠিখানা লিখেছে মাদাম ওয়াণ্টার। সংক্ষিপ্ত চিঠি। ধন্যবাদের সঙ্গে ফলগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করে মাদাম লিখেছে : "প্রতি শনিবার আমি বাড়িতে থাকি"।

তুরয় বুঝতে পারলো যে, শনিবার সে তুরয়কে দেখা করতে বলেছে। চিঠিখানা পড়ে আনন্দে নেচে উঠলো তুরয়ের মনটা।

মনে মনে স্থির করলো, সামনের শনিবারেই মাদাম ওয়াণ্টারের সঙ্গে দেখা করবে সে।

শনিবার বিকেলের দিকে ওয়াণ্টার-ভবনে হাজির হলো তুরয়। মাদাম ওয়াণ্টার তখন ড্রয়িং রুমে বসে তার কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করছিল। তুরয়কে দেখে খুশি হয়ে সে বললে—আসুন মশিয়ে তুরয়। আপনার পীয়ার-গুলোর জন্যে ধন্যবাদ। জিনিসগুলো খুবই ভাল ছিল।

তুরয় বললে—ওগুলো আমার বাবা পাঠিয়েছেন আমাদের বাগান থেকে। আমি আরও পাঠাতে বলেছি।

এরপর মাদাম তুরয়কে সমাগত মহিলাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। পরিচয়ের পরেই শুরু হলো কথাবার্তা। নানা বিষয়ে কথাবার্তা চলতে লাগলো তাদের মধ্যে। তুরয় এমন স. মজার মজার কথা বলতে লাগলো যে, মহিলারা সবাই খুশি হলো তার কথা শুনে।

কথার ফাঁকে ফাঁকে তুরয় মাদাম ওয়াল্টারের চেহারাটা লক্ষ্য করতে লাগলো। ধনী লোকের বউ, তাই সামান্য একটু মোটা। কিন্তু মোটা হলেও চেহারার মধ্যে লাবণ্য আছে। যৌবন এখনও বিদেয় নেয়নি দেহ থেকে। মুখখানাও বেশ সুন্দর। তুরয় মনে মনে বললে—ঠেকা কাজ একে দিয়ে ভালই চলতে পারবে।

অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে বিদায় নিল তুরয়।

সে চলে গেলে মাদাম তার বান্ধবীদের দিকে তাকিয়ে বললেন—কেমন মনে হলো ভদ্রলোককে ?

মহিলামহল একবাক্যে জানালো—চমৎকার।

ওয়াল্টার-ভবন থেকে সন্ধ্যার সময় বেরিয়ে এলো দুরয়। রাস্তায় এসেই তার মনটা আনচান করে উঠলো নারী সঙ্গ লাভের আশায়। সে তাই আর একবার হাজির হলো র‍্যাচেলের কাছে। এবার কিন্তু আগের মতো তাকে অপমান করলো না র‍্যাচেল। দুরয়ও মিষ্টি কথা বলে তার সঙ্গে আপোষ করে ফেললো।

পরবর্তী সপ্তাহে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলো দুরয়ের জীবনে। প্রথমতঃ পত্রিকার সংক্ষিপ্ত সমাচার কলমের ভার পড়লো তার ওপরে, দ্বিতীয়তঃ মাদাম ওয়াল্টারের কাছ থেকে ডিনারের নিমন্ত্রণ পেলো সে।

'সংক্ষিপ্ত-সমাচার' কলমটার ভার আগে ছিল পত্রিকার ম্যানেজার মশিয়েঁ বোইসনেয়ার্দ-এর ওপরে। বয়স্ক লোক। কাজও বেশ ভাল বোঝে। বিগত ত্রিশ বছর ধরে সাংবাদিকের কাজ করছে। ফ্রানচাইসে যোগদান করবার আগে আরও দশখানা পত্রিকায় কাজ করেছে। তবে অভিজ্ঞতা থাকলেও ভাষার ওপরে তার ভাল দখল নেই।

মশিয়ে ওয়াল্টারও তা জানে। কিন্তু অপর কোনো যোগ্যতর লোক না পাওয়ায় বোইসনেয়ার্দ-এর হাতেই কলমটা ছেড়ে দিয়েছিল।

মশিয়েঁ ওয়াল্টার একাধারে পত্রিকার মালিক এবং প্রধান সম্পাদক। কিন্তু প্রধান সম্পাদক হলেও সে কোনোদিন কোনো সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেনি। তার কাজ হলো অপরের লেখা বিচার করা। এ কাজটা সে ভালই পারে। তবে এর চেয়েও ফ্রাঁ এবং লুই-এর হিসেবটাই সে বেশি বোঝে। সে চায় আরও প্রচার এবং আরও অর্থ। দুরয়কে তার ভাল লেগেছে। দুরয় পরিশ্রমী এবং অনুগত। লেখেও ভাল। তাছাড়া ইতিমধ্যেই সে স্কুপ নিউজ সংগ্রহ করতে ওস্তাদ হয়ে পড়েছে। এই জন্যেই 'সংক্ষিপ্ত সমাচার' কলমটার ভার তার হাতে তুলে দিল ওয়াল্টার।

এতে আর্থিক দিক থেকেও কিছুটা সুরাহা হলো দুরয়ের। এই কলম পরিচালনা করবার জন্যে মাসে বারো শ' ফ্রাঁ সে পাবে। তবে সবটাই তার বেতন নয়। রিপোর্টারদের পারিশ্রমিকও এর মধ্যে রয়েছে। দুরয় কিন্তু এর বেশিরভাগই নিজের পকেটে ফেলবে বলে মনস্থ করলো। কলমটি চালাতে

যে সব সংবাদ সংগ্রহ করতে হয় তা সে নিজেই যোগাড় করবে বলে স্থির করলো।

এরপর ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে চার'শ ফ্রাঁ অগ্রিম হিসেবে নিয়ে নিলো সে। মনে মনে স্থির করলো, এ থেকে মাদাম মোরেলের দেনাটা পরিশোধ করে দেবে। তার পরেই মনে হলো যে, বাকি একশ' কুড়ি ফ্রাতে মাস চলবে না। সে তাই মনে মনে সাব্যস্ত করলে যে, দেনাটা পরের মাসে শোধ করলেই চলবে।

অফিসে একটি আলাদা সিট পেয়ে গেল সে। রিপোর্টারদের ঘরের এক কোণে সে সিটটা। একটা বড় টেবিল এবং খান কয়েক চেয়ার রয়েছে সেখানে। টেবিলটাও বেশ সাজানো গোছানো।

তার পাশেই বসে ম্যানেজার বোইসনেথার্দ। সামনে একটি লম্বা টেবিলের দুধারে বসে রিপোর্টাররা। অবসর সময়ে ওই টেবিলে ওরা কাপ বল খেলে।

ফরেস্তিয়েরের শরীরটা ভেঙে পড়েছে। এখন আর সে কাপ বল খেলায় অংশ গ্রহণ করে না। কিছুদিন আগে সে কাপ-বল সেটটা কিনেছিল, সেটা সে দুরয়কে দিয়ে দিল।

ওয়াল্টার-ভবনে ডিনারের দিনটি এসে গেল। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। সে দিন কাপ বল খেলার বিশ পয়েন্টে সবাইকে ছাড়িয়ে গেল দুরয়। খেলায় জয়লাভ করে মনে মনে বললে—আজকের দিনটা ভালই যাবে মনে হচ্ছে।

সেদিন একটু সকাল সকালই বাড়ি ফিরলে দুরয়। বাড়ি ফেরার পথে মাদাম মোরেলের মতো একটি মেয়েকে দেখে তার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। কিন্তু একটু ভাল করে লক্ষ্য করতেই সে বুঝলো যে, মেয়েটি অপর কেউ। যাক্, বাঁচা গেল। ওর [illegible] সামনাসামনি দেখা হলেই হয়েছিল আর কি!

বাড়িতে ফিরে ডিনারের পোষাক পরতে পরতে বাবা মার কথা মনে হলো দুরয়ের। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলো, আগামী কালই বাবার কাছে একখানা চিঠি লিখে তার পদোন্নতির খবরটা জানিয়ে দেবে। বাবা মা'র কথা মনে হতেই গ্রামের বাড়িটার ছবি ভেসে উঠলো তার মনের পর্দায়। সীন নদীর ধারে ছোট একটি টিলার ওপরে তাদের বাড়িটা। বাবা মা সেখানে কি অবস্থায় আছেন কে জানে। গরীব মানুষ তাঁরা। কত আশা করেছিলেন,

ছুরয়, বড় হয়ে সংসারের অভাব দূর করবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ছুরয় তাঁদের কোনো সাহায্যই করতে পারেনি।

পোশাক পরা হয়ে গেলে ঘরের আলো নিভিয়ে বেরিয়ে পড়লো ছুরয়। পথে এক জায়গায় কয়েকটি পতিতা মেয়ে জটলা করছিল। তাদের মধ্যে একজন ছুরয়কে ইসারা করে ডাকলো। ছুরয় কিন্তু ফিরেও তাকালো না তার দিকে।

ওয়াল্টার-ভবনে এসে ছুরয় বেশ চালের সঙ্গে তার টুপি আর ছড়িটা একজন চাকরের হাতে দিয়ে হলঘরে প্রবেশ করলো। চমৎকার করে সাজানো হয়েছে ঘরটা। অনেকগুলো ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। মাদাম ওয়াল্টার তাকে দেখে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলো—আসুন মশিয়ে ছুরয়। আপনি আসাতে ভারী খুশি হয়েছি আমি।

ছুরয় সসম্ভ্রমে তাকে অভিবাদন করে বললে—আমিও খুব খুশি হয়েছি আপনার এখানে আসতে পেরে।

ছুরয় দেখলো, পত্রিকার দুজন ডিরেক্টর, মশিয়ে ফরমিন এবং মশিয়ে লারোচ ম্যাথু আগেই এসে হাজির হয়েছে। ছুরয় তাদের সঙ্গে করমর্দন করলো। লারোচ ম্যাথু হেঁজি-পেঁজি লোক নয়। রাজদরবারে তার বিশেষ খাতির। শোনা যাচ্ছে, সে নাকি শীগগিরই মন্ত্রী সভায় স্থান পাবে।

একটু পরেই সস্ত্রীক ফরেস্তিয়ের এসে হাজির হলো। মাদাম ফরেস্তিয়ের এসেছে হালকা গোলাপী রঙের পোশাক পরে। ভারী সুন্দর মানিয়েছে তাকে। ঘরের এক কোণে পার্লামেণ্টের দুজন সদস্য বসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল। মাদাম ফরেস্তিয়ের তাদের সঙ্গে দেখা করে কুশল বিনিময় করলো।

ফরেস্তিয়ের একখানা চেয়ারে বসে হাঁপাতে লাগলো। এক মাসের মধ্যেই সে খুব রোগা হয়ে গেছে। এখন সে দিনরাত কাশে।

এবার এলো নবার্ত দে ভার্ণে এবং মশিয়ে রিভ্যাল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের অপর দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো গৃহস্বামী মশিয়ে ওয়াল্টার এবং তার দুই মেয়ে। মেয়ে দুটির একজনের বয়স ষোল এবং আর একজনের আঠারো। বড়টির চেহারা নিতান্তই সাধারণ। কিন্তু ছোটটিকে দেখে চোখ ফেরানো যায় না।

মেয়ে দুটি ছুরয়ের সঙ্গে করমর্দন করে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট ছোট একটা টেবিলের ধারে গিয়ে বসলো।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আর শুধু একজন আসতে বাকি। তার জন্যেই

প্রতীক্ষা করছে সবাই। কথাবার্তাও তেমন কিছু হচ্ছে না। দুরয় দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে ওয়াল্টার তার কাছে এগিয়ে এসে বললে—আপনি বুঝি ছবি পছন্দ করেন! আচ্ছা দাঁড়ান, ভাল করে দেখাচ্ছি।

এই কথা বলেই একটা ল্যাম্প নিয়ে এলো সে। তারপর বেশ উৎসাহের সঙ্গে ছবিগুলো দেখাতে লাগলো। সবগুলো ছবিই নামকরা শিল্পীদের আঁকা। একটা ছবিতে দেখা গেল, এক বৃদ্ধ সৈনিক একটা কুকুরকে নাচ শেখাচ্ছে। ওয়াল্টার বললে—ছবিটা কেমন দেখছেন?

—চমৎকার! এ রকম ছবি······

দুরয়ের কথা শেষ হতে না হতেই পেছন দিকে মাদাম মোরেলের কণ্ঠ শুনতে পাওয়া গেল। তার কণ্ঠস্বর শুনেই দুরয়ের মুখের কথা আটকে গেল। বুকটা কেঁপে উঠলো দুরুদুরু করে।

ওয়াল্টার কিন্তু তখনও ছবির ব্যাখ্যাতেই মশগুল। বললে—এবার ওই ছবিটা দেখুন। এক রূপবতী নারীর জন্যে দুই মরদের লড়াই। মেয়েটি একখানা চেয়ারে বসে দুজনের লড়াই দেখছে।

ছবিটা দেখিয়ে ওয়াল্টার বললে—এটা কিনেছি একটা আর্ট একজিবিশন থেকে। এক তরুণ শিল্পীর আঁকা এ ছবি। আজ তাকে কেউ চেনে না, কিন্তু শীগ্‌গিরই ও বিখ্যাত হয়ে যাবে।

দুরয়ের কানে কিন্তু কোনো কথাই ঢুকছে না। ছবির দিকেও তার নজর নেই। সে বুঝতে পারছে যে, মাদাম মোরেল তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। দুরয় ভাবছে, কি করা যায় এখন! নমস্কার করবে কি ওকে? কিন্তু ও যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়! যদি কোনো অপমানজনক কথা বলে!

দুরয়ের অন্যমনস্ক ভাব দেখে মশিয়ে ওয়াল্টার অন্যদিকে চলে গেল।

এই সময় মাদাম ফরেস্তিয়েব কি মনে করে দুরয়ের কাছে এগিয়ে এসে বললে—শুনুন!

বাধ্য হয়েই ফিরে দাঁড়াতে হলো দুরয়কে। বললে—কি বলছেন?

—আমার এক বন্ধু একটা পার্টি দিচ্ছে, খবরটা যেন 'সংক্ষিপ্ত সমাচার কলম'-এ থাকে।

—নিশ্চয় থাকবে। আপনি নিউজটা লিখে দেবেন। যা লিখে দেবেন তাই বেরুবে।

এই সময় মাদাম মোরেল হঠাৎ বলে উঠলো—বেল-আমি যে আমাকে চিনতেই পারছেন না!

এবার আর কথা বলতে কোনো বাধা নেই। মাদাম মোরেলের মুখের দিকে তাকালো সে। লক্ষ্য করলো, মাদাম মৃদু মৃদু হাসছে। দুরয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। বললে—কি হলো আপনার? আজকাল যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছেন।

দুরয় তার সঙ্গে করমর্দন করে বললে—কাজের চাপে আর সময় করে উঠতে পারছি নে। পত্রিকার 'সংক্ষিপ্ত সমাচার কলম'-এর ভার পড়েছে আমার ওপর।

—তা আমি জানি। কিন্তু তাই বলে কি বন্ধুদের ভুলে যাবেন?

এই সময় এক স্থূলাঙ্গিনী মহিলা এসে হাজির হওয়ায় ওদের কথাবার্তায় ছেদ পড়লো।

মহিলাটিকে দুরয় চেনে না। কিন্তু যে ভাবে ঘটা করে তাকে অভ্যর্থনা করা হলো তা দেখে সে মাদাম ফরেস্তিয়েরকে জনান্তিকে বললে—মহিলাটি কে বলুন তো।

—ইনি হলেন ভাই-কাউন্টেস দে পাশিমুর। তবে নিজের নামটা ইনি সাক্ষর করেন 'পাউডার পাফ' বলে।

শুনে হাসি পেয়ে গেল দুরয়ের। 'পাউডার পাফ'-নামটি সে আগেই শুনেছে। তার ধারণা ছিল, এ নামে যে মহিলা নিজেকে পরিচয় দেয়, সে বোধ হয় কোনো তন্বী নারী। কিন্তু তার পরিবর্তে এক বে-ঢপ সাইজের বিপুল বপু লাল মুখো নারীকে দেখে সে মনে মনে বললে—"পাউডার পাফই বটে!"

এই সময় ভ্যালেট এসে খবর দিল—ডিনার দেওয়া হয়ে গেছে

ডিনার টেবিলে গিয়ে আসন গ্রহণ করবার পর দুরয় দেখতে পেলো যে, তার দুই পাশে বসেছে দুটি নারী। এক পাশে মশিয়ে ওয়াল্টারের মেয়ে রোজ আর অন্য পাশে মাদাম মোরেল। দুরয় রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করলো এতে। মাদাম মোরেল কি আগের মতোই আছে?—

একটু পরে দুরয়ের পায়ের সঙ্গে মাদামের পা ঠেকলো। দুরয় নিজের পাটা আর একটু এগিয়ে দিল। মাদাম তার পা সরিয়ে নিল না দেখে সাহস বেড়ে গেল দুরয়ের। সে তার হাঁটুটা মাদামের হাঁটুতে ঠেকিয়ে একটু চাপ দিল। প্রত্যুত্তরে মাদামও চাপ দিল দুরয়ের হাঁটুতে। এর অর্থ বুঝতে

দেরি হলো না ডুরয়ের। সে বুঝতে পারলো, এটা হলো পুনরায় শুরু করবার নীরব আহ্বান।

এর পরেই শুরু হলো কথাবার্তা। তবে মুখের কথার থেকে চোখে চোখেই বেশি কথা হতে লাগলো। রোজের সঙ্গেও বাক্য বিনিময় হলো বার কয়েক।

একটু পরেই শুরু হয়ে গেল রাজনৈতিক আলোচনা। খানার টেবিল গরগরম হয়ে উঠলো দেখতে দেখতে।

খানা-পিনা শেষ হলে বিদায় নেবার সময় হয়ে এলো। ডুরয় তখন মাদাম মোরেলকে জনান্তিকে বললে—চলো, তোমাকে বাড়ি পৌছে দিই।

—না, আমার সঙ্গে আজ মশিয়েঁ ম্যাথু যাবেন। এ বাড়িতে ডিনারে এলে তিনিই আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেন।

—আবার কবে দেখা হচ্ছে তাহলে ?

—আগামী কাল তুমি আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে।

এই কথা বলেই সরে গেল মাদাম।

ডুরয় তখন মাদাম এবং মশিয়েঁ ওয়াল্টারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চললো। সিড়ি দিয়ে নামবার সময় সে দেখলো যে, কবি নবার্ত-ও আসছে তার পেছনে।

নবার্ত বললে—চলুন, ডুজনে এক সঙ্গেই যাওয়া যাক। হেঁটে যেতে রাজী আছেন তো ?

—নিশ্চয়।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাঁটতে লাগলো ডুজনে। কারো মুখেই কোনো কথা নেই। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ডুরয় বলে উঠলো—মশিয়ে ম্যাথু খুব হুশিয়ার লোক। তাই না ?

—আপনার বুঝি তাই মনে হয় ?

—হ্যাঁ, আমার মনে হয় চেম্বারে ওঁর মতো পাকা লোক আর দ্বিতীয় নেই।

—হ্যাঁ, বাদা বনে শেয়াল রাজা। যে রাজ্যে সবাই অন্ধ সেখানে কানা লোকই রাজা।

একটু থেমে মশিয়ে নবার্ত আবার বলতে শুরু করলো—চেম্বারের সদস্যরা প্রায় সবাই অপদার্থ। অর্থ আর রাজনীতি ছাড়া আর কিছু এরা বোঝে না। এদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমি হাঁপিয়ে উঠি। আগে অবশ্য কিছু জ্ঞানী লোকও ছিলেন চেম্বারে। কিন্তু তাঁরা এখন সবাই পরলোকে।

নবার্ত তখনও বলে চলেছে—এখনও যে দু-একজন আছেন তাঁদেরও দিন ফুরিয়ে এসেছে।

দুরয় বললে—আপনার মেজাজটা আজ বিশেষ ভাল নেই বলে মনে হচ্ছে।

—মেজাজ আমার চিরদিনই এই রকম। আমার মতো বয়স হলে আপনার মেজাজও আমার মতোই হবে। কিছুই প্রত্যাশা করবার নেই আর—একমাত্র মৃত্যু ছাড়া।

কথাটা শুনে হেসে উঠলো দুরয়।

তাকে হাসতে দেখে নবার্ত বললে—হাসবেন না। আপনিও একদিন সব কিছুর পেছনে মৃত্যুর ছায়া দেখতে পাবেন। তখন মনে হবে প্রেম, অর্থ, খ্যাতি—এ সবই অনিত্য, এবং মৃত্যুই একমাত্র নিত্য। গত পনের বছর ধরে এই মৃত্যুর ছায়াই আমি দেখতে পাচ্ছি। একটা হিংস্র জানোয়ারের মতো মুখব্যাদান করে সে যেন আমার দিকে এগিয়ে আসছে আর আমি প্রাণপণে একে রুখতে চেষ্টা করছি।

একটু থেমে নবার্ত আবার শুরু করলো—এই যে আমরা আজ দুনিয়ার বুকে চলাফেরা করছি, আমরা কেউই একদিন থাকবোনা। প্রত্যেক ধর্মমতই কত আশার কথা শুনায়, কিন্তু সে সবই ভুয়া? একমাত্র সত্য হলো মৃত্যু। আমি তাই কোনো আশার আলোই দেখতে পাচ্ছি নে। তাই তো একমাত্র কবিতা লেখা নিয়ে পড়ে আছি।

এরপর আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে নবার্ত আবার বললে—আমি তাই আজ জীবনের মানে খুঁজতে চাঁদের দিকে তাকাই। কিন্তু চাঁদও আমাকে হতাশ করে। সে যেন মুখ ভার করে বলে—নেই, নেই, কিছু নেই।

কথা বলতে বলতে পন্ত্ দে লা কনকর্দ-এ এসে গেল ওরা। এই সময় দুরয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে নবার্ত হঠাৎ বললে—শুনুন মশিয়ে। আপনি একটা বিয়ে করে ফেলুন। তাহলে অন্তত বুড়ো বয়সে আমার মতো নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হবে না। বুড়ো বয়সে যদি ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী থাকে তো তাদের নিয়েই দিন কাটানো যায়।

রুয়ে দে বেরসন-এর কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা। ওই রাস্তায় একটি বড় বাড়ির সামনে এসে নবার্ত হঠাৎ অন্তরঙ্গভাবে বলে উঠলো—আমার আবোল-তাবোল কথা শুনে কিছু মনে করো না ভায়া। তুমি তরুণ, এখন তোমার মনে যা চায় তাই তাই করে যাও। গুড্ নাইট।

বাড়ির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো নবার্ত। দুরয় এখন একা

একা পথ চলতে লাগলো। নবার্ত-এর কথাগুলোই বার বার তার মনে হচ্ছে এখন।

অনেকটা পথ চলার পর হঠাৎ একটি মহিলাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো দুরয়। মহিলাটি একখানা গাড়ি থেকে নেমে তার বাড়িতে ঢুকছিল। তার দেহ থেকে চমৎকার সেন্টের সুবাস এসে নাকে ঢুকছিল দুরয়ের।

মহিলাটি কিন্তু দুরয়ের দিকে ফিরেও চাইলো না। সোজা ঢুকে গেল বাড়ির ভেতরে।

তাকে দেখে দুরয়ের হঠাৎ মনে হলো ক্লতিলদের কথা। আগামী কালই আবার তাকে পাচ্ছে সে।

বাড়িতে পৌছে তাড়াতাড়ি পোষাক বদলে শুয়ে পড়লো দুরয়।

পরদিন একটু সকাল করেই ঘুম ভাঙলো দুরয়ের। বাইরের দিকে তাকাতেই সে দেখলো যে, সোনালী সূর্যালোকে প্রকৃতি ঝলমল করছে। একটি রাতের মধ্যেই প্রকৃতির চেহারা যেন পাল্টে গেছে। শীতের তীব্রতা কেটে গিয়ে দেখা দিয়েছে গরমের আবহাওয়া।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে পোষাক পরে নিল দুরয়। তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। সে মনে মনে স্থির করলো যে, বারোটা নাগাদ ক্লতিলদের ফ্লা' যাবে সে। তারপর ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে দুজনে সোজা চলে যাবে তাদের মিলন-মন্দিরে। সেখানে গিয়ে…

হাঁটতে হাঁটতে একটি খোলা াঠে গিয়ে হাজির হলো দুরয়। ওখানে প্যারীর অনেক ধনাঢ্য মেয়ে পুরুষ ঘোড়া ছোটাচ্ছে। দুরয় ওদের সবাইকে চেনে। খবর রাখে ওদের নাড়ী নক্ষত্রের। যে সব মেয়ে টাইট ব্রিচেস পরে ঘোড়া ছুটাচ্ছে তাদের প্রেমাস্পদদের নামগুলো মনে মনে আউড়ে চলে দুরয়। সবাইকে বাপান্ত করে মনে মনে। কে পরের ধনে পোদ্দারী করছে, কে বউয়ের রোজগারে বাবুগিরি করে সে সব কথা জানতে বাকি নেই দুরয়ের।

হঠাৎ একটা হুড খোলা গাড়ি ঢুকলো মাঠে। গাড়িটা চালাচ্ছে একটি তরুণী। দুরয় তাকে দেখেই চিনলো। প্যারীর বিখ্যাত গণিকা সে। গাড়ি টানছে দুটি স্বাস্থ্যবান সাদা ঘোড়া। সোফারকে পেছনে বসিয়ে নিজেই গাড়ি চালাচ্ছে তরুণীটি। মাঠে নেমেই গাড়িটা পাল্লা দিয়ে ছুটতে লাগলো সামনের দিকে। দুরয় বুঝতে পারলো, সে আজ টেক্কা মারতে চাইছে অভ্যাগতদের ওপর।

ওকে দেখে ভাল লাগলো দুরয়ের। মনে মনে বললে—চমৎকার রেস্। ভদ্রবেশী গণিকাদের সঙ্গে আসল গণিকার বাজী! কে জেতে কে জানে? যে-ই জিতুক, আমাকে জিততেই হবে। ওদের ঘাড়ে পা দিয়েই ওপরে উঠতে হবে আমাকে!

এই কথা ভাবতে ভাবতে দুরয় আবার চলতে শুরু করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পৌঁছে গেল মাদাম মোরেলের বাড়িতে।

ঘরে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল ক্লতিলদের সঙ্গে। দুরয়ের মনে হলো, সে এতক্ষণ তার জন্যেই প্রতীক্ষা করছিল।

পরিচারিকা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ক্লতিলদে দুরয়ের কাছে ছুটে এসে তাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে মুখখানা তুলে ধরলো তার মুখের সামনে। দুরয় তখন চুমোয় চুমোয় ভরে দিল তার ঠোঁট, গাল, কপাল, নাক, চোখ, এবং কণ্ঠ। সে যেন গিলে ফেলতে চাইছে ক্লতিলদেকে।

প্রথম উচ্ছ্বাস কেটে গেলে ক্লতিলদে বললে—কি জ্বালায় যে জ্বলে মরছি সে কথা আর কি বলবো! আশা করেছিলাম, আজ তোমাকে নিয়ে ফ্লাটে যাবো। কিন্তু হতচ্ছাড়া স্বামীটা এসে সব ভেস্তে দিয়েছে। ছয় সপ্তাহ ছুটি নিয়ে আমার হাড় জ্বালাতে এসেছে। তবে এই ছয় সপ্তাহই যে আমি উপোষ করে থাকবো তা নয়। একটা না একটা পথ বের করতেই হবে আমাকে। সামনের সপ্তাহে তুমি আমাদের এখানে ডিনার খেতে এসো। ওই দিন আমার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো।

দুরয় যেন আকাশ থেকে পড়লো এ-কথা শুনে। আসল পতির সঙ্গে উপপতির পরিচয় করিয়ে দিতে চায় মেয়েটা! সাহস তো কম নয় ওর!

কথাটি মনে হতেই দুরয় বলল—না, না, এটা কখনো হতে পারে না। শেষে হয়তো একটা কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।

—কেলেঙ্কারী হবে কেন? এ রকম তো হামেশাই হচ্ছে। তোমার কোনো ভয় নেই। ভয় থাকলে কি আমি তোমাকে আসতে বলতাম, আমি জানি যে, আমার ভ্যাড়াকান্ত স্বামীকে তুমি সহজেই বশ করতে পারবে!

ক্লতিলদের মুখ থেকে এই অভয়বাণী শুনবার পর রাজী হলো দুরয়। বললে—আমি তাহলে এখন আসি।—

হাঁ, এসো। দুজনে একসঙ্গে লাঞ্চ খাবো ভেবেছিলাম, তা হলো না বলে আমি দুঃখিত।

দুরয় তখন ভারাক্রান্ত মনে বিদায় নিল ক্লতিলদের কাছে।

সোমবার সন্ধ্যার পরে তুরয় হাজির হলো মাদাম মোরেলের বাড়িতে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠবার সময় তার কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকতে লাগলো। মশিয়ে মোরেল তাকে কিভাবে রিসিভ করবে। কিন্তু এখন তো আর ফিরে যাওয়া চলে না। তুরয় তাই ধীরে ধীরে তার পরিচিত ফ্লাটটির সামনে গিয়ে কলিং বেল টিপলো।

সঙ্গে সঙ্গে মাদামের পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিল।

ড্রয়িং রুমে কিছুক্ষণ বসবার পরেই মশিয়ে আবির্ভূত হলো। তুরয়কে দেখে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

ভদ্রলোকের চেহারাখানা বেশ জাঁদরেল গোছের। মুখে দাড়ি। দেহ স্বাস্থ্যবান। ক্লতিলদের সঙ্গে মোটেই মানায় না।

তুরয়ের সঙ্গে করমর্দন করে মশিয়ে বললে—ভারী খুশি হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। আমার স্ত্রী প্রায়ই আপনার কথা বলেন।

দুজনে পাশাপাশি বসলো ওরা।

মশিয়ে মোরেল বললে—সাংবাদিকতায় কতদিন আছেন?

—বেশি দিন নয়, মাসকয়েক হলো এ কাজে ঢুকেছি।

—বলেন কি! আমি তো ভেবেছিলাম আপনি পুরোনো সাংবাদিক। আপনার লেখা পড়েই এ রকম ধারণা হয়েছিল আমার।

ওদের মধ্যে যখন এই সব কথা হচ্ছে, সেই সময় বসন্তের হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকলো মাদাম মোরেল। তুরয়ের দিকে তাকিয়ে হাসি ভরা কণ্ঠে বললে—এর মধ্যেই জমে গেছেন দেখছি!

মশিয়ে মোরেল বললে—মশিয়ে তুরয়কে আমার খুবই ভাল লেগেছে।

—ওঁকে তোমার ভাল লাগবে আমি জানতাম।

এই সময় লরিন এসে হাজির হলো সেখানে। তুরয়কে দেখে খুশি হলো সে। তার কাছে এগিয়ে এসে কপালটি তুলে ধরলো তার মুখের সামনে।

তুরয় তার কপালে চুমো দিয়ে বললে—বসো লরিন।

মাদাম মোরেল বললে—আজ তো তুমি 'বেল-আমি' বললে না!

মায়ের কথা শুনে লজ্জিত হলো লরিন।

একটু পরেই মাদাম এবং মশিয়ে ফরেস্তিয়ের এলো। ফরেস্তিয়েরের শরীরটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। তার দিকে তাকিয়ে তুরয় বললে—কেমন আছো বন্ধু?

—ভাল না। ডাক্তার হাওয়া বদল করতে বলেছে।

—তাই করো না।

—হ্যাঁ তাই করছি এবার। আগামী বৃহস্পতিবার ক্যান্নেস-এ যাচ্ছি আমরা। সময় পাও তো ওই দিন একবার আমার বাড়িতে যেও।

দুরয় বললে—নিশ্চয়ই যাবো।

মাদাম ফরেস্তিয়েরের সঙ্গে সেদিন আর বিশেষ কোনো কথা হলো না দুরয়ের। ডিনার শেষ হতেই সে স্বামীকে নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় দুরয়ের দিকে তাকিয়ে বলে গেল—অবশ্যই আসবেন কিন্তু।

ওরা চলে যাবার পর দুরয় বললে—চার্লস বোধ হয় বেশি দিন বাঁচবে না।

মাদাম মোরেল বললে—না, আর কোনো আশা নেই। ভাগ্যিস ম্যাডালিনের মতো মেয়েকে স্ত্রীরূপে পেয়েছেন, ন'লে ওঁর কি যে হতো তা আমি ভাবতেই পারি নে।

—ভদ্রমহিলা বুঝি ওঁকে খুব সাহায্য করেন? প্রশ্ন করলো মশিয়েঁ মোরেল।

তার প্রশ্নের উত্তরে মাদাম মোরেল বললে—সাহায্য মানে! ম্যাডেলিনই তো সব করে। মশিয়েঁ ফরেস্তিয়েরের উন্নতির মূলেই তো ম্যাডেলিন। এমন বাহাদুর মেয়ে খুব কমই আছে। যে কোনো পুরুষকে উপরে তুলে দিতে পারে ও।

দুরয় বললে—স্বামী মারা গেলে উনি আবার বিয়ে করবেন নিশ্চয়?

—তা করবে বৈকি! কাকে বিয়ে করবে তাও আমি জানি।

মাদামের কথা শুনে মশিয়েঁ মোরেল বললে—পরের ঘরের কথায় থাকা তোমার একটি বদ অভ্যাস। এ সব আমি পছন্দ করি নে।

দুরয় তখন ওখানে আর বেশিক্ষণ থাকা অনুচিত মনে করে মশিয়েঁ মোরেলের কাছে বিদায় গ্রহণ করলো।

বৃহস্পতিবার সকালেই দুরয় হাজির হলো ফরেস্তিয়েরের ফ্লাটে। ওখানে গিয়ে সে দেখতে পেল যে, ফরেস্তিয়ের দম্পতি তখন বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। জিনিসপত্র সবই বাঁধা-ছাদা হয়ে গেছে।

দুরয় ফরেস্তিয়েরকে বললে—আশা করি চেঞ্জে তোমার শরীরটা সারবে।

ফরেস্তিয়ের ক্ষীণ হাসি হেসে বললে—দেখা যাক কি হয়।

আরও দুচারটে কথা বলে দুরয় বিদায় নিল ফরেস্তিয়েরের কাছে। যাবার সময় বলে গেল—এবার চলি আমি বন্ধু। আবার দেখা হবে আশা করি।

মাদাম ফরেস্তিয়ের তুরয়ের সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এলো। তুরয় আন্তরিকতার সঙ্গে বললে—আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বের চুক্তি হয়েছিল তা আপনার মনে আছে তো? কোনো রকম সাহায্যের দরকার হলে বিনা দ্বিধায় আমাকে জানাবেন। আপনার চিঠি পেলেই আমি আপনার কাছে গিয়ে হাজির হবো।

মাদাম বললে—আপনার কথা আমার মনে থাকবে।

তুরয় সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেখলো যে কাউণ্ট ভাদ্রেক ওপরে উঠছেন। মুখোমুখি হলে তুরয় তাকে নমস্কার করলো। কাউণ্টও প্রতি নমস্কার জানালেন তুরয়কে।

॥ সাত ॥

ফরেস্তিয়ের চলে যাবার পর ফ্রানচাইস-এর রাজনৈতিক বিভাগের ভার এসে গেল তুরয়ের হাতে। এর ফলে অফিসে তার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেল। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ তার নামেই বের হতে লাগলো। এছাড়া তার নিজস্ব 'সংক্ষিপ্ত সমাচার কলম' তো আছেই।

এই সব কাজে কিছু কিছু বাদাণুবাদের মধ্যেও তাকে পড়তে হতো মাঝে-মাঝে। তবে তুরয় সে সব গ্রাহ্যই করতো না। কিন্তু একদিনকার একটা সংবাদ প্রকাশের ফলে তাকে বেশ একটু বে-কায়দায় পড়তে হলো। প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা লা প্লুম তুরয়ের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নামলো। লা প্লুমের একজন সাংবাদিক বেনামে তুরয়কে আক্রমণ করলো মিথ্যা সংবাদ প্রচারের অভিযোগ করে।

সংবাদটা ছিল আবার্ত নামে একটি স্ত্রীলোককে পুলিশে পাকড়ানো সম্পর্কে। খবরটা বেরিয়েছিল ফ্রানচাইস-এর সংক্ষিপ্ত সমাচার কলমে। কিন্তু লা প্লুমের বেনামী লেখক জোরালো ভাষায় লিখলো যে, ফ্রানচাইস-এর রিপোর্টটি ডাহা মিথ্যে কারণ আবার্ত নামে কোনো স্ত্রীলোকের অস্তিত্বই নেই। হিসেবে সংবাদদাতা মিথ্যে রিপোর্ট দিয়েছে এবং বিভাগীয় সম্পাদক সেই মিথ্যা রিপোর্ট ছেপেছে। রিপোর্টটা যে ডাহা মিথ্যে তা বিভাগীয় সম্পাদক ঘটনাস্থলে নিজে গিয়ে খবরাখবর নিলেই জানতে পারবেন। তবে তিনি যে এটা

করবেন না তাতে কোনোই ভুল নেই, কারণ ক্রানচাইস-এ এই ধরণের মিথ্যে খবর হামেশাই বের হয়। পত্রিকার সারকুলেশন বাড়াবার জন্তেই এসব করা হয়। ক্রানচাইস-এর পৃষ্ঠায় এমন সব খবরও বের হয় যার কোনো ভিত্তিই নেই। যে ব্যক্তি বহাল তবিয়তে জীবিত আছে, ক্রানচাইস তার মৃত্যু সংবাদ ছেপে দেয়, অথবা যে যুদ্ধ কোনোদিন হয়নি অথবা যে কথা কোনো রাজা বা মন্ত্রী কোনো দিন বলেন নি, সেই কল্পিত যুদ্ধের গালগল্প এবং রাজা অথবা মন্ত্রীদের বক্তব্য মিথ্যে কথা প্রকাশ করা হয়।

লা প্লুমের প্রবন্ধটা পড়ে ডুরয় একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সে ডেকে পাঠালো সেণ্ট পোতিনকে। সেণ্ট পোতিনই ওই খবর এনে দিয়েছিল।

সে আসতেই ডুরয় বললে—আজকের লা প্লুম দেখেছেন?

—দেখেছি বৈকি। আমি এখন সেই আবার্ত-এর বাড়ি থেকেই আসছি।

—প্রবন্ধকার যে লিখেছে আবার্ত নামে কোনো স্ত্রীলোকই নেই, এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি?

—ও ডাহা মিথ্যে কথা লিখেছে। ওই ঠিকানায় আবার্ত নামে একজন স্ত্রীলোক অবশ্যই আছে, এবং আমি যা লিখেছি, অর্থাৎ পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেনি, তাই হলো সত্যি খবর।

—ঠিক তো?

—নিশ্চয়ই। আপনার যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে নিজে গিয়ে খবরাখবর নিয়ে আসুন।

—ঠিক আছে। আপনি এবারে নিজের কাজে যান। আমি দেখছি, এ ব্যাপারে কি করা যায়।

সেণ্ট পোতিন চলে যাবার পর ডুরয় ওয়াল্টারের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলো। ডুরয়ের কাছ থেকে সব কথা শুনে ওয়াল্টার বললে—ঠিক আছে। আপনি একবার নিজে গিয়ে ঘটনার সত্যাসত্য জেনে আসুন। সেণ্ট পোতিনের রিপোর্ট যদি সত্যি হয় তাহলে পত্রিকা মারফৎ লা প্লুমকে হুঁশিয়ার করে দিন যাতে এ রকম কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধ তারা আর না ছাপে। তাছাড়া লেখকের নামটাও প্রকাশ করতে বলবেন লা-প্লুমকে।

ডুরয় তখন সেণ্ট পোতিনকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলো নির্দিষ্ট ঠিকানায়। সেখানে গিয়ে আবার্ত নামে একটি বৃদ্ধার দেখাও সে পেলো। বৃদ্ধার কাছে আসল ব্যাপারটা জানতে চাইলো ডুরয়। বৃদ্ধা তখন ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ জানিয়ে দিল ডুরয়কে। সে যা বললে তার মর্মকথা হলো,

সে এক কসাইয়ের দোকানে মাংস কিনতে গেলে কসাই তাকে মাংসের সঙ্গে অনেকগুলো হাড় দেয়। এর ফলে কসাইয়ের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি শুরু হয় এবং শেষটায় উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়। ব্যাপার দেখে বহু লোক জমে যায় সেখানে। এরপর পুলিশের একজন সার্জেন্ট এসে দুজনকেই থানায় নিয়ে যায়। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার উভয়ের বক্তব্য শুনে দুজনকেই কিছু ধমক ধামক দিয়ে ছেড়ে দেয়।

বৃদ্ধার কাছ থেকে এই বিবরণ জেনে এসে দুরয় নিজের নামে একটা প্রবন্ধ লিখে লা প্লুম পত্রিকাকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করলো। সে লিখলো, পুলিশ আবার্ত নামক স্ত্রীলোকটিকে গ্রেপ্তার করেনি বলে আমি যে সংবাদ প্রকাশ করেছি তাতে কোনোই ভুল নেই। আমি সেই মহিলার সঙ্গে নিজে দেখা করে ঘটনার বিবরণ জেনে এসেছি। সুতরাং লা প্লুমের সাংবাদিক বেনামে যে সব কথা লিখেছেন তার মূলে কোনো ভিত্তি নেই। ভদ্রলোক ইতরের মতো যে সব কথা লিখেছেন, আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করি। তাছাড়া প্রবন্ধকারের যদি সৎসাহস থাকে তাহলে তার নিজের নামটা প্রকাশ করতেও আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

দুরয়ের প্রবন্ধটা বের হবার পরদিনই লা প্লুমে তার উত্তর বের হলো। এবার আর বেনামে নয়। স্বনামেই আত্মপ্রকাশ করলো লেখক। সে লিখলো ফ্রানচাইস পত্রিকার সাংবাদিক মশিয়ে দুরয় অর্ধসত্য প্রচার করে নিজেদের পত্রিকার মিথ্যা সংবাদকে ক্যামোফ্লেজ করতে চেয়েছেন।

ফ্রানচাইসের সাংবাদিক মশাই আমাকে নাম প্রকাশ করতে বলেছেন। তাঁর কথামতো এই প্রবন্ধের নিচে আমার নামটা সই করছি।

সইটা দেখলেই তিনি জানতে পারবেন যে, আমার নাম লুই ল্যাংপ্রেমণ্ট।

লা প্লুমে এই লেখাটা পড়ে রাগে, ক্ষোভে আর অপমানে দুরয়ের সারা দেহ কাঁপতে লাগলো। পত্রিকাখানা হাতে নিয়ে সে ছুটলো ওয়াল্টারের কাছে। ওয়াল্টার আগেই লেখাটা পড়েছে। তাই দুরয়কে দেখে সে বললে—এর একটা বিহিত না করলে চলছে না। আপনি এখুনি একবার মশিয়ে রিভ্যালের সঙ্গে দেখা করুন। তিনি কি বলতে চান শুনে নিন।

দুরয় তখুনি গেল রিভ্যালের কাছে। রিভ্যাল বললে—শয়তানটাকে ডুয়েলে আহ্বান করুন।

—তাতো করবো। কিন্তু সেকেণ্ড হবে কে?

—সে জন্যে ভাবতে হবে না। আমার মনে হয় মশিয়ে বোইজ রেনার্ড

রাজী হবেন সেকেণ্ড হতে। যাই হোক, এবার বলুন, কি অস্ত্র আপনি চান? তরোয়াল, না পিস্তল?

—পিস্তলই আমার পছন্দ।

—বেশ, তাহলে তাই হবে। আপনি বরং আজকের দিনটা একটু প্র্যাকটিস করে নিন। বারোটা অবধি প্র্যাকটিস করুন। তারপর আমি এসে আপনাকে লাঞ্চে নিয়ে যাবো। আমি ইতিমধ্যে বোইসনেয়ার্দ-এর সংগে দেখা করে আসছি।

এই বলে সে একটা পিস্তল আর কতকগুলো গুলি দুরয়ের হাতে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় সে আরও বলে গেল যে, ল্যাংগ্রেমণ্ট-কে সে জানিয়ে দেবে কথাটা এবং তার সম্মতি পেলে ডুয়েলের স্থান এবং সময় স্থির করে আসবে।

রিভ্যাল চলে গেলে দুরয় বাড়ির সামনের লনে গিয়ে স্যুটিং প্রাকটিস করতে লাগলো। কিন্তু কয়েকবার গুলি চালাবার পরেই তার মেজাজ বিগড়ে গেল। এ কি ঝামেলায় পড়া গেল! কোথাকার কে এক বুড়ির জন্যে তাকে ডুয়েল লড়তে হচ্ছে! মশিয়ে নবার্ত সেদিন ঠিকই বলেছিলেন, দুনিয়ায় দেখছি মৃত্যুটাই একমাত্র সত্য।

প্রায় বারোটার সময় রিভ্যাল ফিরে এলো। মশিয়ে বোইসনেয়ার্দও সঙ্গে এসেছে তার। রিভ্যাল এসেই বললে—সব ঠিক করে এলাম।

দুরয় ভাবলো যে, প্রতিপক্ষ বোধ হয় ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। সে তাই রিভ্যালের দিকে তাকিয়ে বললে—শেষ পর্যন্ত ও তাহলে ক্ষমা চাইলো।

—না, ক্ষমা সে চায়নি। সে আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। আগামী কাল শহরের উপকণ্ঠের বনের ধারে ডুয়েল হবে।

কথাটা শুনে দুরয় একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। তার মুখ থেকে আর কোনো কথাই বের হলো না।

মশিয়ে রিভ্যাল বললে—চলুন, এবার লাঞ্চ খেয়ে আসা যাক।

কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেতে বসলো তিনজন। দুরয় কিন্তু মোটেই খেতে পারলো না। তার কেবলই মনে হতে লাগলো আগামী কাল সকালের কথাটা।

লাঞ্চ সেরে ওরা তিনজনেই অফিসে গেল। তুরয় তার মনের ভাব গোপন করে যথারীতি তার কাজকর্ম করে যেতে লাগলো।

সন্ধ্যার কিছু আগে মশিয়েঁ রিভ্যাল তুরয়ের সঙ্গে দেখা করে বললে—আমি এবার কাজে বের হচ্ছি মশিয়েঁ। আগামী কাল ভোর সাতটায় আপনার বাড়িতে আসছি। মশিয়েঁ বোইসনেয়ার্দকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো। আপনি তৈরী থাকবেন।

রিভ্যাল চলে যাবার পর বোইসনেয়ার্দ এসে তুরয়ের সঙ্গে দেখা করলো। সে বললে—আপনার এই সৎ সাহস অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। আমি তো ভাবতেও পারিনি যে, ল্যাংগ্রেমণ্টকে আপনি ডুয়েলে আহ্বান করবেন।

এর উত্তরে তুরয় নিস্পৃহ কণ্ঠে বললে—পত্রিকার সম্মান এবং নিজের সম্মান বজায় রাখবার জন্য এছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো পথ আমি দেখতে পেলাম না। হয়তো এ ডুয়েলে আমার মৃত্যু হবে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? সবাই জানবে তুরয় তার সম্মান বজায় রেখেই মারা গেছে।

—মারা যাবেন কেন, মশিয়েঁ? এমনও তো হতে পারে, যে, আপনার গুলিতে প্রতিপক্ষই ঘায়েল হবে।

তুরয় আর কোনো কথা বললে না। বোইসনেয়ার্দ তুরয়কে সঙ্গে করে রেস্তোরায় গিয়ে ডিনা'র খাইয়ে আনলো। তারপর তাকে সঙ্গে করে বাড়িতে পৌঁছে দিল।

রাত তখন ন'টা।

ঘরে এসে তুরয় তার বাবাকে চিঠি লিখতে বসলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিঠি লেখা আর হলো না। দোয়াত কলম সরিয়ে রেখে সে উঠে গিয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে নিল। তারপর কি মনে করে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আঁতকে উঠলো সে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। হঠাৎ তার মনে পড়লো রানী আঁতোয়ানেত্-এর কথা। রানীর অঙ্গুলিহেলনে ফরাসী সাম্রাজ্য পরিচালিত হতো; রাজা চতুর্দশ লুই তাঁর কথায় উঠতেন-বসতেন, কিন্তু ফ্রান্স রিভল্যুশনের পর গণ-আদালত যখন তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়, তখন এক রাত্রির মধ্যেই তাঁর মাথার সবগুলো চুল একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিল।

নিজের মানসিক অবস্থাকে স্থিতাবস্থায় ফিরিয়ে আনবার জন্তে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি পান করলো সে। বোতলে তখন আরও অনেকটা ব্র্যাণ্ডি ছিল।

ডুরয় মনে মনে স্থির করলো যে, বাকি ব্র্যাণ্ডিটা সে আগামী কাল সকালে পান করবে।

ঘুম কিছুতেই হলো না। বিছানায় শুয়ে কেবলই এপাশ ওপাশ করতে লাগলো সে অবশেষে ভোরের আলো দেখা দিলে। সে বিছানা ছেড়ে উঠে দাড়ি কামাতে বসলো। কিন্তু কামাতে গিয়ে তার হাতটা এমন ভাবে কাঁপতে লাগলো যে, ক্ষুর চালানো সম্ভব হলো না। সে তখন ব্র্যাণ্ডির বোতলটা বের করে বাকি ব্র্যাণ্ডিটুকু টেনে নিল। এতে তার কাঁপুনি বন্ধ হলো। সে তখন তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে নিয়ে পোশাক বদলে ফেললো। পোশাক পরা হয়ে গেলে ঘরের ভেতরে পায়চারি করতে শুরু করলো সে।

একটু পরেই কলিং বেল বেজে উঠলো। ডুরয়ের বুকটা কেঁপে উঠলো হঠাৎ। তার মনে হলো, এটা যেন মৃত্যুর ঘণ্টা। দরজা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকলো রিভ্যাল, বোইসনেয়ার্দ এবং একজন ডাক্তার।

বোইসনেয়ার্দই প্রথমে কথা বললে। ডুরয়ের দিকে তাকিয়ে সে বললে—আর দেরি করা চলে না। এবার চলুন।

তার কথা শুনে ডুরয় যন্ত্র চালিতের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে নিচে নেমে গিয়ে একখানা গাড়িতে উঠে বসলো।

গাড়িতে উঠে ডুরয় বসলো ডাক্তারের পাশে। তার মুখে কোনো কথাই নেই। হঠাৎ রিভ্যাল তাকে তালিম দিতে শুরু করলো। সে বললে—শুনুন মশিয়েঁ! যখন জিজ্ঞেস করা হবে, আপনি প্রস্তুত কিনা, তখন জোর গলায় উত্তর দেবেন—'হ্যাঁ'। এরপর ওয়ান, টু, থ্রি বলে 'ফায়ার' বলবার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করবেন। মনে থাকবে তো?

ডুরয় বললে—নিশ্চয়ই থাকবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটা নির্দিষ্ট স্থানে এসে হাজির হলো। সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লো সবাই। ডুরয় দেখতে পেলো যে, ইতিমধ্যেই ওখানে অনেক লোক জমা হয়েছে। সে অনাসক্ত দৃষ্টিতে একবার তাদের দিকে, একবার গাছপালার দিকে এবং একবার খোলা জায়গাটার দিকে তাকালো।

একটু পরেই ফাঁকা জায়গাটায় দুটো লাঠি পোঁতা হলো। একটা লাঠি থেকে অপর লাঠির দূরত্ব বেশ কয়েক গজ দূরে।

মশিয়েঁ রিভ্যাল ডুরয়কে নিয়ে গিয়ে তার জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে তার হাতে একটা গুলিভরা পিস্তল তুলে দিল। এই সময় ডাক্তার তার কাছে এগিয়ে এসে বললে—ঠিক আছেন তো?

—হ্যাঁ, আমি ঠিকই আছি।

দুরয় তখন রিভ্যালের শেখানো কথাগুলো মনে মনে আউড়ে চলেছে। কোনো দিকে তার দৃষ্টি নেই।

হঠাৎ কে যেন বলে উঠলো—আপনি তৈরী তো?

দুরয় বললে—হ্যাঁ।

আবার সেই লোকটিই বলে উঠলো—ওয়ান, টু, থ্রী—ফায়ার।

সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার করলো দুরয়। তার প্রতিদ্বন্দ্বীও ফায়ার করলো। দুরয়ের পিস্তলের নলের মুখে একটুখানি ধোঁয়া দেখা গেল।

ডুয়েল শেষ হয়ে গেল। দুরয়ের সঙ্গীরা এগিয়ে এসে তার জামার বোতাম খুলে দিতে দিতে বললে—গুলি লেগেছে কি?

দুরয়ের মুখ দিয়ে কোনো কথাই বের হলো না। নড়তেও পারছে না সে। হঠাৎ যেন পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে।

বোইসনেয়ার্দ এগিয়ে এসে তার হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে নিল। এতক্ষণে দুরয় বুঝতে পারলো যে, ডুয়েল শেষ হয়ে গেছে এবং সে আহত হয়নি। এই কথা মনে হতেই সে যেন লুপ্ত শক্তি ফিরে পেলো। তার তখন মনে হতে লাগলো যে, সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে সে একাই লড়তে পারে।

দুরয়ের সঙ্গীরা তখন তাকে নিয়ে আবার গাড়িতে উঠলো। গাড়িটা কাছেই অপেক্ষা করছিলো। ওরা উঠতেই চলতে শুরু করলো।

বড় রাস্তায় এসে একটা রেস্তোরার সামনে গাড়ি থামাতে বললে রিভ্যাল। গাড়ি থামলে সবাই নেমে ঢুকে পড়লো রেস্তোরার ভেতরে। সেখানে বসে খানা খেয়ে নিল সবাই। খেতে খেতে দুরয় বললে—আমি কিন্তু একটুও ভয় পাই নি।

মশিয়ে বোইসনেয়ার্দ বললে—হ্যাঁ এ ব্যাপারে আপনাকে তারিফ করা চলে।

লাঞ্চ খেয়ে ওরা আবার গাড়িতে চেপে সোজা চলে গেল ফ্রানচাইস কার্যালয়ে। সেখানে মশিয়ে ওয়াল্টার উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিল ডুয়েলের সংবাদের জন্যে। দুরয় তার সামনে হাজির হতেই সে দাঁড়িয়ে উঠে দুরয়কে বুকে জড়িয়ে ধরে বললে—সাবাস বন্ধু। আপনি আমার কাগজের মুখ রক্ষা করেছেন।

মালিকের কাছ থেকে খাতির পাবার পর দুরয় বেরিয়ে পড়লো অন্যান্য পত্রিকা অফিসে যাবার জন্যে। সব কটি নামকরা পত্রিকার অফিসে ঢু মেরে এলো সে। এক জায়গায় তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। কিন্তু কেউ কাউকে নমস্কার করলো না।

বেলা প্রায় এগারোটার সময় হৃরয় একখানা টেলিগ্রাম পেলো। টেলিগ্রাম করেছে ক্লতিলদে। সে লিখেছে—

"ভয়ে মরে যাচ্ছি। আজ একবার রুয়ে দে কনস্টান্টিনোপলে এসো। তোমাকে না দেখে থাকতে পারছি নে। গভীর ভালবাসা জানাচ্ছি। —ক্লো"

সন্ধ্যার পরেই হৃরয় তার মিলন মন্দিরে এসে হাজির হলো। ক্লতিলদে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল হৃরয়ের জন্যে। সে আসতেই ক্লতিলদে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো তাকে। তারপর তার মুখে, গালে, কপালে চুমো দিতে দিতে বললে—আজ সকালে ডুয়েলের খবরটা কাগজে পড়বার পর আমার যে কি অবস্থা হয়েছিল তা আর কি বলবো! এবার খুলে বলো তো ব্যাপারটা।

হৃরয় তখন আসল ঘটনাটার সঙ্গে আরও অনেক কিছু যোগ করে ঘটনাটা বিবৃত করলো প্রণয়িনীর কাছে। তারপর নিজের বীরত্ব বুঝাবার জন্যে বললে—আমার অভ্যাস হালকা পিস্তল চালানো, কিন্তু ডুয়েলের সময় ওরা আমাকে দিলো একটা ভারী পিস্তল। এজন্যই বেঁচে গেল লোকটা।

ক্লতিলদে বললে—তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর গুলিটাও তো মিস করেছে।

—তা করেছে, তবে আমারটা একেবারে ওর কান ঘেঁষে গেছে, কিন্তু ওরটা গেছে আমার মাথার ওপর দিয়ে।

এরপরেই শুরু হলো প্রেমের অভিব্যক্তি। ক্লতিলদে বললে—স্বামীটা যে কবে যাবে তাই ভাবছি। ও বাড়ি থেকে বিদেয় না হওয়া অবধি প্রাণ খুলে যোগাযোগ করতে পারছিনে তোমার সঙ্গে।

—কেন এখানে তো কোনো বাধা নেই।

তা নেই বটে, কিন্তু এখানে তো তুমি থাকো না। তুমি এখনও সেই কার্ল বাড়িটাতেই বাস করছো। সকালে যে একবার তোমার সঙ্গে দেখা করবো তারও উপায় নেই।

—আমিও ও বাড়িটা ছেড়ে দেবার চেষ্টায় আছি। কিন্তু তেমন সুবিধে মতো বাড়ি পাচ্ছি না। আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না।

—কি কাজ?

—আমি বরং এখানেই উঠে আসি। এ ফ্লাট টা তো আমার নামেই নেওয়া হয়েছে।

—তা হয়েছে, কিন্তু এখানে তোমার না থাকাই ভাল।

—কেন বলো তো?

—এখানে অন্য কোনো মেয়ে আসবে তা আমি সহ্য করতে পারবো না। এখানে আসবো শুধু আমি আর তুমি।

—অন্য মেয়ে আসবে কেন?

—কেন আসবে তা তুমিই জানো। তবে এখানে যে তুমি অন্য মেয়ে আনবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

—আমাকে তুমি এতটা অবিশ্বাস করো?

—তা একটু করি বৈকি।

—না ডার্লিং, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি। এখানে তুমি ছাড়া কোন দ্বিতীয় নারী আসবে না।

—বেশ, তাহলে এখানেই তুমি উঠে এসো। তবে মনে থাকে তো, এখানে যদি অন্য কোন মেয়েকে কোনোদিন আনো তাহলে আমার সঙ্গে আর তোমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

—না গো না। এখানে আর কেউ আসবে না।

এরপর যা হলো সে কথা না লিখলেও বুঝে নিতে অসুবিধে হবে না কারো।

বিদায় নেবার সময় হলে কুন্তিলদে বললে—আগামী রবিবার আমাদের বাড়িতে ডিনার খাবে তুমি।

—তোমার স্বামীর মত নিয়ে বলছো তো?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। সে-ই তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে বলেছে। এক দিনের আলাপেই সে তোমার ভক্ত হয়ে পড়েছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, তাই। এবার তুমি ওর সঙ্গে চাষ-আবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করো। পারবে তো?

—নিশ্চয়ই পারবো।

—আচ্ছা এখন এই পর্যন্তই রইলো। এবার তাহলে আসি।

তুরয় তখন কুন্তিলদেকে আর একবার গভীরভাবে চুমো দিয়ে বললে—ধরে রাখবার যখন উপায় নেই, তখন ছেড়ে দিতেই হবে তোমাকে।

তুরয়কে ছেড়ে যেতে কুন্তিলদেরও ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু স্বামী বাড়িতে আছে বলে বাধ্য হয়েই সে বিদায় নিল।

॥ আট ॥

ডুয়েলের পর থেকেই ক্লানচাইন্দ পত্রিকার অফিসে দুরয়ের সম্মান এবং প্রতিপত্তি বেড়ে গেছে। সে এখন রুয়ে দে কনস্তানন্টিনোপল এর ফ্লাটে উঠে এসেছে। ক্লতিলদে ওখানে প্রায়ই আসে। শুধু তাই নয়। প্রতি বৃহস্পতিবারে মশিয়েঁ মোরেলের বাড়িতে ডিনার খেতে যায় এবং ডিনারের শেষে মশিয়েঁ মোরেলের সঙ্গে কৃষি আর উদ্যান নিয়ে আলোচনা করে।

ফেব্রুয়ারীর শেষ দিন হঠাৎ সে মাদাম ফরেস্তিয়েরের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলো। মাদাম লিখেছে:

প্রিয় মশিয়েঁ দুরয়, জয়নি ভিলা, ক্যান্নেস।

একদিন আপনি আমাকে বলেছিলেন, যে কোনো প্রয়োজনে আপনি আমাকে সাহায্য করতে রাজী আছেন। আজ বড় বিপদে পড়ে আপনাকে ডাকছি। চার্লসের শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর বোধহয় এক সপ্তাহও টিকবে না। প্রতি মুহূর্তে তার যন্ত্রণা দেখবার মতো মানসিক শক্তি আমার নেই। তাছাড়া ওর শেষ মুহূর্তের কথা ভেবে ভীষণ ভয় হচ্ছে আমার। ওর কোনো আপন জনের নাম বা ঠিকানা আমার জানা নেই। আপনি ওর বন্ধু এবং ও-ই আপনাকে পত্রিকা অফিসে ঢুকিয়েছে। আমি তাই, ওর এই শেষ সময়ে আপনাকেই আহ্বান জানাচ্ছি। আশা করি আমাদের এই দুঃসময়ে আপনি আমার পাশে এসে দাঁড়াবেন। ইতি।

আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু
ম্যাডালিন ফরেস্তিয়ের।

চিঠিখানা পড়েই দুরয় ক্যান্নেসে যাবে বলে স্থির করলো। মশিয়েঁ ওয়াল্টারের কাছে কয়েক দিনের ছুটি চাইতে গেলে সে প্রথমে রাজী হচ্ছিল না ছুটি দিতে। কিন্তু মাদাম ফরেস্তিয়েরের চিঠিখানা তাকে দেখানো হলে অবশেষে সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হয়ে বললে—একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে চেষ্টা করবেন। আপনি না থাকলে এদিকে ভীষণ অসুবিধে হবে।

অফিস থেকে ছুটি নেবার পর দুরয় একখানা টেলিগ্রাম করলো মাদাম ফরেস্তিয়েরকে। তাতে সে জানিয়ে দিল যে, পরদিন সকাল সাতটার ট্রেনে সে রওনা হচ্ছে।

পরদিন বিকেল চারটের সময় জয়নি ভিলায় হাজির হলো দুরয়। সদর

দরজার কলিং বেল টিপতেই একটি চাকর এসে দরজা খুলে দিল। তুরয়কে দেখেই সে বলে উঠলো—আপনিই কি মশিয়েঁ তুরয়?

—হ্যাঁ।

—দয়া করে ভেতরে আসুন। মাদাম আপনাকে দেখলে খুবই খুশি হবেন।

—তোমার মনিব কেমন আছেন?

—ভাল না। তিনি যে কোনো মুহূর্তে আমাদের ছেড়ে যেতে পারেন।

ভেতরে ঢুকতেই মাদাম ফরেস্তিয়েরের সঙ্গে দেখা হলো তুরয়ের। মাদাম তাকে দেখে খুশি হয়ে বললে—এসেছেন! আপনার কথাই ভাবছিলাম এতক্ষণ চার্লসের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। ও বুঝতে পেরেছে যে আর বেশিদিন ও বাঁচবে না। আপনার আসার কথা বলেছি ওকে। কিন্তু আপনার জিনিষপত্র কই?

—সেগুলো স্টেশনে রেখে এসেছি। কাছাকাছি কোনো হোটেল ঠিক করে নিয়ে সেখানে উঠবো।

—হোটেলে থাকবেন কেন? না, না, তা হবে না। আপনাকে এখানেই থাকতে হবে। আপনার মালপত্র আনতে এখুনি লোক পাঠাচ্ছি আমি।

—আমি এখানে থাকলে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না তো?

—আপনি না থাকলেই বরং অসুবিধে হবে।

এরপর আর আপত্তি করলো না তুরয়। বললে—চলুন, এবার চার্লসের কাছে যাওয়া যাক।

মাদাম ফরেস্তিয়ের তুরয়কে তার স্বামীর কাছে নিয়ে গেল। ফরেস্তিয়েরকে দেখে চমকে উঠলো তুরয়। বললে—একি চেহারা হয়ে গেছে তোমার?

ফরেস্তিয়ের শুয়ে শুয়েই তার কঙ্কাল সার হাত তুরয়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল—কেমন আছো বন্ধু? আমার মৃত্যু দেখতে এলে?

—একি বলছো! তুমি শীগ্‌গিরই ভাল হয়ে উঠবে।

—ভাল আর হয়েছি! যাই হোক, এসেছো যখন, আমার শেষ দিন অবধি থেকে যাও।

এই কটি কথা বলতেই হাঁপিয়ে উঠলো ফরেস্তিয়ের। সে তখন মাদামের দিকে তাকিয়ে বললে—জানালাটা খুলে দাও। একটু বাতাস আসুক।

সে কি! ঠাণ্ডা—লাগবে যে।

মাদামের কথা শুনে খেঁকিয়ে উঠলো ফরেস্তিয়ের—ঠাণ্ডা লাগবে। ঠাণ্ডা লাগলে হবে-টা কি আমার। দুদিন পরে না মরে দুদিন আগেই মরি তাহলে তোমার কি কোনো ক্ষতি হবে?

মাদাম তখন আর কোনো কথা না বলে জানালাটা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের হাওয়া ঘরে ঢুকলো। ফরেস্তিয়ের বললে—আঃ! কী ভালই যে লাগছে হাওয়াটা। এই পর্যন্ত বলেই কাশতে শুরু করলো। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হবার উপক্রম। সে তখন হাতের ইসারায় জানালাটা বন্ধ করতে বললে মাদামকে।

মাদাম জানালা বন্ধ করে কাচের সার্সিতে কপাল ঠেকিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

এই সময় দুরয় কিছু সান্ত্বনার কথা বলতে চাইলো বন্ধুকে। কিন্তু বলবার মতো কিছু না পেয়ে অবশেষে বলল—এখানে এসে তোমার কিছুই উন্নতি হয়নি দেখছি।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছো। যাইহোক, এবার কাগজের খবর বলো। আমার জায়গায় এখন কে কাজ করছে?

তুমি চলে আসার পর আমিই কয়েকদিন করেছিলাম। এখন ভলতেয়ার থেকে এক ছোকরা এসে তোমার জায়গায় কাজ করছে। কিন্তু পেরে উঠছে না কিছুই, একেবারে কাঁচা হাত। তুমি ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আর কোনো ভাল লেখা বেরুবে না।

—আমি আর লিখেছি। এবার লিখবো কবরে গিয়ে।

কথাটা শুনে চুপ করে গেল দুরয়। মনে মনে বুঝলো—কথাটা মিথ্যে নয়।

একটু পরে আবার ফরেস্তিয়ের কথা বললো। দুরয়ের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে সে বললে—সূর্য অস্ত যাচ্ছে, তাই না?

—হ্যাঁ।

—আমি আর ক'টা সূর্যাস্ত দেখবো তাই ভাবছি। হয়তো আটটা, কিংবা দশটা, না হয় পনেরো, বিশ অথবা বড় জোর ত্রিশটা। তারপর সব শেষ।

ফরেস্তিয়েরের কথা শুনে কবি নবার্ত-এর কথাটা মনে পড়ে গেল দুরয়ের সে বলেছিল যে, মৃত্যুকে সে নাকি সব সময় তার আশে পাশে দেখতে পাচ্ছে। সেদিন তার কথার মর্ম সে বুঝতে পারেনি। আজ ফরেস্তিয়েরের অবস্থা দেখে এবং বিশেষ করে সূর্যাস্ত দেখা সম্বন্ধে তার কথা শুনে কবির কথাটির মর্ম সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলো দুরয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। ঘরে এখনো আলো জেলে দেওয়া হয়নি। মাদাম তখনও জানালার কাছে কপাল ঠেকিয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ ফরেস্তিয়ের খেঁকিয়ে উঠলো—ঘরে আলো নেই কেন?

তার কথা শুনে সম্বিত ফিরে এলো মাদামের। সে তখন ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরকে ডাকলো। চাকর এসে ঘরে আলো জেলে দিল।

আলো জ্বালা হয়ে গেলে মাদাম বললে—তুমি কি এখানেই খাবে, না নিচে গিয়ে খাবে?

—নিচেই যাবো।

চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে নিচে নামলো ফরেস্তিয়ের। ড্রয়িং রুমে নিয়ে গিয়ে বসানো হলো তাকে। মাদাম এবং ডুরয়ও বসলো।

ডিনার এলো ঘণ্টাখানেক পরে।

ভোজন পর্ব শেষ হলো এক অস্বস্তিকর আবহাওয়ার মধ্যে। কথাবার্তা বা গল্পগুজব কিছুই বিশেষ হলো না ভোক্তাদের মধ্যে।

খাওয়া শেষ হলে ডুরয় ক্লান্তির অজুহাতে তার জন্যে নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। সে মনে মনে ওখান থেকে পালাবার পন্থা খুঁজতে লাগলো। একবার তার মনে হলো, কাউকে দিয়ে এই ঠিকানায় তার নামে একটি টেলিগ্রাম করাতে পারলে হয়। অনেক ভেবে-চিন্তে অবশেষে ঠিক করলো যে, সকালে সে ওয়াল্টারকে লিখবে তাকে অবিলম্বে অফিসে যাবার জন্যে একটি টেলিগ্রাম করতে।

কিন্তু ভোরে উঠতে তার মনে হলো যে, পালানো ব্যাপারটা যত সহজ মনে হয়েছিল তত সহজ মোটেই নয়। মাদাম ফরেস্তিয়ের যে রকম চালাক মেয়ে তাতে সে ওটা বুঝে ফেলবে। তাছাড়া মাদামকে সে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে প্রতিশ্রুতিও ভঙ্গ করা হবে। এই সব কথা মনে হওয়ায় পালাবার মতলবটি সে পরিত্যাগ করলো। কিন্তু কিছু একটা করতে হবে তো! চুপ চাপ ঘরে বসে থাকা তো সম্ভব নয়। সে তাই বেরিয়ে পড়লো সমুদ্রের দিকে।

ফ্রান্সের এই অঞ্চলে এসময়টা বেশ আনন্দদায়ক। বসন্তের হাওয়া বইতে থাকে ফুর ফুর করে। সমুদ্রের ধারটা তো আরও চমৎকার। সে তাই মনের আনন্দে বেড়াতে লাগলো সমুদ্রের ধারে।

অনেকক্ষণ বেড়িয়ে সে যখন ভিলায় ফিরে এলো, তখন ব্রেকফাস্টের

সময় পার হয়ে লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। তাকে দেখে চাকরটা বললে—মশিয়ে ফরেস্তিয়ের দুই তিনবার আপনার খোঁজ করেছেন।

কথাটা শুনে তখনই সে ওপরে উঠে ফরেস্তিয়েরের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলো। ফরেস্তিয়ের একখানা আরাম চেয়ারে চোখ বুজে বসে ছিল। দুরয়ের মনে হলো সে এখন ঘুমুচ্ছে। একটু দূরে মাদাম ফরেস্তিয়ের একটা সোফার ওপর শুয়ে কি একখানা বই পড়ছে।

দুরয়ের পায়ের শব্দ শুনে চোখ খুললো ফরেস্তিয়ের। দুরয় জিজ্ঞেস করলে আজ একটু ভাল আছ মনে হচ্ছে কি?

ফরেস্তিয়ের বললে, হ্যাঁ, আমি আজ বেশ ভাল আছি। মনে হচ্ছে যেন অসুখটা প্রায় সেরেই গেছে। তুমি তাড়াতাড়ি লাঞ্চ খেয়ে নাও। তারপর আমরা গাড়ি করে একটু বেড়াতে বের হবো।

এরপর মাদামের দিকে তাকিয়ে বললে—তুমি আর দুরয় ডাইনিং রুমে গিয়ে খেয়ে নাও। আমার খাবারটা এখানেই পাঠিয়ে দাও।

খাবার টেবিলে বসে মাদাম বললে—আপনার বন্ধু ভাবছেন যে, উনি সেরে উঠেছেন। আজ সকাল থেকেই নানা রকম পরিকল্পনা চলছে। লাঞ্চের পরে প্যারীর ফ্লাটের জন্যে কিছু জিনিসপত্র কিনতে গলফ্ জুয়ান যাচ্ছি। কিন্তু আমি ভাবছি, গাড়ির ঝাঁকুনি হয়তো ও সহ্য করতে পারবে না।

দুরয় বললে—আমারও তাই মনে হচ্ছে। ওকে বাইরে যাওয়া থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারবেন না!

—না, তাতে হিতে বিপরীত হয়। ওর মেজাজ এখন যেমন খিটখিটে হয়ে পড়েছে তাতে হয়তো আমার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দেবে।

—তাহলে তো দেখছি কিছুই করা যাবে না, এ ব্যাপারে।

—হ্যাঁ, আমার পক্ষে এখন ওর কথামতো চলা ছাড়া আর কিছু করণীয় নেই। তবে ও যা ভাবছে আসলে তা নয়। ওর দিন ফুরিয়ে এসেছে। আজ যে একটু ভাল মনে হচ্ছে তা হলো নিভে যাবার আগে প্রদীপের উজ্জ্বলতা।

মাদামের কথা শুনে দুরয়ের মনে হলো যে, তার আর্জিটা এই সময় পেশ করলে মন্দ হয় না, লাঞ্চ খেয়ে ওপরে যেতেই ফরেস্তিয়ের বললে—আর দেরি করে দরকার নেই। তোমরা তৈরী হয়ে নাও। আর চাকরটাকে গাড়ি আনতে পাঠাও।

গাড়িতে বসে ফরেস্তিয়ের তুরয়কে বললে—হুড্‌টা খুলে দাও না। একটু বাতাস আসুক।

তার কথা শুনে মাদাম বললে—সে কি! হুড্‌ খুলে দিলে তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে!

—না, ঠাণ্ডা লাগবে না। আজ আমি বেশ ভাল আছি।

রাস্তার দু'ধারের নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছে ওরা। হুড্‌ খোলা থাকায় হু হু করে বাতাস আসছে। ফরেস্তিয়ের কিন্তু তা গ্রাহ্যই করছে না। সে খুশি মনে তার বিগত দিনের কথাগুলি বলে চলেছে তুরয়কে।

অবশেষে ওরা গলফ্‌ জুয়ানে এসে পৌঁছালো। সেখানে 'আর্ট দে চায়না' নামে একটা বিখ্যাত দোকান ছিল। ফরেস্তিয়েরের নির্দেশে সেই দোকানের সামনে গাড়িটা থামানো হলো।

গাড়িতেই জিনিস এনে দেখানো হতে লাগলো ফরেস্তিয়েরকে। অনেক দেখে শুনে দুটো ফুলদানি পছন্দ করলো সে। ফুলদানি দুটো কিনে নিয়ে ভিলা অভিমুখে ফিরে চললো ওরা। এবারে কিন্তু বাতাস সহ্য করতে পারলো না ফরেস্তিয়ের। সমুদ্রের ধার দিয়ে যাবার সময় ঠাণ্ডা লেগে কাশতে শুরু করলো সে। প্রথমে আস্তে আস্তে, শেষে শুরু হলো ভীষণ ভাবে কাশি। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, তখনই প্রাণ বেরিয়ে যাবার যোগাড়।

ব্যাপার দেখে তুরয় তাড়াতাড়ি হুড্‌টা টেনে দিলো। কিন্তু তা হলে কি হবে, ফরেস্তিয়েরের অবস্থা তখন রীতিমত কাহিল।

বাড়িতে এসে দু'খানা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লো ফরেস্তিয়ের। কিন্তু কাশি আর থামে না। অনবরত কাশতে লাগলো সে।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো। সন্ধ্যা উত্‌রে রাত হলো। ফরেস্তিয়ের তখনও কেশে চলেছে। সারাটা রাত ধরেই চললো কাশি। অবশেষে এক সময় ভোরের আলো দেখা দিল। ভোর হতেই ফরেস্তিয়ের বললে—একটা নাপিত ডাকো, দাড়ি কামাবো আমি। কথাটা মাদামকেই বললে সে।

নাপিত এসে দাড়ি কামিয়ে যাবার পর আবার শুরু হলো কাশি। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্টও শুরু হলো। মাদাম তখন ভয় পেয়ে তুরয়ের কাছে গিয়ে বললে—এক্ষুনি একবার ডাক্তার গ্যাভাস্তকে খবর দিন। ওর অবস্থা ভাল বলে মনে হচ্ছে না।

তুরয় তখনই গিয়ে ডাক্তার গ্যাভাস্তকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো।

ডাক্তার এসে রুগী দেখে প্রেস্‌ক্রিপশন লিখে দিলেন। কি পথ্য দেওয়া হবে সে কথাও বলে গেলেন। তুরয় তাঁকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। দরজার কাছে এসে সে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলো—কেমন দেখলেন?

ডাক্তার বললেন—ভাল না। আগামী কাল সকাল দশটার মধ্যেই হয়ে যাবে! আপনারা ধর্মযাজক ডাকতে পারেন।

ডাক্তারের বক্তব্যটা মাদাম ফরেস্তিয়েরকে জানিয়ে দিল তুরয়। কথাটা শুনে মাদাম কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললে—হ্যাঁ, ধর্মযাজক ডাকাই ভাল। আপনি অনুগ্রহ করে একজনকে ডেকে নিয়ে আসুন। তবে তাঁকে বলে দেবেন যে, তিনি যেন বেশি আড়ম্বর না করে শুধু কনফেশানটা নিয়েই রেহাই দেন।

তুরয় স্থানীয় চার্চে গিয়ে একজন প্রবীণ ধর্মযাজককে ডেকে নিয়ে এলো। তিনি ফরেস্তিয়েরের ঘরে ঢুকতেই মাদাম বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তুরয়ও বেরিয়ে গেল। ওরা পাশের ঘরে গিয়ে বসলো।

ধর্মযাজক একটু কালা। কানে কম শোনেন বলে নিজেও জোরে জোরে কথা বলেন। তবে ফরেস্তিয়ের যাতে তাঁর কথা শুনে ঘাবড়ে না যায় তার জন্যে সতর্ক হয়েই কথা বলছিলেন তিনি। পাশের ঘরে বসে মাদাম এবং তুরয় সব কথাই শুনতে পাচ্ছিলো। মাদাম তাই তুরয়ের দিকে তাকিয়ে বললে—চলুন, আমরা বাগানে গিয়ে বসি। কারো কনফেশান শোনা উচিত হবে না।

তুরয় বললে—তাই ভাল, চলুন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই কনফেশান নেওয়া শেষ হ'লো। ফরেস্তিয়ের তখন ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরটাকে ডাকলো। সে এলে তাকে বললে—যাও, মাদাম আর মশিয়েঁ তুরয়কে ডেকে নিয়ে এসো।

চাকর বাগানে গিয়ে খবরটা মাদামকে বলতেই সে আর তুরয় ফরেস্তিয়েরের ঘরে এলো। ধর্মযাজক তখন চলে যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন। ফরেস্তিয়েরের হাত ধরে তিনি বললেন—আমি এখন আসি বৎস! কাল সকালে আবার আসবো।

ধর্মযাজক চলে যেতেই ফরেস্তিয়ের তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেললো। তারপর কাঁদতে কাঁদতেই বললে—আমাকে বাঁচাও। আমি মরতে চাইনে। যেমন করে পারো আমাকে বাঁচাও। ডাক্তারকে বলো, যত ভাল আর যত দামী ওষুধ আছে এ রোগে তাই যেন আমাকে দেন।

কথা বলতে বলতে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়লো। ফরেস্তিয়েরের দুই গালের ওপর দিয়ে। তার কান্না দেখে মাদামও কেঁদে ফেললো। রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বললে—ভয় পাবার কিছু নেই। গতকাল বাইরে বেরিয়ে ঠাণ্ডা লাগায় কাশিটা বেড়েছে। দু'দিনেই ভাল হয়ে উঠবে তুমি।

মাদামের কথায় ফরেস্তিয়েরের যেন একটু বল পেলো। সে তখন আবার বললে—তোমার মনে হচ্ছে, আমি ভাল হবো ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, শীগ্‌গিরই তুমি ভাল হয়ে উঠবে।

দুরয় কিন্তু বুঝতে পারছে যে, ও আর ভাল হবে না। ডাক্তারের কথাটাই বার বার মনে হচ্ছে তখন।

এই সময় একজন নার্স এসে হাজির হলো সেখানে। সে বললে যে, তাকে নাকি ডাক্তার-গ্যাভান্ত পাঠিয়েছেন। নার্স আসায় মাদাম ফরেস্তিয়ের মনে মনে খুশি হলো। সে তখন নার্সকে ওখানে বসিয়ে বাইরে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—আপনি বসুন, আমি আপনার জন্যে কফি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রাতের আহার শেষ করে সবাই এসে রুগীর ঘরে বসলো। ফরেস্তিয়ের তখন কেশেই চলেছে। রাত দুটোর পর থেকেই আবার শুরু হলো শ্বাসকষ্ট। মাদাম এবং দুরয় উভয়েই তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। নার্স তাদের জাগিয়ে দিয়ে বললে—এখন আর ঘুমোবেন না।

শ্বাসকষ্ট বেড়েই চলেছে ফরেস্তিয়েরের। হঠাৎ দেখা গেল কাশির সঙ্গে মুখ দিয়ে রক্ত পড়লো খানিকটা। কি যেন বলতে চেষ্টা করলো সে। কিন্তু মুখ দিয়ে শুধু একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ ছাড়া আর কিছু বের হলো না। এর পরেই হঠাৎ তার মাথাটা কাত হয়ে পড়লো বালিশের ওপরে। চোখ দুটি স্থির হয়ে গেল। পূব দিকে তখন ভোরের আলো দেখা দিয়েছে।

নার্স বললে—হয়ে গেল!

তার কথা শুনে মাদাম আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো স্বামীর মৃত দেহের ওপর।

দুরয় বললে—যাক, খুব বেশি কষ্ট পায়নি।

শোকের প্রথম বেগটা কেটে গেলে মাদাম উঠে বসলো। তারপর দুরয়ের দিকে তাকিয়ে বললে—এবার বন্ধুর শেষ কৃত্যের ব্যবস্থা করুন।

দুরয় তখনই বেরিয়ে পড়লো সব ব্যবস্থা করতে। সন্ধ্যা অবধি ছুটাছুটি করে সব কাজ সেরে ফেললো সে। তারপর সে আর মাদাম কোনো রকমে একটু কিছু মুখে দিয়ে আবার এসে বসলো মৃতের ঘরে। টেবিলের ওপর দুটো মোমবাতি জেলে দিল মাদাম। তারপর দু'খানা চেয়ারে বসে মৃতদেহ আগলাতে লাগলো।

কারো মুখেই কোনো কথা নেই। দুজনেই তখন ভাবছে।

দুরয় ভাবছে—এই তো মানুষের জীবন! কালও যে ছিল, আজ আর সে নেই। কেউ থাকে না। থাকবে না। হঠাৎ নবার্তের কথাগুলো মনে পড়ে গেল তার। নবার্ত বলেছিল, "লক্ষ লক্ষ মানুষ দুনিয়ায় জন্মাবে। হাসবে, খেলবে, সুখ আর প্রেমের স্বপ্ন দেখবে, তারপর একদিন ঝরে পড়বে বাসি ফুলের মতো!"

এদিকে সদ্য বিধবা ম্যাডেলিন তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। তার সোনালী চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে দুই কাঁধের ওপর। সেই বিষাদক্লিষ্ট চেহারাটা খুব ভাল লাগলো দুরয়ের। কে যেন তার মনের ভেতরে বলে উঠলো—'এ নারী এখন তোমার।'

পরক্ষণেই তার মনে পড়লো বাজারের গুজবের কথা। কাউন্ট দে ভাত্রেক তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন ফরেস্তিয়েরের সঙ্গে। বিয়েতে অনেক টাকা যৌতুকও দিয়েছিলেন। লোকে বলাবলি করে, নিজের উপপত্নীকে ফরেস্তিয়েরের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে মিলনের পথটা পরিষ্কার করেছিলেন কাউন্ট। ম্যাডেলিনের পেটে কোনো সন্তান এলে আর কেউ বলতে পারবে না যে, সে জারজ সন্তান।

কিন্তু এখন এই নারীটি কি করবে? সে কি লারোচ ম্যাবুকে বিয়ে করবে! না, তা হতে পারে না। একে তার চাই-ই। যেমন করেই হোক, এই বিদুষী রূপবতী নারীকে স্ত্রী রূপে পেতেই হবে তাকে। কিন্তু কি করে বলা যায় সে কথা। এই অবস্থায় প্রেম নিবেদন করাটা কিংবা বিয়ের কথা বলাটা কিছুতেই সম্ভব নয়। দুরয় তাই সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

দেওয়াল ঘড়ির টিক টিক শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। ম্যাডেলিন গালে হাত দিয়ে চিত্র পুত্তলিকার মতো বসে আছে। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দুরয় বলে উঠলো—আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন!

এর উত্তরে ম্যাডেলিন বললে—হ্যাঁ, আমি একেবারে ভেঙে পড়েছি।

দুজনেই এক সঙ্গে তাকালো ফরেস্তিয়েরের মৃতদেহের দিকে। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দুরয় বললে—নিদারুণ আঘাত পেয়েছেন আপনি!

ম্যাডেলিন কোনো উত্তর দিল না এ কথায়।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে তুরয় আবার বললে—আপনার মতো কাঁচা বয়সের মেয়ের পক্ষে একা থাকাটা বড্ড কষ্টকর হয়ে উঠবে।

এবারেও কোনো উত্তর দিল না ম্যাডেলিন।

তুরয় বললে—আমাদের সেই বন্ধুত্বের চুক্তির কথাটা ভুলবেন না। কোনো রকম সাহায্যের প্রয়োজন হলেই বিনা দ্বিধায় আমাকে ডাকবেন। আমি সব সময় আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবো।

ম্যাডেলিন তার ডান হাতখানা তুরয়ের দিকে এগিয়ে দিল। তুরয় সঙ্গে সঙ্গে গভীর আবেগে ধরে ফেললো হাতখানা।

ম্যাডেলিন তার দিকে তাকিয়ে করুণ কণ্ঠে বললে—আপনার সাহায্যের কথা কোনোদিনই আমি ভুলবো না। তাছাড়া আপনার কোনো দরকারে আমি যদি কিছু করতে পারি তাহলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করবো।

তুরয়ের ইচ্ছে হচ্ছিল ম্যাডেলিনের হাতে চুমু দিতে। দিলোও শেষ পর্যন্ত। তবে বেশিক্ষণ ঠোঁটের ওপর হাতটা চেপে রাখতে পারলো না।

হাতে চুমু দেওয়ার পর তুরয় ভাবলো যে, এই সুযোগে কথাটা পাড়লে মন্দ হয় না। কিন্তু সামনে ফরেস্তিয়েরের মৃতদেহটা থাকায় বাধো বাধো ঠেকছিল তার।

মৃতদেহ থেকে একটা বিশ্রী গন্ধ বের হচ্ছে। তুরয় তাই ম্যাডেলিনকে বললে—জানালাটা খুলে দেবো কি? কেমন যেন একটা গন্ধ পাচ্ছি।

ম্যাডেলিন বললে—হ্যাঁ, আমিও পাচ্ছি। জানালাটা খুলেই দিন।

তুরয় উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ফুর ফুর করে হাওয়া ঢুকলো ঘরে। হাওয়ার সঙ্গে ভেসে এলো ফুলের সুবাস। তুরয় তখন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ম্যাডেলিনকে ডাকলো—আসুন না, একটু হাওয়ায় দাঁড়াবেন।

তুরয়ের আহ্বানে ম্যাডেলিন চেয়ার ছেড়ে উঠে তার পাশে এসে দাঁড়ালো। তুরয়ের মনে হলো, এখনই কথাটা বলা দরকার। সে তাই অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে শুরু করলো—আপনাকে একটা কথা বলবার আছে আমার। রাগ করবেন না। একটু ভেবে দেখবেন আমার কথাটা। বুঝতে চেষ্টা করবেন। কাল সকালেই আমি চলে যাচ্ছি। এই জন্যই কথাটা বলে রাখছি। নইলে আর কখনো হয়তো বলবার সুযোগই পাবো না।

এই কথা বলে একটু দম নিয়ে তুরয় আবার বললে—আপনার হয়তো মনে

থাকতে পারে, একদিন আপনার বাড়িতে আমি বলেছিলাম, আপনার মতো একটি নারীকে স্ত্রীরূপে পেলে আমার জীবনটা সার্থক হতো। আজও আমি সেই কথাই বলছি। উত্তর দেবার সময় এটা নয়। উত্তর পেতেও আমি চাইনে। আমি শুধু এই কথাটা আপনাকে বুঝাতে চাইছি যে, আমি যদি সব সময় আপনার পাশে থাকতে পারি তাহলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করবো।

কথা শেষ হলো দুরয়ের। তার কনুই তখন ম্যাডেলিনের কনুইয়ের সঙ্গে লেগে রয়েছে। ম্যাডেলিনের মুখে তখন কোনো কথা নেই। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে শুধু বললে—ঠাণ্ডা লাগছে।

এই কথা বলেই নিজের চেয়ারে ফিরে এলো সে। দুরয়ও এসে তার চেয়ারটায় বসলো।

মৃতদেহ থেকে তখন একটু বেশি করেই দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। দুরয় তাই ম্যাডেলিনের দিকে তাকিয়ে বললে—কাল সকালেই কফিনে পুরে ফেলতে হবে।

ম্যাডেলিন বললে—হ্যাঁ, সেই ব্যবস্থাই করা হচ্ছে। সকাল আটটায় লোকজন আসবে।

দুরয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে—আহা বেচারা!

ম্যাডেলিনের নাক থেকেও একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বের হলো। সেটা আরও গভীর। আরও মর্মান্তিক।

মৃতদেহের দিকে দুজনের কেউই আর আগের মতো তাকাচ্ছে না।

শেষ রাত্রের দিকে ঘুমিয়ে পড়লো দুরয়। ভোর বেলায় ঘুম ভাঙতেই সে তাকালো ফরেস্তিয়েরের মুখের দিকে। কী আশ্চর্য! ওর মুখে দেখছি দাড়ি গজিয়ে গেছে! ঠিক জীবিত মানুষের মতো।

আটটার আগেই লোকজন এসে গেল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃতদেহটা কফিনে পোরা হলো। এরপর যেন স্বস্তি ফিরে এলো ম্যাডেলিনের আর দুরয়ের মনে। এবার তারা অনেকটা স্বাভাবিক ভাবেই কথাবার্তা বলতে লাগলো।

একটু পরেই শুরু হলো মৃতদেহ কবর দেবার কাজ। ম্যাডেলিন আর দুরয় বসে আছে নিচের ড্রয়িং রুমে। জানালাগুলো খোলা। খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসছে অ্যারোমেটিকস-এর তীব্র গন্ধ। ম্যাডেলিন বললে—চলুন বাগানে যাওয়া যাক।

বাগানে এসে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো দুজনে। কারো মুখেই কোনো কথা নেই। কিছুক্ষণ পরে ম্যাডেলিন বললে—শুনুন বন্ধু! আপনি গতরাত্রে যা বলেছেন সে কথা আমি ভেবে দেখেছি। আমার কাছ থেকে কোনো কিছু না শুনেই আপনি প্যারীতে চলে যাবেন, এটা আমি চাইনে। আমি অবশ্য হ্যাঁ কিংবা না—কোনো কিছুই বলছিনে, সে কথা বলবার সময় এটা নয়। তবে আপনি আমাকে ভাল করে দেখুন, বুঝুন, আমিও আপনাকে দেখি এবং বুঝি।

এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ থেমে গেল সে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পায়চারি করে আবার সে বলতে শুরু করলো—চার্লসকে সমাধি দেবার আগে আমি এ বিষয়ে কোনো কিছু বলতাম না। তবে আজই আপনি চলে যাচ্ছেন বলেই কথাটা বলতে বাধ্য হলাম। আপনি মনে রাখবেন, বিয়েটা আমার কাছে কোনো বন্ধন নয়। আমার স্বাধীন চলাফেরায় কেউ বাধা দেয় অথবা আমার ওপর কেউ প্রভুত্ব করার চেষ্টা করে—তা আমি সহ্য করতে পারি নে। আমার মত হলো স্বামী স্ত্রী উভয়েই সমান সমান। আমার এ মতের সঙ্গে অপরের মত হয়তো না মিলতে পারে। তবুও আমার এই মতই মেনে চলতে হবে। আমার এ কথার উত্তর এখনই আমি চাইছিনে আপনার কাছে। এ নিয়ে কথা হবে পরে। প্যারীতে গিয়ে আবার যখন আমাদের দেখা হবে তখনই হবে এ সব কথা। হ্যাঁ, ভাল কথা। আপনি কি এখনই চলে যেতে চাইছেন?

দুরয় বললে—না, আমি আগামী কাল যাবো।

—বেশ, আপনি তাহলে কিছুক্ষণ বাইরে ঘুরে আসুন। আমি কাররে-শনের যায়গায় যাচ্ছি। সন্ধ্যায় আবার দেখা হবে।

দু'জনের দেখা হলো রাত্রে ডিনারের সময়। দু'জনেই তখন ক্লান্ত। পরের দিন বিনা আড়ম্বরে ফরেস্তিয়েরের মৃতদেহ কবর দেওয়া হলো।

কবর দেওয়া হয়ে গেলে দুরয় বিদায় চাইলো ম্যাডেলিনের কাছে। গভীর আবেগে মাদামের হাতে দুরয় চুমো দিয়ে বললে—আশা করি শীগ্‌গিরই আবার দেখা হবে আমাদের।

॥ নয় ॥

প্যারীত ফিরে এসেই দুরয় আবার মাদাম মোরেলের সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করলো। রুয়ে দে কনস্তান্তিনোপলের ফ্লাটে ঘন ঘন যাতায়াত শুরু হলো দু'জনের। প্রতিদিনই মাদাম হাজির হতো সেখানে। এসে দেখতো, দুরয় তার আগেই এসে তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

একদিন কথায় কথায় মাদাম বললে—তুমি দেখছি আমার স্বামীকেও ছাড়িয়ে গেলে! এতটা কিন্তু ভালো নয়।

দুরয় বললে—তোমাকে আমি আমার স্ত্রী ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারি নে। আমি ভাবতেই পারি নে যে, তোমার একজন স্বামী আছেন এবং তিনি তোমাকে আমারই মতো উপভোগ করেন।

—না, তোমার মতো উপভোগ করতে আমি তাকে দিই না। তবে বোঝো তো, বাধাও দিতে পারি নে।

মাদাম মোরেলের প্রেমে দুরয় যখন এই ভাবে মশগুল হয়ে আছে সেই সময় একদিন ম্যাডেলিনের কাছ থেকে একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি এলো তার কাছে।

চিঠিতে সে লিখেছে :

আমি প্যারীতে ফিরে এসেছি। আপনার দেখা পেলে খুশি হবো। ইতি

ম্যাডেলিন ফরেস্তিয়ের।

চিঠিখানা দুরয় পেলো সকাল ন'টায়। সেই দিনই বিকেলে সে হাজির হলো ফরেস্তিয়েরের ফ্লাটে।

দুরয়কে দেখে ম্যাডেলিন খুশি হলো। মৃদু হেসে হাত দুটি বাড়িয়ে দিল তার দিকে। ম্যাডেলিনের সেই নরম হাত দুটি নিজের হাতে নিয়ে গভীর আবেগে চুম্বন করলো দুরয়।

ম্যাডেলিন বললে—আমার বিপদের দিনে তুমি যে ভাবে আমাকে সাহায্য করেছো সে কথা আমি কোনো দিন ভুলতে পারবো না।

দুরয় বললে—তোমার জন্যে আমি সব কিছু করতে প্রস্তুত।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিলো দুজনের। এবার বসলো দুজনে। প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে একখানা কোচের ওপরে বসলো ওরা।

ম্যাডেলিন প্রথমেই জানতে চাইলো ফ্রাঁনচাইল্ পত্রিকার খবর। পত্রিকার কথা সে ভুলতে পারেনি।

ম্যাডেলিন বললে—সাংবাদিকতা আমার খুব ভাল লাগে। ফরেস্তিয়ের বেঁচে থাকতে তার বেশির ভাগ কাজ আমিই করে দিতাম। শুধু অফিসে গিয়ে বসতাম না, এই যা।

ডুরয় দেখলো এই সুযোগ। সে তাই ম্যাডেলিনের দিকে তাকিয়ে বললে —বেশ তো, আবার শুরু করো না। মাদাম ফরেস্তিয়েরের পরিবর্তে মাদাম ডুরয়ও তো কাজ করতে পারে।

ডুরয়ের কথার ইঙ্গিতটা বুঝতে দেরি হলো না ম্যাডেলিনের। সে তাই ডুরয়ের কাঁধের ওপর বাম হাতখানা তুলে দিয়ে বললে—ওসব কথা এখন থাক, বন্ধু।

ডুরয়ের মনে হলো, এটা এক রকম স্বীকৃতিরই আভাষ। সে তাই ম্যাডেলিনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে বললে—তোমাকে না পেলে আমি বাঁচবো না ম্যাডেলিন। এখন তো আর কোনো বাধা নেই।

ম্যাডেলিন বললে—আমাকে আর একটু ভাবতে দাও। এই বলে দাঁড়িয়ে উঠলো সে।

ডুরয়ও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠলো। তারপর ম্যাডেলিনকে বুকে চেপে ধরে তার ঠোঁট দুটিতে গভীর আবেগে একটা চুমো দিয়ে বললে—আমি যে আর ধৈর্য ধরতে পারছিনে।

ম্যাডেলিন নিজেকে ডুরয়ের বাহুপাশ থেকে মুক্ত করে নিয়ে বললে—শোনো বন্ধু! আমি এখনও আমার মনঃস্থির করতে পারিনি। তবে সম্ভবতঃ আমি হ্যাঁ-ই বলবো। কিন্তু যতদিন আমি আমার মতামত না জানাই তত-দিন এসব কথা নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করো না।

ডুরয় বললে—এ কথা তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না।

আরও কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর ডুরয় বিদায় নিল ম্যাডেলিনের কাছে। যাবার সময় আর একবার সে চুমো দিয়ে গেল ম্যাডেলিনের মুখে।

এরপর থেকে ডুরয় তার কাজে বিশেষ ভাবে মন দিল। সব সময় সে চেষ্টা করতে লাগলো সাংবাদিক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। তাছাড়া সঞ্চয়ের দিকেও মন দিল সে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই সে দেখা করে আসে ম্যাডেলিনের সঙ্গে।

নিজের কাজ সম্বন্ধেও আলোচনা করে তার সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের প্রস্তাব আর সে তোলে না।

তার ব্যবহারে ম্যাডেলিন খুশি হয়। কিন্তু সে-ও বিয়ের কথা তোলে না।

এদিকে ক্লতিলদের সঙ্গেও প্রেম চলছে দুরয়ের। ম্যাডেলিনকে এখনও সে পায়নি। অতএব ক্লতিলদেকে তার চাই-ই।

ক্লতিলদের সঙ্গে দুরয়ের যে বিশেষ রকম ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে সে কথা ম্যাডেলিন ভাল করেই জানে। তবে সে ঘনিষ্ঠতা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে তা সে জানে না। কিন্তু আসল কথা না জানলেও এটা সে সন্দেহ করতো যে, ওদের মধ্যে হয়তো তার সম্বন্ধে আলোচনা চলে। সে তাই একদিন কথায় কথায় দুরয়কে বললে—মাদাম মোরেলের সঙ্গে আমার কথা নিয়ে আলোচনা করোনি তো?

—না। তুমি নিষেধ করে দিয়েছো বলে কারো সঙ্গেই এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করিনি।

—ঠিক আছে। আমি না বলা পর্যন্ত এ ব্যাপারে চুপ করেই থেকো।

—নিশ্চয়ই। তবে আর কতদিন এভাবে ঝুলে থাকবো? আমি যে আর ধৈর্য ধরতে পারছিনে, ডার্লিং।

ম্যাডেলিন হেসে বললে—আর বেশীদিন ধৈর্য ধরতে হবে না। শরৎ কাল এসে পড়লো বলে। শরতের প্রথমেই আমার মতামতটা জানতে পারবে।

শরৎ কাল এসে পড়লো। শরতের প্রথম সপ্তাহে দুরয় ম্যাডেলিনের সঙ্গে একদিন দেখা করতে গেলে ম্যাডেলিন বললে—বসো। আমার মতামতটা আজই তোমাকে জানিয়ে দেবো।

ম্যাডেলিনের কথা শুনে দুরয়ের মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা সন্দেহও উঁকি দিল তার মনের মধ্যে! ম্যাডেলিন তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে না তো? সে তাই ম্যাডেলিনের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললে— আমার হৃদয়ে বজ্রাঘাত করবে না তো!

—না গো, না। আমি আমার মনঃস্থির করে ফেলেছি। এবার তুমি তোমার বন্ধুদের বলতে পারো। ওয়াল্টারকে আমিই বলবো।

কথাটা শুনে দুরয়ের মনটা এতই খুশি হলো যে, সে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলো না। সে দুহাত দিয়ে ম্যাডেলিনকে জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটে, তাকে আর কপালে চুমোর পর চুমো দিতে লাগলো।

ম্যাডেলিন বললে—এসব পরে হলেও চলবে, এবার আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনো।

হৃদয় তাকে ছেড়ে দিয়ে বললে—বলো।

—বিয়ের ব্যাপারটা সামনের সপ্তাহেই সেরে নিতে চাই।

—বেশ, তাই হবে।

—১০ই মে আমায় জন্মদিন। ওই দিনেই বিয়ে হবে।

—বেশ, তাই হবে।

—তোমার বাবা মা রোয়েনের কাছে থাকেন, বলেছিলে না?

—হ্যাঁ, রোয়েনের কাছে, কাস্তেল নামে একটি গ্রামে।

—কি করেন তাঁরা?

—ওখানে বাবার কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে, সে সব দেখাশুনা করেন।

—বিয়ের পরে আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে তো?

—তুমি যদি যেতে চাও তাহলে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো। কিন্তু সেই গ্রাম্য পরিবেশ কি তোমার ভাল লাগবে?

—ভাল লাগবে না কেন? আমিও গ্রামে জন্মেছি। ছেলেবেলায় গ্রাম্য আবহাওয়াতেই মানুষ হয়েছি আমি। তাছাড়া বিয়ের পরে শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে পরিচয় হওয়াটাও দরকার।

এখানেই হৃদয়ের আপত্তি। তার বাবা-যে নিতান্তই চাষী গেরস্থ। কিন্তু কথাটা চেপে রাখা সঙ্গত হবে না মনে করে হৃদয় বললে—শোনো ডার্লিং, কথাটা তাহলে খুলেই বলি তোমাকে। আমার বাবা চাষী গেরস্থ। নিজের হাতে চাষ-আবাদ করেন। তাছাড়া একটা সরাইখানাও আছে। তাতেই কোনো রকমে চলে যায়। বাবা আমাকে অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। কিন্তু আমি তাঁর জন্যে আজও বিশেষ কিছু করতে পারিনি।

একটু চুপ করে থেকে হৃদয় আবার বললে—বাবা-মার কথা বলতে আমার লজ্জা নেই। কিন্তু তুমি হয়তো তাঁদের শ্রদ্ধা করতে পারবে না।

—কে বললে আমি তাঁদের শ্রদ্ধা করতে পারবো না। আমি নিজেও বড় ঘরের মেয়ে নই। আমার বাবাও ছিলেন সাধারণ একজন গৃহস্থ। তবে দুঃখের কথা এই যে, আমার বাবা-মা আজ আর জীবিত নেই। সত্যি কথা বলতে কি, তুমি ছাড়া আমার আর আপনার বলতে কেউ নেই। সুতরাং তোমার বাবা-মাকে আমি নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা করতে পারবো।

ম্যাডেলিনের কথা শুনে খুশি হলো দুরয়। কিছুক্ষণ আগে দুর্ভাবনার যে কালো মেঘ জমে উঠেছিল দুরয়ের মনে, সে মেঘ কেটে গেল ম্যাডেলিনের কথায়। সে তাই খুশি হয়ে বললে—তোমার কথা শুনে একটা বড় দুর্ভাবনা কেটে গেল আমার।

—দুর্ভাবনা! কিসের দুর্ভাবনা?

—আমার বাবা-মার পরিচয় শুনে তুমি হয়তো—

—ছিঃ! আমাকে কি তুমি এতই ছোট মনে কর?

—না, তা মনে করিনে, তবে তুমি যে পরিবেশে মানুষ তার সঙ্গে আমাদের গ্রামের বাড়ির পরিবেশ মোটেই খাপ খাবে না কিনা!

—ওসব কথা নিয়ে তোমাকে আর দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হতে হবে না। এবার যা বলছি শোনো।

—কি?

—কথাটা বলতে আমি সঙ্কোচ বোধ করছি।

—আমার কাছে বলতে আবার সঙ্কোচ কিসের?

—শোন ডার্লিং! অন্যান্য মেয়েদের মতো আমারও কিছু দুর্বলতা আছে স্বামীর এবং নিজের নাম সম্বন্ধে। আমার ইচ্ছে, তোমার নামের সঙ্গে উঁচু-দরের কিছু কথা যোগ করা হবে।

—আমিও এ কথা ভেবেছি, কিন্তু তেমন কিছু বের করতে পারিনি মাথা থেকে।

—আমি ওটা ঠিক করে ফেলেছি। এখন থেকে তুমি নিজের নামটি লিখতে শুরু করে' দুরয় দে কান্তেল বলে।

ম্যাডেলিনের কথাটা শুনে খুশি হয়ে দুরয় বললে—হ্যাঁ, এটা বেশ ভালোই হবে। আগামী পরশুর জন্যে যে প্রবন্ধটা লিখছি তার নিচে এই নামটি ব্যবহার করবো। তবে সংক্ষিপ্ত সমাচার ইত্যাদির নিচে দুরয় নামটাই ব্যবহার করবো।

এরপর আরো কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর দুরয় বিদায় গ্রহণ করলো তার ভাবী পত্নীর কাছ থেকে।

পরদিন সকালেই ক্লতিলদের কাছ থেকে একখানা টেলিগ্রাম পেলো দুরয়। টেলিগ্রামে সে জানিয়েছে যে, দুপুর একটার সময় সে আসছে।

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই দুরয় হাজির হলো ওদের ফ্লাটে। একটার মিনিট

দু'য়েক পরেই ক্লতিলদে এসে হাজির হলো সেখানে। দুরয়কে দেখেই সে তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু দুরয়ের দিক থেকে আজ আর আগের মতো সাড়া পেলো না। দুরয়কে আজ কেমন যেন নিরুৎসাহ বলে মনে হলো। ব্যাপার দেখে ক্লতিলদে বিস্মিত হয়ে বললে—কি হয়েছে তোমার ?

দুরয় বললে—বসো, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

দুরয়ের কথা শুনে ক্লতিলদে আরও বিস্মিত হলো। কী এমন জরুরী কথা থাকতে পারে যার জন্য আজ সে তার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করছে। সে তাই খাটের ওপরে বসে বললে—কি বলতে চাইছো তুমি ?

দুরয় একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলতে স্বরু করলো—শোনো ডার্লিং! আজ তোমাকে এমন্ একটা খবর বলতে যাচ্ছি যা শুনে তুমি হয়তো খুবই দুঃখ পাবে। কিন্তু তবুও কথাটা তোমাকে না বলেও পারছিনে। তোমাকে যদি আমি স্ত্রীরূপে পেতাম বা পাবার কোনো সম্ভাবনা থাকতো তাহলে ব্যাপারটা অন্যরকম হতো। কিন্তু তুমিতো জানো, আমার এমন কেউ নেই, যে আমার বিপদে-আপদে, অসুখে-বিসুখে সব সময় পাশে থাকতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, এত বড় প্যারী শহরে আমায় সাহায্য করবার, সেবা করবার অথবা শোকে দুঃখে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। এ অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবেই লোকে যা করে আমিও তাই করেছি। অমি বিয়ে করবো বলে স্থির করেছি।

দুরয়ের কথাগুলো শুনে ক্লতিলদে একেবারে চুপ করে গেল। তার মাথাটা তখন ঘুরছে। নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতিও বেড়ে গেছে। তার মুখ থেকে শুধু মাত্র একটি কথা বেরিয়ে এলো—ও ভগবান!

দুরয় বললে—শ্লো ডার্লিং, আমার কথাটা একবার ভেবে দেখো। আমি যদি তোমাকে বিয়ে করতে পারতাম তাহলে ও রকম কথা মনেও আসতো না।

ক্লতিলদে তখনও নির্বাক। তাঁর চোখ দিয়ে তখন অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে গালের ওপর দিয়ে।

তাকে কাঁদতে দেখে দুরয় বললে—কেঁদো না ডার্লিং। তোমার চোখে জল দেখলে দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়।

ক্লতিলদে অনেক চেষ্টায় নিজেকে কিছুটা সংযত করে বললে—কাকে বিয়ে করছো জানতে পারি কি ?

ভাবী পত্নীর নাম বলতে বাধো বাধো ঠেকছিল দুরয়ের। কিন্তু বলতে যখন হবেই তখন মন থেকে সব সংকোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে বললে—ম্যাডেলিন করেস্তিয়েরকে।

নামটা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লতিলদের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। সে তখন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে উঠে দরজার দিকে পা বাড়ালো।

দুরয় ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললে—ক্লো ডার্লিং, এমন ভাবে চলে যেও না।

ক্লতিলদে বললে—আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি যা চাও তা তো পেয়েছ, আর কেন?

এই বলে নিজেকে দুরয়ের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়ে সে দ্রুত পদক্ষেপে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ক্লতিলদে এইভাবে চলে যাওয়ায় দুরয়ের মনটা হু হু করে উঠলো। তার মনে হলো, জীবনটা যেন শূন্য হয়ে গেলো এবার। এতদিন যাকে নিজের স্ত্রীর মতো উপভোগ করে এসেছে আজ থেকে আর তাকে পাবে না, এই কথা মনে হতেই তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। কিন্তু একটু পরেই তার মনটা খুশি হয়ে উঠলো। নিজের মনেই সে বলে উঠলো, যাক, এটা এক রকম ভালই হলো। এ ব্যাপারে আর কোনো ঝামেলা রইলো না।

পরদিন ম্যাডেলিনের সঙ্গে দুরয়ের দেখা হলে সে যখন জিজ্ঞেস করলো ক্লতিলদেকে খবরটা জানানো হয়েছে কিনা, তখন দুরয় তাকে জানালো যে, গতকালই তাকে সে জানিয়ে দিয়েছে খবরটা।

—খবরটা শুনে সে কি বললে?

দুরয় অম্লান বদনে মিথ্যে কথা বললো। সে বললে—মাদাম মোরেল খুবই খুশি হয়েছে খবরটা শুনে।

ম্যাডেলিন তখন দুরয়কে বললে যে, বিয়েটা খুব সংক্ষেপে সারতে হবে এবং বিয়ের পরেই তারা দুরয়ের গ্রামের বাড়িতে যাবে তার বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করতে।

দুরয় নানা ভাবে চেষ্টা করলো ম্যাডেলিনকে নিবৃত্ত করতে। কিন্তু ম্যাডেলিন কিছুতেই রাজী হলো না। অবশেষে বাধ্য হয়েই দুরয়কে মেনে নিতে হলো ম্যাডেলিনের কথা।

পূর্ব ব্যবস্থা অনুসারে ১০ই মে তারিখেই শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হলো। পরদিন বিকেলের ট্রেনেই ওরা রওনা হলো রোয়েন অভিমুখে। ক্যাস্তেল যেতে হলে রোয়েন স্টেশনেই নামতে হয়।

ট্রেনে উঠে তুরয় পড়লো আর এক বিপদে। নব-পরিণীতা পত্নীর সঙ্গে কিভাবে কথা বলবে, কিভাবে তার সঙ্গে ব্যবহার করবে তা সে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারলো না। কামরায় কোনো তৃতীয় ব্যক্তি না থাকায় তাদের কথা-বার্তায় কোনো রকম বাধা হবার কথা নয়। কিন্তু তা সত্বেও তুরয় সহজ ভাবে কথা বলতে পারছিল না। যখনই সে দুটো প্রেমের কথা বলতে যাচ্ছিল তখনই ম্যাডেলিন তাকে ধমক দিয়ে বলছিল—ওসব কথা এখন থাক।

তুরয় আর সহ্য করতে পারছিল না। সে হঠাৎ ম্যাডেলিনকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো তার গালে ঠোঁটে চুমু দিতে লাগলো তারপর জোর করেই তাকে শুইয়ে ফেললো বেঞ্চির ওপরে।

ম্যাডলিন বললে—এসব কি হচ্ছে? তোমার কি একটুও ধৈর্য নেই। বাড়িতে গিয়েই তো হতে পারবে।

কিন্তু কে শোনে তার কথা। ট্রেনের মধ্যেই একবার হয়ে গেল কাজ।

এর পরেই শুরু হলো কেবল কথা আর কথা। কথায় কথায় ম্যাডেলিন বললে—চার্লস বেশ কিছু অর্থ জমিয়েছে। সবই আমার কাছে আছে।

—কত?

—তা প্রায় চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ। এছাড়া আমার নিজেরও কিছু আছে। ব্যাঙ্কে এখন প্রায় ষাট হাজার ফ্রাঁ আছে আমার হিসেবে। চার্লস সব টাকা আমার হাতেই তুলে দিতো। এ ব্যাপারে সে ছিল আদর্শ স্বামী।

বারবার চার্লসের নাম শুনে তুরয় বিরক্ত হলো। ম্যাডেলিনের দিকে তাকিয়ে সে বললে—আমি কি তোমার বিগত স্বামীর গুণকীর্তন শুনতে ক্যাস্তেলে যাচ্ছি?

তুরয়ের কথা শুনে ম্যাডেলিন তার গায়ে একটা মৃদু চাপড় মেরে বললে—কথাটা তুমি ঠিকই বলেছো। আমি এর জন্যে ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে।

সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে ধরণীর বুকে। ট্রেনটা তখন সীন নদীর ধার দিয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে দিনের আলো মিলিয়ে যাচ্ছে নদীর বুকে। দুজনে পাশাপাশি বসে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে। হঠাৎ তুরয় ম্যাডেলিনের কোমরটা জড়িয়ে ধরে বললে—তোমাকে যে আমি কি ভালবাসি

তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি সেই-দিনই আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলি।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, তা-ই। তোমাকে যে স্ত্রীরূপে পাবো একথা কোনোদিন চিন্তাও করতে পারিনি। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার কাছ থেকে স্বীকৃতি পাবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ কথা আমি ভাবতে পারিনি।

—এবার তো পেরেছো ?

—হ্যাঁ তা পেরেছি। এবং পেরেছি বলেই তোমাকে সব সময় জড়িয়ে ধরে রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

—বেশ, তাই রাখো. তবে অন্য কিছু কিন্তু নয়।

—তা না হয় না হলো, কিন্তু চুমু দিতে তো বাধা নেই!

ম্যাডেলিন এবার নিজের মুখখানা এগিয়ে দিলো হৃদয়ের মুখের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে একটা চুমু দিল হৃদয়। তারপর দুই হাত দিয়ে ম্যাডেলিনকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে আর একটা চুমু। এবারের চুমুটা হলো প্রলম্বিত এবং গভীর। ম্যাডেলিন তার দেহটি এলিয়ে দিল হৃদয়ের বুকে। হৃদয় বুঝতে পারলো যে, এবার সে দেহদান করতে চাইছে। সে তখন আবার তাকে শুইয়ে ফেললো সিটের ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো উন্মত্ত যৌন-মিলন। এবারের মিলনটা আগের বারের চাইতেও আনন্দের হলো হৃদয়ের কাছে।

যৌনক্রিয়ায় উভয়েই তখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তখনও তারা উভয়ে উভয়কে ছাড়ছে না। এ-ওকে জড়িয়ে ধরে রইলো অনেকক্ষণ।

পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই ম্যাডেলিন তার চুল ঠিক করতে লাগলো। তারপর হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে বললে—আমরা এখানে ছেলেমানুষের মতো কাজ করছি।

হৃদয় বললে—এই রকম ছেলেমানুষিই সব সময় করতে চাই আমি।

এই বলে আর একটা চুমু দিল সে ম্যাডেলিনের মুখে। এরপর আর কোনো কথা নেই। দুজনে গালে গাল লাগিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

রাত প্রায় দশটার সময় ওরা য়োয়েনে পৌছে গেল। এখান থেকে ক্যাস্তেলে যেতে হবে ঘোড়ার গাড়িতে। তবে রাত্রে গাড়ি পাওয়া যাবে না। ওরা তাই স্টেশনের নিকটবর্তী একটা হোটেলে উঠে রাতের মতো একটা কামরা ভাড়া নিলো। তারপর রাতের আহার শেষ করে শুয়ে পড়লো সেই কামরায় গিয়ে।

সকাল আটটায় হোটেলের একজন পরিচালিকা এসে তাদের ঘুম ভাঙালো। পরিচারিকা তাদের সকালের খাবার আর চা নিয়ে এসেছিল। দুরয় আর ম্যাডেলিন হাত মুখ ধুয়ে চা আর খাবার খেতে বসলো।

খেতে খেতে দুরয় বললে—একটু পরেই আমরা বেরিয়ে পড়বো আমাদের গ্রামের উদ্দেশে। বাবার কাছে আগেই খবর পাঠিয়েছি। ওখানে গিয়ে বাবা আর মা'র সঙ্গে লাঞ্চ খাবো। তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমি একটা গাড়ি ঠিক করে আনছি।

গাড়ি আনতে দেরি হলো না দুরয়ের। ওরা দুজনে তখন সেই গাড়িতে উঠে বসলো। মালপত্র কমই ছিল সঙ্গে। হোটেলের চাকররা সেগুলো তুলে দিল গাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করলো সেই অশ্বযান।

রাস্তাটা বেশ চওড়া। দুই পাশে বড় বড় গাছ। তবে চওড়া হলেও বড় অসমান। গাড়ির ঝাঁকানিতে ম্যাডেলিনের ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। দুরয় তখন তাকে শুইয়ে দিয়ে তার মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিল। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লো ম্যাডেলিন।

চড়াই পথে কিছুটা যেতেই দুরয় তাকে জাগিয়ে দিয়ে বললে—বাইরের দৃশ্যটা একবার দেখে নাও ডার্লিং।

ম্যাডেলিন উঠে বসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। জায়গাটার প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যিই খুব চমৎকার। দুটো শহরের মাঝখান দিয়ে সীন নদী বয়ে চলেছে। নদীর বুকে শত শত নৌকা পাল তুলে এগিয়ে চলেছে উজানের দিকে। ভাটির দিকেও চলেছে অনেক নৌকা। সেগুলোতে আর পাল টাঙানো হয়নি; হাল ধরে বসে আছে মাঝি, আর নৌকা চলছে স্রোতের টানে।

শহরের ওধারে পাহাড়। পাহাড়ের বুকে শত শত পাইন গাছ। দেখে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে হয় না ম্যাডেলিনের।

শহর ছেড়ে গ্রামের পথে এসে পড়লো গাড়িটা। সেই পথ ধরে কিছুটা এগোতেই দুজন লোককে আসতে দেখে দুরয় বলে উঠলো—ওই দ্যাখো, বাবা আর মা আসছেন।

এই কথা বলেই গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাতে বললো দুরয়। গাড়ি থামলে সে রাস্তায় নেমে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললো তাদের দিকে। দুরয়ের দেখাদেখি ম্যাডেলিনও নেমে পড়লো গাড়ি থেকে। কিন্তু শ্বশুর-শাশুরীর চেহারা দেখেই তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। একি! এরা যে দেখছি একেবারেই চাষী শ্রেণীর লোক

বুড়োবুড়ী তখন এগিয়ে এসেছে ওদের সামনে। প্রথমটায় তারা দুরয়কে

চিনতেই পারলো না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো ডুরয় আর ম্যাডেলিনের মুখের দিকে।

তাদের ওই ভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে ডুরয় তাদের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললে—সুপ্রভাত মা, সুপ্রভাত বাবা! তোমরা আমাকে চিনতে পারছো না নাকি?

তার কথা শুনে মা ভালো করে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে স্বামীর উদ্দেশে বললে—হ্যাগা, কি দেখছো! এই তো আমাদের ছেলে জর্জেস ডুরয়।

—হ্যাঁ মা, আমিই তোমাদের ছেলে জর্জেস ডুরয়। আর এই আমার স্ত্রী। তোমাদের পুত্রবধু।

জমকালো পোষাক পরা ম্যাডেলিনকে দেখে বেশ একটু ঘাবড়ে গেল বুড়ী। বুড়ো কিন্তু খুশিই হলো। বললে—তাহলে তো আমি চুমো দিতে পারি বৌমাকে।

ম্যাডেলিন বললে—নিশ্চয়ই পারেন।

এই বলে নিজের গাল এগিয়ে দিল বুড়োর দিকে। বুড়ো ম্যাডেলিনকে সস্নেহে চুমো দিয়ে স্ত্রীকে বললে—কিগো! তুমি যে চুপ করে রইলে! বৌমাকে চুমো দেবে না?

বুড়ীও তখন একটা চুমো দিল ম্যাডেলিনের গালে।

ডুরয় বললে—চলো এবার আমরা হেঁটেই যাই।

গাড়োয়ানকে সে বললে—তুমি গাড়ি নিয়ে আমাদের পেছনে পেছনে এসো।

রাস্তায় বাবা আর ছেলে পাশাপাশি চললো। ডুরয়ের মা তাদের অনুসরণ করলো বউকে নিয়ে।

বুড়ো ঘাড় ফিরিয়ে স্ত্রীকে বললে—কি গো! অত পেছনে পড়লে কেন?

বুড়ী বললে—তোমরা এগোও, আমি বউমাকে নিয়ে আসছি।

চলতে চলতে বুড়ো জিজ্ঞেস করলো—কাজ-টাজের খবর কি বলো!

ডুরয় বললে—ভাল। আমি এখন একটা দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হয়েছি। মাসে পাঁচশ' ফ্রাঁ মাইনে পাচ্ছি।

—তাই নাকি! তাহলে তো বেশ বড় চাকরি!

—তা তো বটেই। তাছাড়া সম্মানও আছে এ চাকরিতে। আর এই জন্যেই তো বড়ো ঘরের মেয়েকে বিয়ে করতে পেরেছি।

—বউ কিছু আনতে পেরেছে?

—তা পেয়েছে বৈকি! ব্যাঙ্কে ওর নামে ষাট হাজার ফ্রাঁ জমা আছে।

—তবে তো খাসা বউ পেয়েছো। শুনে আমার নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কাস্তেল গ্রামে পৌছে গেল ওরা। গ্রামে ঢুকতেই একটা সরাইখানা। সাইনবোর্ড টাঙানো রয়েছে 'এলা বেলিটা'। একতলা বাড়ি। সামনে একটা বারান্দা। তারপরেই খাবার ঘর। তার পেছনেই দুরয় পরিবারের বাসগৃহ।

দুরয় তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়িতে এসেছে শুনে প্রতিবেশীরা তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলো। একজন বৃদ্ধা দুরয়ের কাছে এগিয়ে এসে বললে—তুমিই কি আমাদের দুরয়?

—হ্যাঁ, মাসী, আমিই তোমাদের দুরয়।

বুড়ী খুব খুশি হলো দুরয় আর তার বউকে দেখে। বললে—ভগবান তোমাদের দীর্ঘজীবী করুন। এবার বাবা মার দিকে একটু নজর দাও।

দুরয় বললে—হ্যাঁ, এবার আমি মাসে মাসে একশ ফ্রাঁ পাঠাবো বাবার কাছে।

দেখাশুনা এবং পরিচয় পর্ব শেষ হতেই দুরয় ম্যাডেলিনকে নিয়ে তার নিজের ঘরে প্রবেশ করলো। চুনকাম করা দেয়ালের ওপরে স্লেটের ছাদ। ঘরে একখানা সাধারণ খাট। তাতে গদী আর চাদর পাতা। দেয়ালে কয়েকখানা বিবর্ণ ছবি। এছাড়া একখানা চেয়ার আর একটা টেবিলও আছে ঘরে।

দুরয় ঘরের দরজাটা বন্ধ করে ম্যাডলিনকে একটা চুমো দিয়ে বললে—তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগছে না এ জায়গা।

ম্যাডেলিন বললে—ভালো লাগবে না কেন? তবে বড্ড নিরিবিলি।

দুরয় আবার কি বলতে যাচ্ছিল, এই সময় দরজায় করাঘাত শব্দ শুনতে পেয়ে বললে—কে?

বাইরে থেকে তার বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল—তোমাদের লাঞ্চ দেওয়া হয়েছে, এসো।

লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সরাইখানার খাবার ঘরে। গ্রামাঞ্চলের লাঞ্চ যেমন হয়ে থাকে তেমনই হলো। পদ অনেক রকম থাকলেও পরিবেশনের শৃঙ্খলা ছিল না। যেটার পরে যেটা আসার কথা তা না এসে অন্যটা আসতে লাগলো।

দুরয়ের বাবা মা-ও বসেছে ছেলে আর ছেলের বউয়ের সঙ্গে। বাবা

আগেই বেশ কিছুটা মদ টেনে এসেছে। নেশার ঘোরে নানা রকম গল্প করতে লাগলো সে। মাঝে মাঝে রসিকতাও করতে লাগলো। তুরয় হাসতে লাগলো বাবার মুখে সেই সব স্থূল রসিকতা শুনে। বৃদ্ধ যে সব গল্প করছিল সে সব আগেও অনেকবার শুনেছে তুরয়। বাবার মুখেই শুনেছে। কিন্তু তবুও তার ভালো লাগলো। বাবা খুশি হয়েছে বুঝতে পেরেই সে আনন্দিত হলো।

ম্যাডেলিনের কিন্তু মোটেই ভালো লাগছিল না এসব। কিন্তু তবুও সে মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখলো।

লাঞ্চ শেষ হলে তুরয় ম্যাডেলিনকে বললে—এবার চলো, নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

ম্যাডলিনের এখানে ভালো লাগছিল না। সে তাই খুশি হয়ে বললে—হ্যাঁ, তাই চলো।

নদীর তীরে এসে তুরয় একটা নৌকা ভাড়া করে তাতে উঠে বসলো। ম্যাডেলিন বসলো তার পাশে। তুরয়ের নির্দেশে মাঝি একটা চরে নিয়ে গেল নৌকাটা। চরটা বেশ বড়ো। সেখানে নেমে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো দুজনে। ওখানে শুয়ে নদীর কলধ্বনি শুনতে বেশ ভালো লাগলো ম্যাডেলিনের।

সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানে কাটিয়ে আবার ওরা বাড়িতে ফিরে এলো।

রাত ন'টার সময় ডিনার খেতে বসলো সবাই। ডিনারটা মোটেই ভাল লাগলো না ম্যাডেলিনের। একটি মাত্র মোমবাতি জ্বলছে টেবিলে। তার ওপর বুড়ো আবার এত বেশি মদ টেনেছে যে, সে কোনো কথাই বলছিল না। বুড়ীর মুখেও কোনো কথা নেই।

কোনো রকমে ডিনার খেয়ে উঠে পড়লো ম্যাডেলিন। তুরয়ও উঠে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। ম্যাডেলিন তখন তুরয়ের হাত ধরে বললে—চলো, একটু বাইরে যাওয়া যাক।

তুরয় বললে—বেশ, তাই চলো। আমি বুঝতে পারছি এখানে তোমার ভালো লাগছে না।

ম্যাডেলিন বললে—ভালো লাগবে না কেন? তবে এ রকম একটা পরিবেশে থাকতে তো অভ্যস্ত নই, তাই একটু কেমন কেমন লাগছে।

—মিছে কথা বলে লাভ নেই ডার্লিং। আমি বেশ বুঝতে পারছি যে,

তুমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছো। বলো তো আগামী কালই আমরা প্যারীতে ফিরে যাই।

—হ্যাঁ, তাই চলো।

—কিন্তু এখন কি করবে? ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে, না বাইরে কোথাও বেড়াতে যাবে?

—কোথায় যাওয়া যায় বলো তো?

—চলো একবার বনের ভেতরে যাই।

—বেশ, তাই চলো।

বনটা বেশি দূরে নয়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বনে গিয়ে হাজির হলো ওরা।

ম্যাডেলিন বললে—বনটা খুব বড়ো নাকি?

দুরয় বললে—হ্যাঁ, ফ্রান্সের সব চেয়ে বড়ো বন এটা। মাটি থেকে কেমন একটা সোঁদা গন্ধ আসছে দেখছো!

ম্যাডেলিন একবার উপরে তাকালো। গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে। বনের নিস্তব্ধতায় ম্যাডেলিনের ভয়-ভয় করতে লাগলো। দুরয়ের হাত ধরে সে বললে—চলো বাড়ি ফেরা যাক। এখানে আমার ভয় করছে।

দুরয় বললে—বেশ, তাই চলো।

চলতে চলতে ম্যাডেলিন বললে—কালই আমরা প্যারীতে ফিরছি তো?

—হ্যাঁ, কালই।

—কখন? সকালে না বিকেলে?

—তুমি যদি বলো তো সকালেই যাবো।

ওরা যখন বাড়িতে ফিরে এলো তখন বুড়ো-বুড়ী শুয়ে পড়েছে। রাত্রে ঘুম হলো না ম্যাডেলিনের। ভোরে উঠেই সে যাবার জন্যে তৈরী হতে লাগলো।

দুরয় তার বাবার সঙ্গে দেখা করে তার হাতে দুশ' ফ্রাঁ দিয়ে বললে—এটা তোমার খরচের জন্যে দিয়ে যাচ্ছি। সামনের মাসে আবার পাঠাবো! এখন থেকে প্রতি মাসে একশ' ফ্রাঁ করে তোমার কাছে পাঠাবো।

বুড়ো বললে—তোমরা কি এখনই চলে যেতে চাইছো?

—হ্যাঁ বাবা, প্যারীতে এখন অনেক কাজ আমার। বেশিদিন থাকার উপায় নেই।

—আবার শীগগির দেখা হচ্ছে তো ?

—নিশ্চয়ই। ছুটিছাটা পেলেই আমি চলে আসবো।

এরপর সে মায়ের কাছে বিদায় নিতে গেল। মা বললে—আমি বুঝতে পারছি, তোমার বউ এখানে থাকতে চাইছে না। যাই হোক, ভালোভাবে থেকো। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।

সরাইখানার একটা চাকর একখানা গাড়ি ডেকে নিয়ে এলো। তুরয় আর ম্যাডেলিন আর একবার বুড়ো বুড়ীর কাছে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। বেলা তখন দশটা।

গাড়ি চলতে শুরু করলে তুরয় বললে—তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম, আমার বাবা মাকে তোমার ভালো লাগবে না।

ম্যাডেলিন বললে—কে বললে ভালো লাগেনি ? চমৎকার মানুষ ওঁরা। প্যারীতে গিয়েই আমি ওঁদের জন্যে এক বাক্স চকোলেট কিনে পাঠাবো।

একটু পরে ম্যাডেলিন আবার বললে—হ্যাঁ, আর একটা কথা। প্যারীতে গিয়ে আমরা সবাইকে বলবো যে, তোমার বাবার জমিদারিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম আমরা।

তুরয় খুশি হয়ে বললে—বেশ, তাই বলো।

দশ

প্যারীতে ফিরে এসেছে তুরয় আর নবপরিণীতা স্ত্রী। ফয়েস্তিয়রের ফ্লাটেই উঠেছে ওরা। অফিসেও পদোন্নতি হয়েছে তুরয়ের। সে এখন পাকাপাকিভাবে ফ্রানচাইসের রাজনৈতিক সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়েছে। তবে 'সংক্ষিপ্ত সমাচার'-বিভাগটাও হাতে রেখেছে সে। এতে আর্থিক দিক থেকে তার সুবিধেই হয়েছে। রাজনৈতিক সম্পাদক হিসেবে সে যা মাইনে পাচ্ছে তার ওপরও বেশ কিছু ফ্রাঁ সে পাচ্ছে 'সংক্ষিপ্ত সমাচার' স্তম্ভটা সম্পাদনা করার জন্যে।

এই পদোন্নতির খবরটা নিয়ে সেদিন বেশ খোশ মেজাজেই বাড়িতে ফিরলো তুরয়। আসবার পথে ফুলের দোকান থেকে অনেকগুলো গোলাপ কিনে এনেছিল। বাড়িতে এসে সে দেখতে পেলো যে, ম্যাডেলিন নিজের হাতে টেবিল সাজাচ্ছে। তাকে টেবিল সাজাতে দেখে তুরয় বললে—আজ কি কাউকে ডিনারের নিমন্ত্রন করেছ নাকি ?

ম্যাডেলীন বললে—হ্যাঁ। কাউন্ট দে ভাদ্রেক আজ এখানে ডিনার খাবেন।

কথাটা শুনেই দুরয়ের মেজাজ খিঁচড়ে গেল। যাবারই কথা, কারণ ইতি-পূর্বে অনেকের কাছেই সে শুনেছে যে, ম্যাডেলিন এক সময় কাউন্ট দে ভাদ্রেকের উপপত্নী ছিল। শুধু তাই নয়; ফরেস্তিয়েরের সঙ্গে ম্যাডেলিনের বিয়ে-টাও নাকি কাউন্ট দে ভাদ্রেকের চেষ্টাতেই হয়েছিল।

সেইসব কথা মনে পড়ায় হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল দুরয়। তার গোমড়া মুখের দিকে তাকিয়ে চতুরা ম্যাডেলিন বুঝতে পারলো যে, কাউন্টকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করায় সে খুশি হয়নি। সে তাই দুরয়ের দিকে তাকিয়ে হাসিভরা মুখে বললে—কাউন্ট ভাদ্রেক চমৎকার লোক। তাছাড়া আমাকে তিনি খুবই স্নেহ করেন। তুমি দেখতে পাবে, আজই তোমার সঙ্গে তাঁর ভাব হয়ে যাবে।

একটু পরেই কাউন্ট দে ভাদ্রেক এসে হাজির হলেন। এসেই দুরয়ের সঙ্গে করমর্দন করলেন তিনি। তারপর ম্যাডেলিনের হাতে একটা চুমু দিলেন।

দুরয় তাঁকে বসতে অনুরোধ করলে তিনি একখানা সোফায় বসলেন। তারপর দুরয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—এখন তো আপনি আমার নিকট আত্মীয়ের মতো। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন যে, আপনার স্ত্রীকে আমি নিজের মেয়ের মতো স্নেহ করি।

দুরয় বললে—হ্যাঁ, ওর কাছে আপনার কথা আমি শুনেছি। আমি আরও শুনেছি যে, চার্লসের সঙ্গে আপনিই ওর বিয়ে দিয়েছিলেন।

—ঠিকই শুনেছেন। তাছাড়া খবরের কাগজের অফিসে তার চাকরিও আমিই দিয়েছিলাম ওয়াল্টারকে বলে। ওয়াল্টার আমার কথা ফেলতে পারে না।

ওয়াল্টার যে কাউন্ট দে ভদ্রেকের কথা ফেলতে পারে না এ খবর দুরয় আগে থেকেই জানে। সুতরাং কাউন্টকে বিশেষভাবে খাতির-যত্ন করতে লাগলো সে। কাউন্টও তার সঙ্গে আগের মতো দূরত্ব বজায় রেখে কথা না বলে বেশ অন্তরঙ্গ-ভাবেই কথা বলতে লাগলেন। ম্যাডেলিন খুশি হলো দুরয়কে অন্তরঙ্গভাবে কাউন্টের সঙ্গে কথা বলতে দেখে।

সেদিনের ডিনারটা বেশ ভালোই হলো। ডিনারের পরেও কাউন্ট অনেকক্ষণ রইলেন দুরয়ের ফ্ল্যাটে। আলাপ আলোচনা করলেন তার সঙ্গে।

অবশেষে তিনি চলে গেলে ম্যাডেলিন বললে—কেমন মনে হলো কাউন্টকে?

তুরয় বললে—বেশ ভালো। ওর মতো একজন পৃষ্ঠপোষক পাওয়া রীতিমত ভগ্যের কথা।

—তাহলে বুঝলে তো, আমি যা বলেছি তাই ঠিক। যাইহোক, এবার স্টাডিতে চলো। মরোক্কো সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটা লিখবে বলছো সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

স্টাডিতে এসে ম্যাডেলিন একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রবন্ধটা সম্বন্ধে তার বক্তব্য বলতে শুরু করলো। কিন্তু যাকে বলা হলো সে আর আগের মতো কাঁচা নয়। ইতিমধ্যেই সে সাংবাদিকতায় পোক্ত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া ফ্রান্সের রাজনীতির গতি প্রকৃতিও সে এখন খুব ভালো বোঝে। সে তাই আপত্তি জানিয়ে বললে—তোমার বক্তব্য ঠিক নয়। আমি মন্ত্রীমণ্ডলীকে আক্রমণ করে প্রবন্ধটা লিখতে চাই।

—বেশ, তোমার বক্তব্যটা এবার বলো।

দুরয় তখন বেশ জোরালো ভাষায় তার বক্তব্যটা শুনিয়ে দিলো ম্যাডেলিনকে। তার বক্তব্য শুনে ম্যাডেলনি বুঝতে পারলো যে, তার কথাই ঠিক। মনে মনে সে সমর্থনও করলো তুরয়কে। বললে—বেশ, তাহলে এখনই শুরু করা যাক লেখা।

তুরয় লিখতে বসলো। কি লিখবে তাও সে জানে। কিন্তু মুস্কিল হলো বক্তব্যটা ভাষায় প্রকাশ করা নিয়ে। লেখায় এখনও তার হাত পাকেনি।

ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হলো না ম্যাডেলিনের। সে তাই তুরয়ের পাশে দাঁড়িয়ে তার বক্তব্য বিষয়কে ভাষায় প্রকাশ করতে লাগলো। তুরয়ও বশংবদ ছাত্রের মতো ম্যাডেলিনের ডিক্টেশনটা লিখে যেতে লাগলো।

ম্যাডেলিন মাঝে মাঝে তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো—কেমন, এই কথাই তো তুমি বলতে চাও?

তুরয় বলে—হ্যাঁ। আমার কথাগুলো তুমি চমৎকারভাবে ভাষায় রূপ দিতে পেরেছো।

এক ঘণ্টার মধ্যেই লেখা শেষ হলো। বেশিরভাগই ম্যাডেলিনের কথা। তবে মাঝে মাঝে তুরয় কিছু কিছু টিপ্পনী জুড়ে দেল। টিপ্পনী দেওয়ার কাজে তুরয় ইতিমধ্যেই বেশ হাত পাকিয়েছে। ফলে প্রবন্ধটা আরও জোড়ালো হলো।

তুরয় দে ক্যান্তেলের নামে প্রবন্ধটা বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের মধ্যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হলো। কাগজের মালিক মশিয়ে ওয়াল্টার তো

মহা খুশি। ওয়াল্টার তাকে বললে যে, সে এখন থেকে রাজনৈতিক বিভাগটা নিয়েই থাক, কারণ তাতে বিভাগটা আরও ভালো ভাবে চালাতে পারবে সে।

'সংক্ষিপ্ত সমাচার' স্তম্ভের জন্যে দুরয়কে যা বাড়তি বেতন দেওয়া হতো সেটাও মূল বেতনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়ে দিল ওয়াল্টার। সংক্ষিপ্ত সমাচারের ভারটা আবার পূর্বতন সম্পাদক বইদনেয়ার্দের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হলো।

সরকারকে আক্রমন করা কিন্তু তখনই শেষ হল না দুরয়ের। সে তখন একের পর এক প্রবন্ধ লিখতে লাগলো ফ্রানচাইসের পৃষ্ঠায়। যে সব প্রবন্ধের ভাষা কখনও নরম, কখনও গরম আবার কখনও বা শ্লেষভরা। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, অন্যান্য পত্রিকাও দুরয়ের প্রবন্ধ থেকে মাল-মসলা সংগ্রহ করে একই বিষয়ে প্রবন্ধ ছাপতে লাগলো। এতে কিন্তু দুরয়ের প্রতিপত্তি আরও বেড়ে গেল।

এদিকে মন্ত্রীসভা তখন রীতিমতো বিব্রত হয়ে পড়েছে দুরয়ের লেখা প্রবন্ধের খোঁচায়। তাঁরা তখন ভাবছে যেমন করেই হোক দুরয়কে হাত করতেই হবে।

এই ব্যাপারে দুরয়ের নাম ফেটে পড়লো সারা শহরে। সঙ্গে সঙ্গে তার সম্মানও বেড়ে গেল। হোমরা-চোমড়ারাও তাকে রীতিমত সমীহ করতে লাগলো।

তার বাড়িতেও এখন হোমড়া-চোমড়াদের আনাগোনা চলছে। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো সিনেটর, ডেপুটি অথবা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি আসছে। এরা সবাই ম্যাডেলিনের সঙ্গে পরিচিত। ম্যাডেলিনকে তারা বিশেষ ভাবে খাতির করে। ম্যাডেলিনও তাদের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে। রাজনীতিতে তার জ্ঞান দেখে দুরয়ের মাঝে মাঝে মনে হয় যে, ও যদি ডিপ্লোম্যাট হতো তাহলে উন্নতি করতে পারতো।

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করে দুরয়। সে বাড়িতে এসে প্রায়ই ম্যাডেলিনকে দেখতে পায় না। প্রায়ই সে আসে অনেক রাত্রে। এসে এমন একটা ভাব দেখায় যে, রাজনীতির গোপন খবর সংগ্রহ করবার জন্যেই সে বেরিয়েছিল। একদিন সে বললে—আজকের খবর কি জানো? আইন মন্ত্রী তাঁর দুজন পেয়ারের লোককে ম্যাজিস্ট্রেট করেছেন। ওকে আচ্ছা করে ঠুকতে হবে।

ঠোকাও হলো তাকে। ফলে মন্ত্রী মশাইয়ের অবস্থাটা বেশ একটু

কাহিল হয়ে পড়লো। সিনেটররা এই ব্যাপারে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে একেবারে নাজেহাল করে তুললো তাকে।

সিনেটর লারোচ ম্যাথুই এ ব্যাপারে সবার চেয়ে বেশি সোচ্চার হলো। তার লোভ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর গদীর দিকে। তার ধারণা, হুরয় যদি তার পক্ষে কলম ধরে তাহলে অচিরেই সে মন্ত্রীমণ্ডলীতে স্থান পাবে।

লারোচ ম্যাথু ফ্রানচাইস পত্রিকার একজন ডিরেক্টর। অনেক টাকার শেয়ার কিনেছে সে ওই পত্রিকা-প্রতিষ্ঠানের। তাছাড়া মশিয়ে ওয়াল্টারের সঙ্গে তার গোপন কারবারও আছে। হুরয় তাই আশা করে যে, সে যদি ম্যাথুকে মন্ত্রীসভায় যাবার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে তাহলে ম্যাথুও তাকে সাহায্য করবে।

এদিকে হুরয়ের এক মুস্কিল বেধেছে অফিসে। অফিসে তার সহকর্মীরা বলাবলি করছে যে, তার লেখার স্টাইল নাকি অবিকল ফরেস্তিয়েরের স্টাইলের মতো। ইঙ্গিতটা হচ্ছে এই যে, হুরয়ের নামে যে সব লেখা বের হচ্ছে সেগুলো সবই তার স্ত্রীর লেখা। ফরেস্তিয়েরের যে সব লেখা বের হতো সেগুলো যে তার স্ত্রী-ই লিখে দিতো সে কথা কারোই অজানা ছিল না।

কথাটা কেমন করে যেন ওয়াল্টারের কানেও পৌছে গেল। ওয়াল্টার তখন বিভাগীয় সম্পাদকদের ডেকে বললে যে, হুরয়ের লেখা অনেকটা ফরেস্তিয়েরের মতো হলেও এসব লেখায় মাল-মসলা অনেক বেশি থাকে। তাছাড়া হুরয়ের প্রবন্ধগুলো আরও বেশি জোরালো।

সুতরাং এদিক দিয়ে হুরয়কে কেউ অপদস্ত করতে পারলো না। কিন্তু অফিসের উৎপাত থেকে রক্ষে পেলেও ফরেস্তিয়েরের হাত থেকে সে নিস্কৃতি পেলো না। বাড়িতে সে যা দেখে অথবা যাতে তার হাত পড়ে তাতেই সে যেন ফরেস্তিয়েরের ভূত দেখতে পায়। ক্রমে তার মানসিক অবস্থা এমন হয়ে উঠলো যে, ফরেস্তিয়েরের নাম শুনলেই সে ক্ষেপে যেতো।

ম্যাডেলিনও এটা লক্ষ্য করেছিল। প্রথম প্রথম সে বিস্মিত এবং বিরক্ত হতো। কিন্তু পরে সে বুঝতে পেরেছিল যে, এটা এক ধরণের ঈর্ষা। এটা বুঝতে পেরে সে মনে মনে বেশ একটু খুশিও হলো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই নামটা নিয়েই একটা কাণ্ড করে বসলো হুরয়।

সেদিন বিকেলে সে ম্যাডেলিনকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। গাড়ি করে বেরিয়েছিল ওরা। লেকের ধারের বনটা দেখে ম্যাডেলিন বললে—এ বনে

আমার একটুও ভয় করে না, কিন্তু তোমাদের ওখানে যে বনটা আছে সেখানে ঢুকে আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম।

হৃদয় বললে—ওখানেও ভয় করবার মতো কিছু নেই। ও বনে যেসব পশু আছে তাদের মধ্যে হিংস্র জানোয়ার আদৌ নেই। ওখানে শুধু খেঁকশিয়াল, কাঠবিড়াল, হরিণ আর শুয়ার দেখা যায়। আর আছে মাঝে মাঝে ফরেস্টারদের কুঠি।

'ফরেস্টার' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ফরেস্তিয়েরের নামটা মনে পড়ে যায় হৃদয়ের। সঙ্গে সঙ্গে তার মনের মধ্যে বিষক্রিয়া শুরু হয়। সে ভাবতে থাকে, আজ যে ম্যাডেলিনকে নিয়ে সে বেড়াতে এসেছে সে একদিন ফরেস্তিয়েরের অঙ্কশায়িনী ছিল। ফরেস্তিয়েরও ওকে নিয়ে বেড়াতে বের হতো তারই মতো।

হৃদয়কে চুপ করে থাকতে দেখে ম্যাডেলিন বললে—কি গো। ভাবছো কি এতো?

—ভাবছি তোমার আগের স্বামীর কথা। আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বলবে!

—কি?

—ওর কাছে তুমি কোনোদিন অবিশ্বাসিনী হয়েছিলে কি?

—তুমি দেখছি ওর কথা ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাবে। ও তো অতীত হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে সম্বন্ধও চুকে-বুকে গেছে। কী দরকার ওর কথা ভেবে মন খারাপ করবার?

—আমার কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছে, ওর কাছে তুমি অবিশ্বাসের কাজ করেছো। বলো না ডার্লিং। আমার কাছে বলতে লজ্জা কি? ওর যা চেহারা ছিল তাতে তোমার মতো মেয়ের খুশি হবার কথা নয়।

হৃদয়ের কথা শুনে ম্যাডেলিন তার দিকে তাকালো। তার মনে হলো, হৃদয় হয়তো তার চরিত্র সম্বন্ধে কারো কাছে কিছু শুনে থাকবে আগে।

ম্যাডেলিন চুপ করে আছে দেখে হৃদয় আবার বললে—বলো না লক্ষ্মীটি! তোমার মুখ থেকে এ কথা শুনলে আমি মনে একটু শান্তি পাবো।

ম্যাডেলিন তখন বিরক্ত হয়ে বললে—তোমার পাগলামী দেখছি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ রকম প্রশ্নের উত্তর কেউ দেয় না।

ম্যাডেলিনের কথা শুনে হৃদয়ের মনে যে বিষক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা আরও তীব্র হয়ে উঠলো। তার মনে হলো, ম্যাডেলিন প্রকারান্তরে স্বীকারই করেছে,

সে অবিশ্বাসিনী হয়েছিল। কথাটা মনে হতেই দুয়েরর মেজাজ বিগড়ে গেল। গাড়োয়ানকে গাড়ি ফেরাতে বললো সে।

ম্যাডেলিন যদি বলতো, সে অবিশ্বাসের কাজ করেনি তাহলে দুরয় হয়তো খুশি হয়ে তাকে বুকে টেনে নিতো, কিন্তু ম্যাডেলিনের জবাব শুনে তার মনের মধ্যে আগুণ জ্বলে ওঠলো। তার মনে হলো, ও হয়তো তার কাছেও অবিশ্বাসিনী হবে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল যে, ম্যাডেলিন এখন প্রায়ই গভীর রাত্রে ফেরে। কি করে সে অতো রাত পর্যন্ত? বহু লোকের সঙ্গে তার জানাশুনা। মন্ত্রী থেকে শুরু করে চুনোপুঁটি অবধি। তাদের মধ্যে সুপুরুষ এবং অর্থবান হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তিও আছে। তবে কি তাদেরই মধ্যে কাউকে—

সন্দেহ আর ঈর্ষার তীব্র দহন শুরু হলো দুরয়ের মনে। হঠাৎ তার মনে পড়লো ক্লতিলদের কথা। সেও তো বড় ঘরের বউ। কিন্তু কি করে বেড়াচ্ছে সে! এও হয়তো তারই মতো স্বামীর চোখে ধুলো দিয়ে অভিসার করে বেড়াচ্ছে। এই সব কথা চিন্তা করে দুরয় নিজের মনেই বলে উঠলো—দূর হোকগে ছাই! এ সব নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাবো না। দুনিয়ার সব মেয়েই খানকি—ওরা একজন পুরুষে খুশি হয় না। কিন্তু না—ওদের লাই দেওয়া ঠিক নয়। লাই দিলেই ওরা মাথায় চড়ে বসবে। ওদের পায়ের তলায় চেপে রাখা দরকার। হ্যাঁ, আমিও তাই করবো। এখন থেকে আমি শক্ত হবো।

হঠাৎ অন্য কথা মনে হলো দুরয়ের। সে ভাবলো—আমি একটা মহামূর্খ। কী হবে মেয়ে মানুষের কথা ভেবে? এর চেয়ে নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা ভাল। কি করে যশ আর অর্থ রোজগার করা যায় সেই কথাই ভাবতে হবে এখন থেকে।

গাড়িটা বেশ জোরে চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরে এসে পড়লো গাড়িটা। শহরে ঢুকতেই রাস্তায় অসংখ্য গাড়ির মিছিল চোখে পড়লো দুরয়ের। প্রত্যেক গাড়িতেই এক জোড়া করে নারী-পুরুষ। হয়তো স্বামী স্ত্রী কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকা। দুরয় চুপ করে আছে অনেকক্ষণ। প্রায় আধ ঘণ্টা হবে। ম্যাডেলিন তাই মিষ্টি সুরে বললে—কি ভাবছো ডার্লিং? প্রায় আধ ঘণ্টা তোমার মুখে কোনো কথা নেই।

দুরয় বললে—আমি ওই সব প্রেমিক প্রেমিকার গাড়ির মিছিল দেখছি আর ভাবছি, জীবনে এছাড়া কি আর কিছু করণীয় নেই?

ম্যাডেলিন বললে—আছে বৈকি। অনেক কাজ করবার আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রেমেরও প্রয়োজন আছে।

তুরয় এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে আগের মতোই চুপ করে রইলো। তার এই নীরবতায় ম্যাডেলিন মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠলো।

গাড়িটা ওদের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে। এই সময় ম্যাডেলিন বললে—বাড়িতে যাবার আগে কোনো কাফেতে গিয়ে আইসক্রীম খেয়ে নিলে হতো না ?

এতক্ষণে তুরয়ের বাক্যস্ফূর্তি হলো। সে বললে—তা মন্দ হয় না।

এই বলে গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাতে বললে সে। গাড়ী থামলে ম্যাডেলিনের হাত ধরে নামিয়ে বললে—এসো!

এগার

অফিসে তুরয়ের অবস্থাটা বেশ একটু কাহিল হয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে। তার সহকর্মীরা এখন তাকে সামনাসামনিই ফরেস্তিয়ের বলে অভিহিত করছে। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এমন এক বিশ্রী পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, তুরয়ের পক্ষে তা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়েছে। সে তাই একদিন বইসনেরার্দের সঙ্গে দেখা করে এ ব্যপারে তার সাহায্য চাইলো। সে বললে—এখানে আমার সহকর্মীরা আমাকে ফরেস্তিয়ের বলে তামাসা করে, এটা অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। আপনি ওদের বলে দেবেন যে, ওরা যদি ভবিষ্যতে আমাকে নিয়ে এই ভাবে ঠাট্টাতামাসা করে তাহলে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে।

তুরয়ের কথা শুনে বোইসনেরার্দে বললে—ওরা যাতে আর আপনার সঙ্গে হাসি-তামাসা না করে সে ব্যবস্থা আমি করবো। আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

তুরয় তখন খুশী মনে বেরিয়ে পড়লো অফিস থেকে। এরপর যখন সে ফিরে এলো তখন আর কেউ তাকে ফরেস্তিয়ের বলে সম্বোধন করলো না।

রাত্রে বাড়ীতে ফিরে ড্রয়িং রুমে মেয়েদের কথাবার্তার আওয়াজ পেয়ে তুরয় চাকরটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো—বাড়িতে কারা এসেছেন জানো ?

চাকরটা বললে—মাদাম ওয়াল্টার এবং মাদাম মোরেল এসেছেন।

তুরয় তখনই ড্রয়িংরুমে গিয়ে হাজির হলো। সেখানে যেতেই সে দেখতে

পলো যে, মাদাম ওয়াণ্টারের সঙ্গে তার মেয়ে দুটিও এসেছে। দুরয় তখন মাদাম ওয়াল্টারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে মাদাম মোরেলের দিকে এগিয়ে গেল। তাকে দেখেই মাদাম মোরেল তার হাতটা বাড়িয়ে দিল। দুরয় তার সঙ্গে করমর্দন করবার সময় একটু চাপ দিল, অর্থাৎ সে বুঝাতে চাইলো যে, এখনও সে মাদামকে ভালবাসে। মাদামও দুরয়ের হাতে চাপ দিয়ে তার প্রত্যুত্তর দিল।

দুরয় মুখে বললে—কতদিন পরে দেখা হলো, ভালো আছেন তো?

—হ্যাঁ, ভালই আছি। আপনি কেমন আছেন বেল-আমি?

দুরয় বললে—আছি একরকম।

এই সময় মাদাম ওয়াণ্টার বললে—শুনুন বেল-আমি, আগামী বৃহস্পতিবার মশিয়েঁ রিভ্যালকে তাঁর ফ্লাটে একটা বড়ো রকমের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। অনেকেই আসবেন। কিন্তু বিশেষ কোনো জরুরি কাজের জন্তে আমার স্বামী যেতে পারছেন না। তাই ভাবছি, কে আমাদের নিয়ে যাবে ওখানে।

মাদাম ওয়াণ্টারের কথার উত্তরে দুরয় বিনীতভাবে বললে—আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমিই আপনাদের নিয়ে যেতে পারি।

—তাহলে তো খুবই ভালো হয়।

দুরয় তখন মাদাম ওয়াণ্টারের মেয়ে দুটিকে লক্ষ্য করছে। বড়োটির চেহারা নিতান্তই সাধারণ, কিন্তু ছোটটির একেবারে মাথা খারাপ করে দেওয়ার মতো চেহারা।

মাদাম ওয়াণ্টার তখন বিদায় নেবার জন্ত দাঁড়িয়ে উঠে দুরয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—তাহলে এই কথাই রইলো। বৃহস্পতিবার বিকেল দুটোর সময় আপনি আমাদের বাড়িতে আসছেন!

দুরয় বললে—নিশ্চয় আসছি। আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

মাদাম ওয়াণ্টার আর দেরি না করে মেয়ে দুটিকে নিয়ে চলে গেল ওখান থেকে।

ওরা চলে গেলে মাদাম মোরেলও যাবার জন্তে উঠে দাঁড়ালো। দুরয়ের দিকে তাকিয়ে সে বললে—গুড নাইট বেল-আমি! সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাতখানা এগিয়ে দিল দুরয়ের দিকে। দুরয় করমর্দন করবার ছলে আর একবার চাপ দিল তার হাতে। মাদামও তার প্রত্যুত্তর দিল। দুরয় বুঝে নিল যে, আবার সে তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

মাদাম মোরেল চলে গেলে ম্যাডেলিন মৃদু হেসে বললে—তুমি দেখছি মাদাম ওয়াণ্টারকেও মজিয়েছো।

—কি যা-তা বলছো ?

—যা-তা নয়, ঠিকই বলছি। তোমার কথা বলতে ওঁর কি উৎসাহ! উনি আমাকে এমন কথাও বলেছেন যে, ওঁর মেয়ে দুটির জন্যে তোমার মতো বর খুঁজছেন।

এই বলে স্বামীর দিকে একটা বিলোল কটাক্ষ হেনে ম্যাডেলিন আবার বললে—তুমি বিবাহিত না হলে ওঁর ছোট মেয়ে সুজানের জন্যে চেষ্টা করতে পারতে।

ম্যাডেলিনের কথায় কান না দিয়ে দুরয় তখন ভাবছে মাদাম মোরেলের কথা। সে মনে মনে বলচে—চমৎকার মেয়ে এই ক্লতিলদে। প্রেমের ব্যাপারে ওর জুড়ী নেই। ও দেখছি এখনও আমাকে আগের মতোই ভালবাসে। কালই ওর কাছে যাবো আমি।

পরদিন লাঞ্চের পরেই দুরয় হাজির হলো মাদাম মোরেলের ফ্ল্যাটে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সে শুনতে পেলো, ড্রয়িং রুমে কে যেন আনাড়ীর মতো পিয়ানো বাজাচ্ছে। একটু পরেই খুলে গেল দরজাটা। মাদামের পরিচারিকা দুরয়কে দেখে হাসি মুখে বললে—আসুন মশিয়ে !

ঘরে ঢুকে দুরয় দেখলো যে, পিয়ানো বাজাচ্ছে লরিন। আজ কিন্তু সে আগের মতো তার কাছে এসে গলা জড়িয়ে ধরলো না। সে শুধু 'গুড মর্নিং' বলেই ভেতরে চলে গেল।

একটু পরেই মাদাম মোরেল এসে করমর্দন করলো দুরয়ের সঙ্গে।

দুরয় তার হাত দুটিতে চুমু দিয়ে বললে—তোমার কথা কত যে ভেবেছি, সে কথা আর কি বলবো!

মাদাম বললে—আমিও তোমার কথা ভেবেছি।

—তুমি রাগ করোনি তো আমার ওপর ?

—প্রথমে একটু রাগ হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু পরে তোমার যুক্তির কথাটা মনে করে আর রাগ নেই।

—আমি তোমার কাছে আসতে সাহস পাইনি এতদিন। কিন্তু লরিনের কি হয়েছে বলো তো ? ও আজ আমার সঙ্গে আগের মতো কথা বললে না।

—তুমি বিয়ে করায় ওর মনে বোধহয় ঈর্ষা হয়েছে। ও আর এখন তোমাকে বেল-আমি বলে না। তোমার কথা উঠলে বলে মশিয়েঁ দুরয়।

কথাটা শুনে তুরয় লজ্জিত হ'লো। তারপর মাদামের মুখের কাছে মুখ এনে বললে—একটা চুমু দেবে না ?

মাদাম খুশি মনে চুমু দিল তুরয়ের মুখে।

—আবার আমাদের দেখা হ'চ্ছে তো? নিম্ন কণ্ঠে কথাগুলো বললো' তুরয়।

—নিশ্চয়ই।

—কোথায় ?

—কেন, আমাদের সেই ফ্লাটে। ওটা আমি এখনও রেখে দিয়েছি যাই হোক, এবার অন্যান্য খবর বলো। তোমার নতুন জীবন কেমন চলছে?

—চলেছে এক রকম।

—এক রকম মানে ?

—মানে, আমি ওকে পেয়ে খুব খুশি হতে পারিনি। ও সর্ব সময় নিজেকে দূরে দূরে রাখে।

—ওটা ওর স্বভাব, কিন্তু স্ত্রী হিসেবে ও অতুলনীয়া।

—তা হয়তো হবে।

এই বলে গলার স্বরটাকে মুখ নিচু করে তুরয় আবার বললে—কাল আসছো তো ?

—হ্যাঁ, ছুটোর সময়।

মাদামের কথায় খুশি হয়ে তুরয় বললে—আজ তাহলে উঠি ডার্লিং। কাল আবার দেখা হচ্ছে।

এই কথা বলেই তুরয় বিদায় নিল মাদাম মোরেলের কাছে।

পরদিন আবার ক্লতিলদের সঙ্গে মিলন হলো তুরয়ের। দীর্ঘ দিন পরে উভয় উভয়কে পেয়ে মনের আনন্দে রতিক্রিয়া করলো।

এর পরের দিনই মাদাম ওয়াল্টারের বাড়িতে যাবার কথা তুরয়ের। সেখানে যাবার আগে সে স্ত্রীকে বললে—তুমিও যাচ্ছো তো রিভ্যালের সংবর্ধনা সভায় ?

ম্যাডেলিন বললে—না, আমার অন্য কাজ আছে।

ওয়াল্টার-ভবনে গিয়ে তুরয় দেখলো যে, মাদাম ওয়াল্টার জমকালো পোষাক পরে তার জন্তেই অপেক্ষা করছে। তার মেয়ে দুটিও তৈরী হয়েছে যাবার জন্তে।

রিভ্যালের বাড়ির দরজায় যখন ওদের ল্যাণ্ডো এসে থামলো তখন হুরয় দেখলো যে, ইতিমধ্যেই সেখানে অনেকগুলো গাড়ি এসে গেছে।

মশিয়ে রিভ্যাল নিচেই ছিল। মাদাম ওয়াল্টারকে দেখে সে এগিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা করলো। তারপর হুরয়ের দিকে তাকিয়ে হাসিভরা মুখে বললে—স্থ-সন্ধ্যা বেল-আমী।

হুরয় বললে—আপনিও শেষে বেল-আমী বলতে শুরু করলেন?

রিভ্যাল বললে—আপনার এই নামটা আমি মাদাম ওয়াল্টারের কাছেই শুনেছি।

একটু পরেই অনুষ্ঠান শুরু হলো। প্রথমেই শুরু হলো অসিযুদ্ধ। মশিয়ে রিভ্যালই ঘোষকের ভূমিকা গ্রহণ করলো। সে ঘোষণা করলো—এবার অসিযুদ্ধ শুরু হচ্ছে। এতে অংশ গ্রহণ করছেন মশিয়ে ক্রিভিতোকার এবং মশিয়ে প্লুমু।

খেলা শুরু হলো। দর্শকদের ভেতর থেকে মাঝে মাঝে তারিফও জানানো হতে লাগলো। কিন্তু মহিলারা কেউ খুশি হলো না। তারা দেখলো যে, যুদ্ধের চেয়ে পাঁয়তারা ভাঁজতেই বেশি সময় নিচ্ছে খেলোয়াড়রা।

ওদের খেলা শেষ হলেই মঞ্চে এলো মশিয়ে প্রানতু এবং মশিয়ে ক্যারাজিন। দুজনেই ওস্তাদ লোক। ওদের মধ্যে ক্যারাজিন হলো সামরিক এবং প্রানতু অসামরিক।

ক্যারাজিনের বপুখানা দৈত্যের মতো। তার কাছে প্রানতু যেন একটা শিশু।

এদের খেলাও তেমন জমলো না। তবে খেলার সময় প্রানতু যেভাবে বানরের মতো লাফাতে লাগলো তাতে দর্শকরা বেশ কিছুটা হাসির খোরাক পেলো।

ওদের খেলা শেষ হতেই মঞ্চে নামলো মশিয়ে পোরিয়ন এবং মশিয়ে ল্যাপালস্। ওরা এমন ভাবে লাফাতে লাগলো যে, বিচারকরাও বাধ্য হয়ে তাদের চেয়ারগুলো সরিয়ে নিয়ে বসলো। দর্শকদের ভেতর থেকে কে যেন চিৎকার করে বলে উঠলো—এবার তোমরা দয়া করে ক্ষ্যামা দাও।

ওদের পরে আসরে নামলো গৃহকর্তা রিভ্যাল এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নামলেন একজন বেলজিয়ান প্রফেসার। রিভ্যালের অসিচালনাটা দেখবার মতো। সবাই তারিফ করলো তাকে।

অসিযুদ্ধের খেলা এখানেই শেষ হলো।

এর পরেই শুরু হলো অনাথ ছেলেমেয়েদের জন্যে অর্থ সংগ্রহ। সবাই কিছু কিছু দান করতে লাগলো। এই সময় কাউন্ট ভাস্রেক হঠাৎ দুরয়কে দেখে তার কাছে এগিয়ে এসে বললেন—কেমন আছেন, মশিয়েঁ?

দুরয় তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে বললে—আপনি কেমন আছেন?

যে সব মহিলা অর্থ সংগ্রহ করছিল তারা সোনা রূপোয় তাদের থলি ভরতি করে নিয়ে চলে গেল।

এরপর ঘোষিত হলো এক নতুন খেলার কথা।

দুটি সুন্দরী তরুণী সেজে প্রবেশ করলো। তাদের পরনে শর্ট স্কার্ট। দেহের উপরার্ধে শুধু কাঁচুলি ছাড়া আর কিছু নেই। তারা এসেই শুরু করলো নাচ। সেই অর্ধোলঙ্গ নৃত্য দেখে দর্শকরা বেজায় খুশি। ঘন ঘন হাততালি পড়তে লাগলো তাদের নাচ দেখে।

নাচ শেষ হলেই আবার শুরু হলো তরোয়ালের খেলা! এ খেলা কিন্তু তেমন জমলো না। না জমবার কারণ হলো, ওপরে তখন পিয়ানোর বাজনার সঙ্গে নাচ শুরু হয়ে গেছে। যারা পরে এসেছে তারা প্রেক্ষাগৃহে ঢুকতে না পেরে নিজেদের আনন্দের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছে। নিচের মেয়েরাও তখন ওপরে গিয়ে নাচবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

এই সময় মঞ্চে দুজন খেলোয়াড় এসে এমনভাবে তরোয়ালের খেলা দেখাতে লাগলো যে, একটু আগে যারা চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, আবার তারা চুপ করে গেল। কিন্তু এ অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। অতিথিরা তৃষ্ণার্ত হয়ে পানীয়ের সন্ধানে উপরে উঠতে লাগলো। কিন্তু ওপরে গিয়ে তারা হতাশ হলো। তারা দেখতে পেলো যে, পানীয় এবং খাদ্য ইতিমধ্যেই হাওয়া হয়ে গেছে। ব্যাপার দেখে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা নানা রকম বিরূপ মন্তব্য করতে লাগলো উদ্যোক্তাদের প্রতি। কেউ বললে—খাবার দিতে পারবেন না তো এত লোককে নিমন্ত্রন করা হলো কেন? কেউ বললে—চাঁদার টাকাটা দেখছি একেবারেই জলে গেল।

জলে গেল আরও কয়েক হাজার ফ্রাঁ। অনাথ ছেলে-মেয়েদের জন্যে যে তিন হাজার ফ্রাঁ সংগৃহীত হয়েছিল তার সবটাই প্রায় উধাও হয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেল। শুনা গেল যে, মাত্র আড়াই 'শ' ফ্রাঁ তহবিলে জমা পড়েছে, বাকী টাকা সবই খরচ হয়ে গেছে খানা-পিনায়।

এমনি হট্টোগোলের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হলো। দুরয় তখন মাদাম

ওয়াল্টার আর তার মেয়ে দুটিকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে পুণরায় ল্যাণ্ডোতে উঠলো। গাড়ী চলতে শুরু করতেই সে লক্ষ্য করলে যে, মাদাম বার বার তার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। ব্যাপার দেখে সে নিজের মনেই বলে উঠলো' 'এই মহিলাও দেখছি মজলেন! ঠিক আছে, এর সাহায্যেই আমাকে এবার উপরে উঠতে হবে।'

মাদাম ওয়াল্টার আর তার মেয়ে দুটিকে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে দুরয় পদব্রজেই বাড়িতে ফিরলো। সে আসতেই ম্যাডেলিন বললে—বসো, ভাল খবর আছে!

—কি খবর?

—মরক্কোর ব্যাপারটা আবার মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছে! এই ব্যাপার নিয়ে এখনই আমাদের মসিযুদ্ধ শুরু করতে হবে মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে। আমরা যদি ঠিকভাবে এ যুদ্ধ চালাতে পারি তাহলে বর্তমান মন্ত্রীসভা অবশ্যই কুপো-কাত হবে এবং তা যদি হয় তাহলে পররাষ্ট্র দপ্তরটা নির্ঘাত এসে যাবে লারোচ ম্যাথুর হাতে।

এরপর আরও কিছু বাক্যবিনিময় হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। অবশেষে ম্যাডেলিন বললে—শোন ডার্লিং, আগামী মঙ্গলবার বাড়িতে একটা ডিনার পার্টি দেওয়া হবে বলে আমি স্থির করেছি।

—কাকে কাকে ডাকা হবে পার্টিতে?

—মশিয়ে ম্যাথু, মশিয়ে রিভ্যাল, ভাই-কাউন্টেস দে পর্শিমুং, কবি নবার্ত দে ভার্ণে, মাদাম ওয়াল্টার, মাদাম মোরেল, এবং মাদাম রিভোলিনকে নিমন্ত্রণ করবো বলে স্থির করেছি। মাদাম ওয়াল্টার এবং মাদাম মোরেলকে আগামীকালই নিমন্ত্রন করবো। ফেরার পথে মাদাম রিভোলিনকেও বলে আসবো।

পরদিন সকালে উঠেই দুরয়ের মনে হলো ম্যাডেলিন ওয়াল্টার-ভবনে যাবার আগেই সে একবার মাদাম ওয়াল্টারের সঙ্গে দেখা করবে। এই কথা মনে হতেই সে অফিসে যাবার মুখে ওয়াল্টার-ভবনে গিয়ে হাজির হলো। ড্রয়িং রুমে বসে মাদাম ওয়াল্টারকে খবর পাঠাতেই মাদাম হাসিমুখে এসে দুরয়ের সঙ্গে করমর্দন করে বললে—হঠাৎ এ সময়? কোনো জরুরী খবর আছে নাকি?

দুরয় বিনীতভাবে নিবেদন করলো—শুনুন মাদাম! গতকাল আপনার

কাছ থেকে বিদায় নেবার পর সারারাত শুধু আপনার কথাই আমার মনে হয়েছ। অবশেষে আর থাকতে না পেরে সোজা চলে এসেছি আপনার কাছে।

ডুরয়ের কথা শুনে মাদাম হতচকিত হয়ে বললে—এ সব কি বলছেন আপনি!

—ঠিকই বলছি মাদাম। আমি বুঝতে পারছি যে, এর জন্য হয়তো আমাকে চাকরি খোয়াতে হবে। তবুও আমি আপনার কাছে না এসে পারলাম না।

—ওসব কথা এখন থাক। অন্য কথা বলুন।

ডুরয় তখন মাদামের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরে বললে—আমি আপনাকে ভালবাসি। প্রথম যেদিন আপনাকে দেখেছি সেই দিন থেকেই আপনাকে আমি ভালবাসি। আমি জানি এটা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, তবুও আমি বলছি, আমি আপনাকে ভালবাসি।

এই পর্যন্ত বলে ডুরয় মাদামের মুখে চুমো দিতে চেষ্টা করলো। মাদাম তখন এক রকম জোর করে ডুরয়কে সরিয়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে হাঁফাতে শুরু করলো।

ডুরয় বুঝতে পারলো যে, কাজ হয়ে গেছে। মাদাম যদি তাকে পছন্দ না করতো তাহলে সে চাকর ডেকে তাকে অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দিতো।

ডুরয় তখন আর একটা চেয়ারে বসে দুই হাত দিয়ে মুখ চেপে এমন একটা ভাব দেখাতে লাগলো যেন, সে ভীষণ ভাবে কাঁদছে। কিছুক্ষণ এই রকম কাঁদার ভান করে অবশেষে সে চেয়ার থেকে উঠে 'গুড বাই' বলে দ্রুত পদ-ক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এরপর বাড়িতে এসে ম্যাডেলিনকে জিজ্ঞেস করলো—কি গো! তোমার ডিনার পার্টিতে সবাই আসবেন তো?

ম্যাডেলিন বললে—হ্যাঁ, একমাত্র মাদাম ওয়াণ্টার ছাড়া সবাই আসবেন বলে কথা দিয়েছেন। মাদাম ওয়াণ্টারের নাকি জরুরি কাজ আছে।

ম্যাডেলিনের কথা শুনে ডুরয় নিজের মনেই বললে—মাদামও আসবে। না এসে তার উপায় নেই।

ডুরয়ের অনুমানই সত্যি হলো। পরদিন মাদাম ওয়াণ্টার একখানা চিঠি দিয়ে ম্যাডেলিনকে জানিয়ে দিল যে, জরুরী কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সে আসছে।

সন্ধ্যার পর থেকেই নিমন্ত্রিতেরা আসতে শুরু করলো। প্রথমেই এলো মাদাম ওয়াল্টার! তার পরেই এলো মাদাম মোরেল। সে আজ হলদে আর কালো রঙে মেশানো একটি পোশাক পরে এসেছে। ভারী সুন্দর মানিয়েছে তাকে ওই পোশাকে।

মাদাম মোরেলের পরেই অন্যান্য মহিলারা এবং তাদের স্বামীরা এসে হাজির হলো। ভাবী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিনেটর লারোচ ম্যাথুও এলো।

ডিনারটা বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন হলো। খানার টেবিলে ডুরয় মরক্কো সম্বন্ধে বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর চালচলনকে আক্রমণ করে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিল। এর ফলে সবাই বুঝে নিলো যে, ফ্রানচাইসের পৃষ্ঠায় এবার মন্ত্রী-মণ্ডলীকে আক্রমণ করা শুরু হবে।

ডিনার শেষ হলে ডুরয় মাদাম ওয়াল্টারের সঙ্গে দেখা করে বললে—চলুন মাদাম, আমি আপনাকে বাড়িতে পৌছে দিই।

মাদাম বললে—না থাক, আমি একাই যেতে পারবো।

—আপনি দেখছি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। দেখছেন তো আমি কেমন শান্ত আছি এখন।

মাদাম আর আপত্তি করলো না। ডুরয়ের সঙ্গে নিচে নেমে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলো। কিন্তু গাড়ী চলবার সঙ্গে সঙ্গেই ডুরয় তাকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে, গালে, কপালে চুমোর পর চুমো দিতে শুরু করলো।

মাদাম বললে—একি ব্যবহার আপনার? এই না বললেন, আপনি শান্ত হয়েছেন!

ডুরয় বললে—শান্তই তো ছিলাম, কিন্তু আপনার পাশে বসবার সুযোগ পেয়েই আমার মনের মধ্যে আগুন জলে উঠলো। যাই হোক, আবার আমি শান্ত হচ্ছি। তবে আপনার কাছে আমার নিবেদন রাখছি যে, প্রতিদিন অন্ততঃ পাঁচ মিনিটও যেন আপনার পায়ের কাছে বসে বলতে পারি, আপনাকে আমি ভালবাসি। এ সুযোগটা আমাকে দিতেই হবে।

মাদাম ওয়াল্টারের সর্বশরীর তখন কাঁপছে। সে তখন মৃদুস্বরে বললে—না না, এটা কিছুতেই হতে পারে না। বাড়িতে মেয়েরা রয়েছে, তাছাড়া··· না না, এ অসম্ভব।

—বেশ, তাহলে অন্য কোথাও আসবেন। মোট কথা, আপনাকে না দেখে আমি থাকতে পারবো না। আপনার বাড়ির সামনে আমি ভিখারীর মতো

দাঁড়িয়ে থাকবো। তাতে যদি আপনি দেখা না দেন তাহলে আমাকে ওপরেই যেতে হবে।

দুরয়ের কথা শুনে মাদাম ভীত হলো। সে তখন উদ্বিগ্ন হয়ে বললে—না না, এমন কাজ করবেন না। আপনি তো জানেন বাড়িতে আমার মেয়েরা আছে।

—তাহলে অন্য কোথাও আসুন।

গাড়িটা তখন ওয়ান্টার-ভবনের গেটের মধ্যে ঢুকে গেছে। মাদাম বললে—ঠিক আছে। আগামী কাল বিকেল সাড়ে তিনটেয় ট্রিনিটি চার্চে আসুন।

গাড়ি থামলে মাদাম গাড়ি থেকে নেমে কোচম্যানকে বললে—মশিয়ে দুরয়কে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো।

দুরয় বাড়িতে ফিরে এসে দেখে যে, মাদাম মোরেল তার জন্যে অপেক্ষা করছে। দুরয়কে দেখে সে বললে—আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিন বেল-আমি।

দুরয় বিনীতভাবে বললে—আসুন।

গাড়িতে উঠেই মাদাম মোরেল দুরয়ের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে—তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না, কিছুতেই না।

দুরয় তাকে বাহুবন্ধনে বেঁধে বললে—আমিও না।

॥ বারো ॥

তিনটের আগেই দুরয় হাজির হয়েছে ট্রিনিটি চার্চে। মাদাম ওয়ান্টারের আসবার কথা সাড়ে তিনটেয়। অর্থাৎ এখনও আধ ঘণ্টা বাকি। চার্চের বাইরে প্রচণ্ড গরম। জুলাইয়ের প্রচণ্ড সূর্য যেন অগ্নিবৃষ্টি করছে। এই গরমে বাইরে থাকতে না পেরে দুরয় চার্চের ভেতরে ঢুকে পড়লো। ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা। দুরয় দেখতে পেলো যে, কয়েকজন বৃদ্ধা নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা করছে আর টাক-মাথা একটি লোক তাদের পেছনে পায়চারি করছে।

একটু পরেই মাদাম ওয়ান্টার এসে গেল। তাকে দেখেই দুরয় তার দিকে এগিয়ে গেল। তাকে দেখে মাদাম অনুচ্চ কণ্ঠে বললে—চলুন, ওই কোণে গিয়ে বসি আমরা। আপনি আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসবেন, তাহলে আমরা কারো নজরে পড়বো না।

হুরয় বশংবদ ভৃত্যের মতো মাদামের পেছনে পেছনে গিয়ে তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে বললে—আপনি এসেছেন দেখে আমি যে কত খুশি হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি নে। আমি আপনাকে যে কতখানি ভালবাসি সেই কথাটাই শুধু আপনাকে বলতে চাই।

মাদাম বললে—চুপ করুন। এ সব কথা শুনলেও পাপ হয়। আমি এখানে আসবো না মনে করেছিলাম, কিন্তু আপনাকে কথা দিয়েছি বলে আসতে বাধ্য হলাম। যাইহোক, আমি আপনাকে নিষেধ করছি, আপনার এ সব পাগলামির কথা আর আমার কাছে বলবেন না।

মাদামের কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল হুরয়। তার মনে হলো, 'তবে কি আমি ভুল করেছি?' কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো যে, ভুল সে করে নি। মাদাম মুখে যাই বলুক আসলে ওসব তার মনের কথা নয়।

এই কথা মনে হতেই হুরয় আবার বলতে শুরু করলো—আমি আপনাকে ভালবাসি এবং বাসবো। আমি এ কথা বারবার বলতে চাই। আজ আপনি হয়তো আমার কথায় কান দেবেন না, কিন্তু একদিন না একদিন আমার প্রার্থনা আপনাকে দ্রবীভূত করবেই। সেদিন আপনিও আমার মতো বলতে বাধ্য হবেন—'আমিও তোমায় ভালবাসি।'

হুরয় এমন আবেগের সঙ্গে কথাগুলো বলতে লাগলো যে, মাদামের দেহটা কেঁপে উঠলো। অনুচ্চকণ্ঠে সে বলে ফেললো—আমিও তোমাকে ভালবাসি। শোনো ডার্লিং; আমি তোমাকে অনেক দিন থেকেই ভালবেসে আসছি। যেদিন প্রথম তোমায় দেখি সেই দিন থেকেই। কিন্তু সমাজের কথা ভেবে, বিশেষ করে আমার মেয়ে তুটির কথা ভেবে আমার মনের কথা আমি মনেই চেপে রেখেছিলাম। কিন্তু আজ আর পারলাম না। আমি ভাবছি, এ আমি কি করলাম? এটা যে পাপ! এটা যে ঘোরতর অন্যায়!

হুরয়ের দিকে তাকিয়ে মাদাম আবার বললে—তুমি এখান থেকে একটু সরে যাও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

হুরয় তখনই চলে গেল সেখান থেকে।

মাদাম তখন তুই হাত মুখে চাপা দিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো। তারপর ভগবানের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলো—'আমাকে রক্ষা করো। দয়া করে আমাকে বাঁচাও।'

এই সময় একজন ধর্মযাজককে এগিয়ে আসতে দেখে মাদাম তার কাছে

ছুটে গিয়ে বললে—আমাকে বাঁচান ফাদার, পাপের পঙ্ক থেকে আমাকে উদ্ধার করুন।

ধর্মযাজকের মনে হলো যে, মহিলাটি হয়তো পাগল। তিনি তাই স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—কি হয়েছে আপনার?

মাদাম বললে—আমার মনে পাপ-চিন্তা এসেছে। আপনি আমার কনফেশন নিন।

—কনফেশন তো আজ নেওয়া হয় না। কনফেশন নেওয়া হয় প্রতি শনিবার. আপনি ওই দিন আসবেন।

—না, না, অতো দেরি হলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি পাপের পঙ্কে ডুবে যাবো। আপনি আজই আমার কনফেশন নিন।

মাদামের কথা শুনে ধর্মযাজক আর 'না' বলতে পারলে না। তিনি মাদামকে সঙ্গে করে কনফেশন রুমে নিয়ে গেলেন। মাদাম সেখানে বসে চোখের জল ফেলতে ফেলতে নিজের মনে যে পাপ ঢুকেছিল সে কথা অকপটে ব্যক্ত করলো। তারপর ধর্মযাজকের দিকে তাকিয়ে বললে—এবার আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।

ধর্মযাজক বললেন—আমি আশীর্বাদ করছি ভার্জিন মেরী আপনাকে রক্ষা করবেন।

এদিকে পাঁচ মিনিট পরে যথাস্থানে ফিরে এসে তুরয় দেখলো যে, মাদাম সেখানে নেই। তার তখন মনে হলো যে, মাদাম হয়তো তার সঙ্গে দেখা না করেই পালিয়ে গেছে। কথাটা মনে হতেই তার ভীষণ রাগ হলো। এই সময় হঠাৎ কনফেশন রুমের ভেতরে মাদামের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে সে বুঝতে পারলো যে, মাদাম ওখানে কনফেশন দিচ্ছে।

একটু পরেই মাদাম বেরিয়ে এলো কনফেশন রুম থেকে। বেরিয়েই তার লক্ষ্য পড়লো তুরয়ের দিকে। সে তখন তুরয়ের সামনে এগিয়ে এসে দৃঢ়স্বরে বললে—আপনি চলে যান। তাছাড়া ভবিষ্যতে একা কখনও আমার বাড়িতে আসবেন না। এলে আমার সঙ্গে দেখা হবে না।

এই কথা বলেই মাদাম ওয়াল্টার দৃঢ় পদক্ষেপে সরে গেল তুরয়ের কাছ থেকে।

এই সময় একজন ধর্মযাজক কনফেশন রুম থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে তুরয় বুঝতে পারলো যে, ইনিই মাদামের কনফেশন নিয়েছেন। সে তাই

কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে বললে—আপনি যে পোশাকটি পরে আছেন তাতেই আমার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেলেন. নইলে আপনার মাথাটা আমি গুঁড়ো করে দিতাম।

ধর্মযাজকের ওপর এইভাবে মনের আক্রোশ ঝেড়ে তুরয় বেরিয়ে গেল চার্চ থেকে।

চার্চ থেকে বেরিয়ে তুরয় সোজা চলে গেল ফ্রানচাইস অফিসে। সেখানে যেতেই একজন কেরানি তাকে সম্পাদকের কক্ষে যেতে বললে।

সম্পাদকের কক্ষে গিয়ে তুরয় দেখলো যে, মশিয়েঁ ওয়ান্টার বক্তৃতার ভঙ্গীতে রিপোর্টার আর বিভাগীয় সম্পাদকদের কাছে কি সব বলছে।

তুরয়কে দেখতে পেয়ে সে বললে—এই যে আমাদের বেল-আমি এসে গেছে! শুনুন বেল-আমি। বিশেষ সুসংবাদ আছে। মন্ত্রীসভায় পতন হয়েছে। নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের ভার পড়েছে ম্যাবোতের ওপর। এবং এ মন্ত্রীসভায় আমাদের ম্যাথু পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার পাচ্ছে।

একটু থেমে ওয়ান্টার আবার বললে—আমাদের পত্রিকা এখন থেকে সরকারের মুখপত্র হিসেবে গণ্য হতে যাচ্ছে। এবার আমাদের কাগজে মরোক্কো সম্বন্ধে একটা তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ বের করা দরকার। এ ভারটা আপনাকেই নিতে হবে।

তুরয় বললে—ঠিক আছে। শুধু মরোক্কো কেন ; আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, প্রভৃতি আমাদের যতোগুলো উপনিবেশ আছে তাদের সবগুলোকে কভার করে প্রবন্ধ লিখে দিচ্ছি। ওখানে যে সব জাতির এবং উপজাতির লোকেরা বাস করে তাদের কথাও থাকবে আমার প্রবন্ধে।

তুরয়ের কথা শুনে ওয়ান্টার খুশি হয়ে বললে—খাসা হবে এ প্রবন্ধ। আপনি আজই লিখে ফেলুন ওটা। হ্যাঁ, ভাল কথা! কি শিরোনাম দেবেন প্রবন্ধটার?

—তিউনিসিয়া থেকে তানজিয়ার।

—বাঃ! চমৎকার হবে। আপনি এখনই শুরু করে দিন।

—ঠিক আছে। ঘণ্টার মধ্যেই প্রবন্ধটা লিখে দিচ্ছি আমি।

এই কথা বলেই সে ওয়ান্টারের কাছে বিদেয় নিয়ে নিজের ঘরে এসে বসলো। তারপর পুরোনো ফাইল থেকে তার প্রথম প্রবন্ধটা বের করে নিয়ে সেটাকেই একটু কাট-ছাঁট করে এবং জায়গায় জায়গায় নতুন করে কিছু যোগ করে একটা খসড়া খাড়া করে ফেললো। এরপর সেই খসড়াটাকে আর একবার

রিভাইস করে নতুন করে লিখে ফেললো তার নতুন প্রবন্ধ—'তিউনিসিয়া থেকে তানজিয়ার'। বলা বাহুল্য, এই নতুন প্রবন্ধে নবগঠিত মন্ত্রীসভাকে কিছুটা তোয়াজও করা হলো।

দু ঘণ্টার মধ্যেই প্রবন্ধটা মশিয়ে ওয়ান্টারের হাতে দিতে সক্ষম হলো তুরয়। ওয়ান্টার আগ্রহের সঙ্গে প্রবন্ধটা পড়ে বলে উঠলেন—সাবাস বেল-আমি! আপনি ছাড়া এ লেখা আর কেউ লিখতে পারতো না।

অফিসের কাজ শেষ করে তুরয় বাড়িতে ফিরতেই ম্যাডেলিন হাসিমুখে তার কাছে এগিয়ে এসে বললে—আমাদের লারোচ এবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছে, শুনেছো?

—শুনেছি বৈ কি! আমি তো এই মাত্র আলজিরিয়ার ওপরে একটা প্রবন্ধ লিখে এলাম।

—তাই নাকি? কি লিখলে?

—কি লিখলাম শুনবে? সেই যে তোমার সাহায্যে 'আফ্রিকা প্রবাসীর স্মৃতিকথা' নামে প্রবন্ধটা লিখেছিলাম, সেই প্রবন্ধটাকেই কিছুটা অদল-বদল করে, নতুন করে লিখেছি।

ম্যাডেলিন খুশি হলো কথাটা শুনে। বললে—ওই সিরিজের আর একটা লেখায় যে হাত দিয়েছিলে সেটাকেও এবার চালিয়ে দিতে হবে।

—হ্যাঁ, আমিও সেই কথাই ভাবছি। এবার নতুন মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করতে হবে আমাদের।

আলোচনার পর খেতে বসলো দুজনে। খেতে খেতেও ওই বিষয়টা নিয়েই আলোচনা চলতে লাগলো।

এই সময় একটা টেলিগ্রাম এলো তুরয়ের নামে। তুরয় দেখলো যে, তার নিচে কারো নাম নেই। তবে নাম না থাকলেও ওটা যে মাদাম ওয়ান্টারের কাছ থেকে এসেছে তা বুঝতে দেরি হলো না তুরয়ের। মাদাম লিখেছে:

"সেদিন আমার মাথার ঠিক ছিল না। ক্ষমা চাইছি। আগামী কাল বিকেল চারটেয় পার্ক মনসিওনে এসো।"

টেলিগ্রামটা পড়ে খুশি হলো তুরয়। তার উৎফুল্ল ভাব দেখে ম্যাডেলিন জিজ্ঞেস করলো—কি ব্যাপার? হঠাৎ খুব খুশি যে!

তুরয় মিথ্যে কথা বললে—ক'দিন আগে এক অদ্ভুত স্বভাবের ধর্মযাজককে দেখেছিলাম। তার কথাটা মনে পড়ায় হাসি পেয়ে গেল।

পরদিন যথা সময়েই তুরয় এসে হাজির হলো মনশিওন পার্কে। ভীষণ ভীড় সেখানে। কোনো বেঞ্চেই জায়গা নেই। তুরয় এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলো। হঠাৎ তার নজর পড়লো মাদাম একটা ঝর্ণার ধারে দাঁড়িয়ে ওয়ান্টার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

তুরয় তার কাছে এগিয়ে এসে বললে—এখানে দেখছি বেজায় ভীড়। চলো অন্য কোথাও যাওয়া যাক।

—কোথায় যেতে চাও?

—একটা গাড়ি করে যে কোনো জায়গায় গেলেই চলবে। গাড়িতে উঠে তোমার দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিও, তাহলে কেউ দেখতে পাবে না তোমাকে।

—বেশ, তাই হোক। আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে।

—ভয় কি? আমি এখনই গাড়ি নিয়ে আসছি। তুমি গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াও।

একটু পরেই গাড়ি নিয়ে হাজির হলো তুরয়। সঙ্গে সঙ্গে মাদাম গাড়িতে উঠে বসে তার দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিল।

তুরয় কোচম্যানকে তার ফ্লাটের ঠিকানায় যেতে বলে দিয়েছিল। মাদাম উঠতেই সে রওনা হলো রুয়ে দে কনস্তান্তিনোপলের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটা তুরয়ের বাড়ির সামনে এসে থামলো। তুরয় এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে দরজাটা খুলে দিয়ে বললে—নেমে এসো

মাদাম বললে—এ আমরা কোথায় এলাম?

তুরয় বললে—আমার ফ্লাটে। বিয়ের আগে এখানেই আমি থাকতাম।

তুরয়ের সঙ্গে তার ফ্লাটে যেতে হবে শুনে মাদাম ভয় পেয়ে গেল। সে বললে—না না, আমি যাবো না। আমাকে তুমি ক্ষমা করো। এ আমি পারবো না।

তুরয় বললে—আমি শপথ করে বলছি, তোমার কোনো অমর্যাদা হবে না। শীগগির চলো। নইলে এখনই ভীড় জমে যাবে।

এই বলে মাদামের হাত ধরে এক রকম জোর করেই তুরয় তাকে নিজের ফ্লাটে নিয়ে গেল।

সেখানে ঢুকে মাদাম বললে—আমার বড্ড ভয় করছে।

তুরয় তাড়াতাড়ি ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললে—ভয় কি ডার্লিং। এখানে আমি আর তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।

এই কথা বলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়লো মাদামের ওপরে। হিংস্র পশু যেমন করে তার শিকারের ওপরে লাফিয়ে পড়ে সেও তেমনি করে লাফিয়ে পড়লো।

মাদাম এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে বললে—এটা কি হচ্ছে?

এই বলে সে প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করতে লাগলো হৃদয়ের কবল থেকে। কিন্তু কামোন্মত্ত সবল পুরুষের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হলো না তার পক্ষে। হৃদয় তাকে জোর করে খাটের ওপরে শুইয়ে ফেলে তার বুকের ওপরে চড়ে তার ঠোঁটে চুমু দিতে লাগলো।

হৃদয়ের চুম্বনে মাদাম খুশি হলো। তার মনেও কামভাব জেগে উঠলো। সে তখন দুহাত দিয়ে হৃদয়ের গলাটা জড়িয়ে ধরে তার মুখে একটা চুমু দিয়ে ফেললো। হৃদয় তখন মাদামের পোষাক খুলে ফেলতে লাগলো। দেখতে দেখতে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে ফেললো তাকে। মাদাম তখন তার বডিসটা হৃদয়ের হাত থেকে টেনে নিয়ে তা দিয়ে নিজের মুখটা ঢাকলো।

হৃদয় সেটাকে টান মেরে সরিয়ে দিয়ে পাগলের মতো তার ঠোঁট দুটি চুষতে লাগলো।

এর পরেই শুরু হলো রতিক্রিয়া।

মাদাম মৃদুস্বরে বললে—তুমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে আমি কোনো দিন এসব করিনি।

হৃদয় মনে মনে বললে 'করলেও আমার কিছু আসে যায় না।'

॥ তেরো ॥

শরৎকাল এসে পড়লো।

গত দুই তিনমাস হৃদয় নতুন মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করে একের পর এক প্রবন্ধ লিখেছে ফ্রানচাইসে। বলা বাহুল্য, ম্যাডেলিনও এ ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করেছে। সবগুলো প্রবন্ধই দু'জনে আলোচনা করে লিখেছে। এছাড়া সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রেও মন্ত্রীসভাকে সমর্থন জানানো হয়েছে।

ফ্রানচাইস পত্রিকার গুরুত্ব এখন অনেক বেড়ে গেছে। জনসাধারণ বুঝে নিয়েছে যে, ফ্রানচাইস এখন সরকারের মুখপত্র। ফ্রানচাইসের সম্পাদকীয় মন্তব্য এবং রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলির মূল্য এত বেড়ে গেছে যে, অন্যান্য পত্রিকাও এখন সেইসব মন্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দিতে শুরু করেছে।

দুরয়ের ফ্লাট এখন সব সময়ই জমজমাট। মন্ত্রীসভার সদস্যরা প্রায়ই ওখানে হাজির হচ্ছেন। তাঁরা আসেন ম্যাডেলিনের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে। দুরয়ের সব লেখাই যে, ম্যাডেলিনের পরামর্শ মতো চলে সে কথা তাঁরা জেনে ফেলেছেন। এই কারণেই তাঁরা আসেন। মন্ত্রীসভার সভাপতিও একবার দুরয়ের ফ্লাটে এসে ডিনার খেয়ে গেছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী লারোচ্ ম্যাথু তো একেবারে ঘরের লোক হয়ে গেছে দুরয় পরিবারের। সে যখন-তখন হাজির হচ্ছে ওখানে। এবং এসেই হুকুম ঝাড়ছে, এটা লেখো, ওটা লেখো বলে। তার এই মুরুব্বিয়ানা দুরয়ের অসহ্য হয়ে উঠেছে।

একদিন ম্যাথু বিদেয় নেবার পর দুরয় ম্যাডেলিনকে বললে—লোকটা কেন আমাদের বাড়িতে আসে বলো তো? আমরা কি ওর সেক্রেটারী নাকি যে, এসেই হুকুম জারী করে!

ম্যাডেলিন বললে—উনি আসায় আমাদের প্রেসটিজ কত বাড়ছে তা কি বোঝো না?

—রেখে দাও তোমার প্রেসটিজ। ওর মতো মন্ত্রী আমিও হতে পারি।

—বেশ তো, তাই হও না!

কয়েক দিন পরের কথা। সে দিন মন্ত্রীসভায় বৈঠক বসবে। দুরয়কে লারোচ ম্যাথু তার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে নিমন্ত্রন করেছে। সে যখন লাঞ্চে যাবার জন্যে পোষাক পরছে ম্যাডেলিন তখনও বিছানায় শুয়ে। দুরয় বললে—কি গো! এখনও শুয়ে রয়েছো যে! আমি বেরুচ্ছি।

ম্যাডেলিন শুয়ে শুয়েই বললে—জেনারেল বেলিনেলকে অফ্রিকায় পাঠানো হচ্ছে কিনা জেনে নিতে চেষ্টা করো।

দুরয় বললে—কি জানতে হবে না হবে তা আমি ভালোই জানি।

এই বলে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল কাউণ্ট ভাদ্রেকের কথা। সে তাই ম্যাডেলিনকে জিজ্ঞেস করলো—কাউণ্ট ভাদ্রেক অনেক দিন আসেন নি। কি হলো ওঁর?

ম্যাডেলিন বললে—কাউণ্ট অসুস্থ। তুমি একবার ওঁর কাছে যেও।

আচ্ছা, আজই যাবো।

এই কথা বলেই সে বেরিয়ে গেল।

লাঞ্চে বসে ম্যাথু বললে—শুনুন মশিয়েঁ! আপনাকে এবার

আফ্রিকায় আমাদের সামরিক অভিযানের কথাটা লিখতে হবে। বেশ একটু জোর দিয়েই লিখবেন। তবে লেখার মধ্যে এমন একটা সুর যেন থাকে যে, আপনি নিজে এই অভিযানের কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না।

ডুরয় বললে—ঠিক আছে। আগামী কালই লেখা হবে। হ্যাঁ ভাল কথা! আমার স্ত্রী বলছিলেন যে, জেনারেল বেলিনেলকে নাকি আফ্রিকায় পাঠানো হচ্ছে। কথাটা কি ঠিক?

—না, এটা ঠিক নয়।

এরপর আরও কিছু আলাপ আলোচনা চললো দু'জনের মধ্যে। লাঞ্চ খাওয়া শেষ হলে ডুরয় ম্যাথুর কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে সোজা তার অফিসে চলে গেল।

চারটের সময় মাদাম মোরেল তাদের ফ্লাটে আসবে, সুতরাং তার আগেই প্রবন্ধটা লিখে ওয়াল্টারের হাতে দিতে হবে।

অফিসে এসেই ডুরয় দেখলো যে, তার নামে একখানা চিঠি এসেছে। চিটিখানা বেনামে লেখা হলেও তার বুঝতে দেরী হলো না যে, ওটা লিখেছে মাদাম ওয়াল্টার। সে লিখেছে :

"আজ বেলা দুটোর সময় ফ্লাটে থেকো। আমি যাচ্ছি।
বিশেষ খবর আছে। খুব লাভজনক খবর। অবশ্যই থেকো।
ভার্জিনা।"

চিঠিখানা পড়ে ডুরয়ের মেজাজ বিগড়ে গেল। নিজের মনেই সে বললে, এই মাগীটা আমাকে জালিয়ে খেলো দেখছি! উৎপাতটা কিছুতেই ঘাড় থেকে নামছে না।

বেলা তখন একটা বেজে গিয়েছিল। সে তাই আর দেরী না করে বেরিয়ে পড়লো অফিস থেকে। মাদাম ওয়াল্টারকে চারটের আগেই বিদেয় করতে হবে। নইলে মহা কেলেঙ্কারী হবে। ক্লতিলদের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে গেলেই হয়েছে আর কি!

বেশ একটু বিরক্তির সঙ্গেই ডুরয় হাজির হলো তার ফ্লাটে। সেখানে গিয়ে দেখে, মাদাম তখনও আসেনি। সে তাই মনে মনে গজ গজ করতে করতে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

একটু পরেই মাদাম ওয়াল্টার হাজির হলো সেখানে। ডুরয়কে দেখে খুশি হয়ে বললে—আমার চিঠিখানা পেয়েছো তাহলে?

—হ্যাঁ পেয়েছি, কিন্তু আমাকে এখানে টেনে আনলে কেন? কি বলতে চাও তুমি?

মাদাম দুরয়কে চুমু দিতে গেল। দুরয় তাকে সরিয়ে দিয়ে বললে—ওসব এখন রাখো। কি বলতে চাও তাই বলো।

দুরয়ের কথা শুনে মাদামের চোখ দুটি জলে ভরে গেল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বললে—তুমি আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করছো কেন? আমাকে যদি তুমি ভাল না বাসো তাহলে আমার সঙ্গে প্রেমের খেলা করবার কি দরকার ছিল? চার্চে আমাকে কি বলেছিলে তা কি তোমার মনে নেই? তাছাড়া এখানেও তো তুমিই আমাকে এনেছিলে।

মাদামের কথায় বাধা দিয়ে দুরয় বললে—থামো। তুমি খুকিটি নও যে, আমি তোমাকে ফুঁসলে এনেছি। আমি তোমাকে চেয়েছিলাম ঠিকই। পুরুষরা এ রকম চেয়েই থাকে। কিন্তু তুমিও কি আমাকে চাও নি? যাইহোক, আমাদের দুজনের উদ্দেশ্যই সফল হয়েছে। এবার তুমি দয়া করে আমার ঘাড় থেকে নামো।

—একি নিষ্ঠুরের মতো কথা বলছো ডার্লিং! আমি কুমারী মেয়ে না হলেও আগে আর কাউকে ভালোবাসিনি। এবং আগে ধর্মভ্রষ্টও হইনি।

দুরয় দেখলো যে, ওর যদি এইভাবে প্যানপ্যানানি চলে তাহলে হয়তো চারটের আগে ওকে বিদেয় করা যাবে না। সে তাই একটু নরম হয়ে বললে—শুনুন মাদাম, আপনার স্বামী রয়েছেন। দুটি বড় বড় মেয়েও রয়েছে। এ অবস্থায় আমার কাছে যখন-তখন আসা ঠিক নয়। যদি কেউ কোনোদিন দেখে ফেলে তাহলে মহা কেলেঙ্কারী হবে। যাইহোক, এবার আপনার বক্তব্য বলুন। আমাকে এখনই মন্ত্রীসভার সাংবাদিক বৈঠকে যেতে হবে।

'তুমি 'থেকে আপনি'তে এসে গেল দুরয়।

দুরয়ের কথা শুনে মাদাম বললে—তাহলে শোনো! লারোচ ম্যাথু যে দিন পররাষ্ট্র দপ্তর হাতে নিয়েছে সেই দিনই তানজিয়ার অভিযান এক রকম ঠিক হয়ে গেছে। এরপর থেকেই ম্যাথু আর আমার স্বামী গোপনে গোপনে মরোক্কো-বণ্ড কিনছেন। মরোক্কো-বণ্ডের দাম এখন অনেক কমে গেছে। আমি তাই তোমাকে বলতে এসেছি যে, তুমি কিছু বণ্ড কিনে ফ্যালো।

দুরয় বললে—সবই তো বুঝলাম, কিন্তু বণ্ড কেনার মতো টাকা কোথায় আমার?

—টাকা আমি দেবো। আমার কাছে এখন বিশ হাজার ফ্রাঁ আছে।

এতে কমপক্ষে চল্লিশ হাজার ফ্রাঁর মরোক্কো-ও কেনা যাবে। আর এতে লাভ হবে প্রায় দু' লাখ ফ্রাঁ। লাভের টাকা আমরা দুজনে সমান ভাগে ভাগ করে নেবো।

লাভের কথা শুনে দুরয় সহজেই রাজী হলো এ প্রস্তাবে। কথা হলো যে, দু'একদিনের মধ্যেই মাদাম বিশ হাজার ফ্রাঁ এনে দেবে দুরয়ের হাতে।

এই ব্যবস্থা হবার পর মাদাম দুরয়কে একটা চুমু দিয়ে বললে—এবার আর আমাকে তুমি বিদেয় করতে চাইবে না তো?

—বিদেয় করবো কেন? তবে সব সময় তোমার এখানে না আসাই ভালো। তুমি বরং মাঝে মাঝে এসো। আজ আমাকে এখনই উঠতে হচ্ছে।

মাদাম বললে—আগামী কাল তুমি আমাদের বাড়িতে গেলে আমি খুব খুশি হবো।

দুরয় বললে—বেশ, তাই হবে। এবার আমি উঠি।

—আর একটু দাঁড়াও ডার্লিং। তোমাকে একটু আদর করে নিই।

এই বলে নিজের মাথাটা দুরয়ের বুকে ঘষতে লাগলো মাদাম। এই সময় হঠাৎ সে দেখতে পেলো যে, তার একগাছা চুল দুরয়ের ওয়েস্ট কোটের বোতামে আটকে গেছে। সে তখন চুলটাকে ভাল করে বোতামের সঙ্গে জড়িয়ে দিল। এরপর আরও কয়েকটা চুল দুরয়ের ওয়েস্ট কোটের বোতামে জড়িয়ে দিল সে।

দুরয় তখন ক্লতিলদের কথা ভাবছিলো, তাই এ ব্যাপারটা লক্ষ করে নি। হঠাৎ সে বলে উঠলো—এবার দয়া করে আমাকে ছাড়ো। এখনই আমাকে রওনা দিতে হবে।

—এখনই যাবে?

—হ্যাঁ, এখনই যেতে হবে। নইলে সময় মতো পৌছাতে পারবো না।

মাদাম তখন তার মুখখানা দুরয়ের মুখের সামনে এগিয়ে আনলো। দুরয় কোনোরকমে তার ঠোঁটে একটা চুমু দিয়েই বললে—এবার ওঠো।

মাদাম তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালো। তারপর দুরয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে— আগামী কাল সাতটায় আসছো তাহলে?

—হ্যাঁ, আসছি।

এই কথা বলেই দুরয় বেরিয়ে পড়লো ঘর থেকে। মাদাম ওয়াল্টারও বেরিয়ে পড়লো তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

মাদাম চলে গেলে দুরয় আবার ফিরে এলো ফ্লাটে। বেলা তখন প্রায় চারটে।

চারটের কয়েক মিনিট পরেই মাদাম মোরেল এসে হাজির হলো। দুরয় বললে—তোমার জন্যে কিছু মিঠাই এনেছি ডার্লিং। টেবিলের ওপরে রেখেছি। আগে ওটা খেয়ে নাও।

ক্লতিলদে খুসি হয়ে মিঠাই খেতে শুরু করলো। খেতে খেতে বললে—গত রাত্রে তোমাকে আমি স্বপ্নে দেখেছি। স্বপ্নটা ভারী অদ্ভুত। আমরা দু'জনে একটা উটের পিঠে চড়ে একটা মরুভূমির ভেতর দিয়ে চলেছি। কিছু দূর যাবার পর আমরা নেমে পড়লাম।

ক্লতিলদের কথা শুনে খুশি হলো দুরয়। সে তখন ওকে কিছু আর্থিক সুবিধে করে দেবার জন্যে বললে—শোনো ডার্লিং! তোমার স্বামীকে বলবে, তিনি যেন দু'হাজার ফ্রাঁর মরক্কো-বণ্ড কিনে ফেলেন। এতে দশ হাজার ফ্রাঁর মতো লাভ হবে। তাঁকে বলবে, এ খবরটা আমি বলেছি। তিনি যেন বিনা দ্বিধায় এই কাজটা করেন। তবে কথাটা যেন গোপন থাকে।

ক্লাতিলদে বললে—আমি আজই কথাটা আমার স্বামীকে বলবো। তাঁর কাছ থেকে এ কথা কেউ জানতে পারবে না।

ক্লতিলদের মিঠাই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে তখন খালি প্লেটটা হাত থেকে নামিয়ে দিয়ে বললে—এসো, এবার শুয়ে পড়া যাক।

এই কথা বলেই দুরয়ের ওয়েস্ট কোটের বোতাম খুলতে শুরু করলো সে। বোতাম খুলতে গিয়ে তাতে একটা লম্বা চুল জড়ানো দেখে সে ঠাট্টা করে বললে—তুমি দেখছি ম্যাডেলিনের চুল সঙ্গে নিয়ে বেড়াচ্ছো। খুব বংশবদ স্বামী দেখছি!

এরপর চুলগাছা খুলে পরীক্ষা করে বললে—না, এটা তো ম্যাডেলিনের চুল নয়। এটা যে কটা রঙের দেখছি!

দুরয় হেসে বলল—তাহলে হয়তো পরিচারিকার চুল হবে।

ইতিমধ্যে ক্লতিলদে আরও একটা চুল পেয়ে গেছে। তারপর আরও একটা। ব্যাপার দেখে ক্লতিলদের মুখটা বিবর্ণ হয়ে উঠলো। সে তখন দুরয়ের দিকে তাকিয়ে বললে—এ কি ব্যাপার! তোমার দেখছি আরও লাভার আছে!

—কি যা-তা বলছো!

—যা-তা আমি বলছি নে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি অন্য কোনো মেয়েকে

নিয়ে তুমি শুয়েছিলে এবং সে-ই তোমার বোতামে চুল জড়িয়ে দিয়েছে। এ সব ব্যাপার বুঝতে আমাদের দেরী হয় না।

এই সময় একগাছা চুল হাতে করে তুলে ক্লতিলদে বললে—এ যে দেখছি বুড়ীর মাথার পাকা চুল! শেষকালে বুড়ীকে নিয়ে পড়লে!

এই বলে হিস্টিরিয়া রুগীর মতো হি হি করে হেসে উঠলো ক্লতিলদে। তারপর বললে—তুমি তাহলে তোমার বুড়ীকে নিয়েই থাকো। আমি চললাম।

ক্লতিলদে চলে যাচ্ছে দেখে তুরয় মিনতির সুরে বললে—যেও না ক্লো, শোনো!

—কেন, তুমি তো বুড়ীকে পেয়েছো। এখন থেকে ওকে নিয়েই থেকো। ওর মাথার চুল দিয়ে আংটি বানিয়ে পরো।

এই কথা বলেই চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালো ক্লতিলদে। তুরয় তখন ছুটে গিয়ে তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বললে—আমার কথাটা একবার শোনো ডার্লিং।

ক্লতিলদে কোনো কথা না বলে ঠাস করে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। তারপর তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ঝড়ের মতো বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

ক্লতিলদে চলে গেলে তুরয় বোকার মতো খাটে গিয়ে বসলো। সে বুঝতে পারলো যে, ক্লতিলদের সঙ্গে তার চিরদিনের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তার তখন যত রাগ গিয়ে পড়লো মাদাম ওয়ান্টারের ওপরে। ও মাগী যদি এই কাণ্ডটি না করে যেতো তাহলে এই সর্বনাশটা হতো না। সে তাই মনে মনে বললে, 'দাঁড়া মাগী, এবার তোকে আমি দেখে নিচ্ছি!'

উত্তেজনায় তুরয়ের সারা দেহ কাঁপছিল। উত্তেজনা থামাতে সে চোখ মুখ ধুয়ে ফেললো। তারপর কি মনে করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রাস্তায় বেরিয়ে হঠাৎ তার মনে হলো কাউন্ট ভাদ্রেকের কথা। সে তখন ধীর পদক্ষেপে কাউন্টের বাড়ির দিকে রওনা হলো।

কাউন্টের বাড়িতে আসতেই তাঁর ভ্যালেটের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তুরয়ের। তুরয় তাকে জিজ্ঞেস করলো—কাউন্ট কেমন আছেন? শুনলাম তিনি নাকি খুবই অসুস্থ?

ভ্যালেট বললে—হ্যাঁ, ওঁর অবস্থা মোটেই ভালো নয়। হয়তো আজকের রাতটাও টিকবেন না।

কথাটা শুনে খুবই দুঃখিত হলো দুরয়। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো যে, এ সময় ম্যাডেলিনের একবার ওঁর কাছে যাওয়া দরকার।

এই কথা মনে হতেই দুরয় একখানা গাড়ি ভাড়া করে সোজা চলে এলো নিজের বাড়িতে। তারপর ম্যাডেলিনের ঘরে ঢুকে বললে—শোনো ডার্লিং! তুমি এখনই একবার কাউন্ট ভাদ্রেকের বাড়িতে যাও। তাঁর অবস্থা ভালো নয়।

দুরয়ের কথা শুনে ম্যাডেলিন চমকে উঠে বললে—কি বলছো তুমি!

—ঠিকই বলছি। আমি এইমাত্র কাউণ্টের বাড়ি থেকে আসছি। তাঁর ভ্যালেট বললে যে, কাউন্ট হয়তো আজকের রাতটাও টিকবেন না।

কথাটা শুনেই ম্যাডেলিন দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

একটু পরে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—আমি এখনই যাচ্ছি কাউণ্টের কাছে। কখন ফিরবো বলা কঠিন। তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করো না। আমার দেরি দেখলে নিজেই ডিনার খেয়ে নিও।

এই কথা বলেই ম্যাডেলিন তাড়াতাড়ি পোষাক বদলে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল।

দুরয় রাত আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো ম্যাডেলিনের জন্যে। কিন্তু সে না আসায় দুরয় নিজেই ডিনার খেয়ে নিলো। তারপর সে কাগজ কলম নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে বসলো। প্রবন্ধটা লেখা হলে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা ফ্রানচাইস.অফিসে গিয়ে প্রবন্ধটা ওয়াণ্টারের হাতে দিয়ে আবার ফিরে এলো বাড়িতে।

ম্যাডেলিন ফিরলো মাঝরাতে। দুরয় জেগেই ছিল। তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলো—কি খবর?

ম্যাডেলিন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে—কাউন্ট আর নেই।

—তোমাকে কিছু বলে গেছেন কি?

—না, আমি যখন গেলাম তার আগেই তিনি মারা গেছেন।

—ওঁর কোনো আত্মীয়-স্বজন ছিল কি মৃত্যু-সময়ে?

—হ্যাঁ, ওঁর ভাইপো ছিল।

—ভাইপোর সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা কি রকম ছিল?

—ভালো না। দশ বছর পরে এই প্রথম এসেছে সে।

—কাউন্ট কি খুব ধনী ছিলেন?

—তা ছিলেন বৈ কি! তবে সঠিক কত ফ্রাঁ ওঁর ছিল তা ঠিক বলতে

পারছিনে। তবে সঠিক বলতে না পারলেও ওর নগদ অর্থের পরিমান বিশ লাখ ফাঁর ওপরেই হবে বলে মনে হয়।

—যাকগে, ও নিয়ে চিন্তা করে আমাদের লাভ নেই। এসো, এবার শুয়ে পড়া যাক।

ম্যাডেলিন তখন ঘরের বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু শুয়ে পড়লেও কারোরই ঘুম হলো না, দুজনেই নানা কথা চিন্তা করছে তখন।

কিছুক্ষণ পরে দুরয় বললে—ঘুমুলে নাকি?

—না।

—লারোচ ম্যাথু আমাদের সঙ্গে শয়তানি করেছে, জানো?

—কি রকম?

দুরয় তখন ম্যাথু এবং ওয়াল্টারের মধ্যে যে গোপন পরামর্শ হয়েছে সে কথা খুলে বললো ম্যাডেলিনকে। মরোক্কো-বণ্ড কেনবার কথাও সে বললো তাকে।

সব শুনে ম্যাডেলিন বললে—আমিও এই রকমই সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু এ খবর তুমি কার কছে পেলে?

—সে কথা না-ই বা জিজ্ঞেস করলে! তোমার খবর সংগ্রহের ব্যাপারে তো আমি কোনো প্রশ্ন করিনে।

এরপর দুজনেই চুপ করে গেল। একটু পরে দুরয় হঠাৎ ম্যাডেলিনের গালে একটা চুমু দিল।

দুরয়ের উদ্দেশ্যের কথা বুঝতে পেরে ম্যাডেলিন বললে—এখন ওসব চলবে না। আমার মনটা ভাল নেই।

॥ চৌদ্দ ॥

কাউণ্ট ভাস্ত্রেকের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হলো। ডুরয় এবং তার স্ত্রী উভয়েই যোগদান করেছিল সে অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার পথে ডুরয় তার স্ত্রীকে বললে—আমার ধারণা ছিল, কাউণ্ট হয়তো আমাদের জন্যে কিছু রেখে গেছেন। কিন্তু সে রকম কিছু তো শুনতে পেলাম না।

স্বামীর কথার উত্তরে ম্যাডেলিন বললে—আমার ধারণা কাউণ্ট হয়তো একটা উইল করে তাঁর সলিসিটরের কাছে রেখে গেছেন।

—হয়তো তাই হবে।

এরপর দুজনেই চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরে ডুরয় আবার বললে—তোমার কাছেই শুনেছি যে, ভাইপোকে তিনি প্রীতির চোখে দেখতেন না। তাই মনে হয় তিনি হয়তো তাঁর উইলে আমাদের কিছু দিয়ে যেতেও পারেন।

বাড়িতে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির চাকর ম্যাডেলিনের হাতে একখানা চিঠি দিল। ম্যাডেলিন চিঠিখানা পড়ে ডুরয়ের হাতে দিয়ে বললে—ত্যাখো।

ডুরয় দেখলো যে, চিঠিখানা এসেছে কাউণ্ট ভাস্ত্রেকের সলিসিটর মশিয়েঁ ল্যামোনার কাছ থেকে। চিঠিখানা খুবই সংক্ষিপ্ত। তাতে লেখা :

মাদাম,

আপনার বৈষয়িক স্বার্থে এই পত্র লেখা হচ্ছে। আগামী মঙ্গল, বুধ অথবা বৃহস্পতিবার আপনি আমার অফিসে এলে বাধিত হবো। ইতি—

ভবদীয়

মইতর ল্যামোনার

চিঠিখানা পড়ে ডুরয় কিছুটা বিস্মিত হয়ে বললে—চিঠিখানা তোমাকে লেখা হয়েছে কেন তা বুঝতে পারছি না। যাই হোক, চলো, আজ বিকেলেই যাওয়া যাক ওখানে।

—বেশ, তাই চলো।

লাঞ্চের পরেই ওরা সলিসিটরের অফিসে হাজির হয়ে মশিয়েঁ ল্যামোনারের সঙ্গে দেখা করলো। ল্যামোনার ওদের দু'জনকে তাঁর নিজস্ব চেম্বারে বসিয়ে ম্যাডেলিনের দিকে তাকিয়ে বললে—কাউণ্ট দে ভাস্ত্রেক যে উইল করে গেছেন সেটা আপনাকে জানানো দরকার।

এই বলে তিনি তাঁর কেবিনেট থেকে কাউণ্টের উইলটা বের করে এনে পড়তে শুরু করলেন।

"আমি কাউণ্ট দে ভাত্রেক কারো দ্বারা কোনো রকম প্রভাবিত অথবা প্ররোচিত না হয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে এবং সুস্থ দেহে স্বেচ্ছায় এই উইল করে যাচ্ছি।

মৃত্যু কখন আসবে তা কেউ বলতে পারে না। আমারও মৃত্যু কখন আসবে তা আমার জানা নেই। সুতরাং সময় থাকতে আমার শেষ ইচ্ছা এই উইলে লিপিবদ্ধ করে মশিয়েঁ ল্যামোনারের হেফাজতে রেখে যাচ্ছি।

আমার কোনো উত্তরাধিকারী না থাকায় আমার ছয় লাখ ফ্রাঁ মূল্যের শেয়ার স্টক এবং পনেরো লাখ ফ্রাঁ মূল্যের অন্যান্য সম্পত্তি আমার আন্তরিক স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ মাদাম ক্লেয়ার ম্যাডেলিন দুরয়কে বিনা সর্তে দান করছি। মাদাম ম্যাডেলিন এ দান গ্রহণ করলে আমার আত্মা তৃপ্ত হবে।"

উইল পড়া শেষ হলে মশিয়েঁ ল্যামোনার বললে—এই উইল লেখা হয়েছে গত আগস্ট মাসে। দু বছর আগে আরও একটা উইল করেছিলেন কাউণ্ট। সে উইলও আমার কাছেই আছে। তাতেও একই কথা লেখা হয়েছিল। এতে বুঝতে পারা যায় যে, কাউণ্ট তাঁর মত পাল্টান নি।

মশিয়েঁ ল্যামোনারের কথা শুনে দুরয় তার গোঁফে হাত বুলাতে বুলাতে বললে—আপনার আর কিছু বক্তব্য আছে কি?

ল্যামোনার বললে—হ্যাঁ, আর একটা কথা বলবার আছে। কথাটা হলো, আপনার সম্মতি ব্যতীত মাদাম এ দান গ্রহণ করতে পারেন না। আইনে এই কথাই বলে।

দুরয় বললে—ঠিক আছে। আমি এ বিষয়ে আমার মতামত পরে আপনাকে জানাবো।

দুরয়ের কথা শুনে ল্যামোনার বললে—আপনার দ্বিধার কারণ আমি বুঝতে পারছি। প্রসঙ্গতঃ আরও একটা কথা আপনাকে বলে রাখছি। আপনারা আসবার আগে কাউণ্টের ভাইপো আমার কাছে এসেছিলেন। আমার কাছ থেকে উইলের মর্ম জেনে নিয়ে তিনি আমাকে বলে গেছেন যে, এক লাখ ফ্রাঁ তাঁকে দেওয়া হলে তিনি এ নিয়ে আর কোনো রকম উচ্চবাচ্য করবেন না।

দুরয় বললে—আদালতে গেলে কাউণ্টের ভাইপো এ উইলকে বাতিল করতে পারবেন কি ?

—না, তা তিনি পারবেন না। আইনের বিধান অনুসারে কাউণ্টের এ উইল কিছুতেই বাতিল হতে পারে না। কিন্তু ব্যাপারটা আদালতে উঠুক এটা হয়তো আপনারা চাইবেন না। আগামী শনিবার কাউণ্টের ভাইপো আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। আমি তাই আশা করি, শনিবারের আগেই আপনারা আপনাদের সিদ্ধান্ত আমাকে জানিয়ে দেবেন।

ম্যাডেলিন এ কথার কোনোই উত্তর দিল না। দুরয়কে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করে কাউণ্ট দে ভাদ্রেক তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি তাকে দিয়ে যাওয়ায় সে খুবই লজ্জিত হয়েছে।

তার দিকে তাকিয়ে দুরয় তার মনের কথা বুঝতে পারলো। সে তাই ল্যামোনারকে বললে—ঠিক আছে। শনিবারের আগেই আমাদের সিদ্ধান্ত আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

সলিসিটারের অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে এসে দুরয় সরাসরি আক্রমণ করলো ম্যাডেলিনকে। সে বললে—তুমি নিশ্চয় কাউণ্টের উপপত্নী ছিলে!

ম্যাডেলিন বললে—তোমার দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। চার্চ থেকে ফেরার পথে তুমিই তো বলেছিলে কাউণ্ট আমাদের কিছু দিয়ে যেতে পারেন।

—তা বলেছিলাম। তবে আমাদের দেওয়া, আর একা তোমাকে দেওয়ায় মধ্যে অনেক প্রভেদ। কেউ কোনো নিঃসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোককে তার যথা সর্বস্ব দান করে না, যদি না সেই স্ত্রীলোক তার উপপত্নী হয়।

দুরয়ের কথার উত্তরে ম্যাডেলিন বললে—তুমি একটা উজবুক। কাউণ্ট আমাকে তার নিজের মেয়ের মতো স্নেহ করতেন, তার বেশি কিছু নয়।

—তোমাকে তিনি মেয়ের মতো স্নেহ করবেন কেন ?

—কেন করতেন শুনবে!

—নিশ্চয়ই শুনবো। তুমি সব কথা আমাকে বলো।

—তাহলে শোনো। আমার মা কাউণ্টের এক আত্মীয়ার কম্পেনিয়ান ছিলেন। কাউণ্ট তাঁর বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। আমি তখন খুবই ছোট। তিনি আমাকে তখন থেকেই স্নেহ করতেন। এরপর আমার মায়ের মৃত্যু হলেও কাউণ্টের স্নেহ হতে আমি বঞ্চিত হইনি। ফরেস্তিয়েরের সঙ্গে আমার বিয়েও তিনিই দিয়েছিলেন এবং তাকে তিনিই ফ্রানচাইস পত্রিকায় চাকরি জুটিয়ে

দিয়েছিলেন। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে, ফয়েস্তিয়ের জীবিত থাকতেও তিনি আমার কাছে আসতেন এবং সপ্তাহে দু'দিন আমাদের বাড়িতে ডিনার খেতেন। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার পরেও তিনি নিয়মিত আমাদের বাড়িতে আসতেন। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো যে, প্রতি সোমবার তিনি আমার জন্যে ফুল আনতেন। সুতরাং তিনি যদি তাঁর সম্পত্তি তোমাকে না দিয়ে আমাকে দিয়ে যান তাতে তোমার গা-জ্বালা হবে কেন? তোমার এ গা-জ্বালার কারণ আমি বুঝি। কাউন্টের সম্পত্তির অংশ তুমি না পাওয়াতেই তোমার যত আপত্তি।

—তুমি যাই বলো, এ দান তুমি নিতে পারবে না। নিলে নানা জনে নানা কথা বলবে। অফিসেও এ নিয়ে কথা উঠবে, যার ফলে অফিসে আমার টেকা দায় হবে।

—বেশ তো, নেব না এ দান। এতে আমার বিশ একুশ লাখ ফ্রাঁ কম থাকবে, তার বেশি তো নয়। আমার নিজের যা আছে তাতেই আমি খুশি।

ম্যাডেলিনের কথা শুনে ডুরয় নিঃশব্দে পায়চারী করতে লাগলো। সে বুঝতে পারলো যে, এ দান প্রত্যাখ্যান করা মানে প্রায় একুশ লাখ ফ্রাঁ হস্তচ্যুত হওয়া। তার আরও মনে হলো যে, ম্যাডেলিন যদি তার প্রাপ্য অর্থের অর্ধেকটা তাকে দিতে রাজী হয় তাহলে মন্দ হয় না। এই কথা ভেবে সে বললে—কাউন্টের কোনো কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। কাণ্ডজ্ঞান থাকলে তিনি তাঁর অর্ধেক সম্পত্তি আমাকে দিয়ে যেতেন। এবং তাহলে কেউ কিছু বলতে পারতো না। কিন্তু তা না করে সব সম্পত্তি তোমাকে দিয়ে যাওয়ায় লোকে তোমায় কুৎসা গাইবে। এ থেকে রক্ষা পাবার উপায়ও একটি আমি ভেবেছি।

—কি ভেবেছো?

—ভেবেছি, সবাইকে আমি বলবো যে, কাউন্ট তাঁর সম্পত্তি আমাদের দু'জনকে সমান অংশে ভাগ করে দিয়ে গেছেন।

—তা কি করে হবে?

—তুমি যদি অর্ধেক সম্পত্তি আমাকে দান করো তাহলে অতি সহজেই এটা হবে।

—কিন্তু উইলে যে কাউন্টের নাম সই রয়েছে!

—তাতে কি হয়েছে? আমরা তো উইলটা দেখিয়ে বেড়াচ্ছি নে কাউকে।

ম্যাডেলিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুরয়ের দিকে তাকিয়ে বললে—ঠিক আছে, আমার এতে আপত্তি নেই।

—বেশ, তাহলে আমি আগামী কালই মশিয়েঁ ল্যামোনারের সঙ্গে দেখা করে বলে আসবো যে, তুমি স্বেচ্ছায় তোমার প্রাপ্য থেকে অর্ধেক আমাকে দান করছো। এতে আর কেউ কোনো রকম কুৎসা রটাবার সুযোগ পাবে না।

—বুঝেছি। তোমাকে আর ব্যাখ্যা করবার দরকার নেই।

পরদিন সকালেই দুরয় বেরিয়ে পড়লো সলিসিটারের অফিসের দিকে। যাবার সময় ম্যাডেলিনকে বললে—কাউন্টের ভাইপোকে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ দেবার কথা বলি, কেমন?

—না, তাকে এক লাখ ফ্রাঁ-ই দেওয়া হোক। ওটা আমার অংশ থেকেই দেবো।

দুরয় লজ্জিত হয়ে বললে—না না, তা কেন? আমরা দুজনেই পঞ্চাশ হাজার হিসেবে দেবো।

মশিয়েঁ ল্যামোনারের সঙ্গে দেখা করে দুরয় বললে—শুনুন মশিয়েঁ! আমার স্ত্রী তাঁর প্রাপ্য সম্পত্তির অর্ধেক আমাকে দান করতে চাইছেন। এতে লোকাপবাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, কি বলেন?

ধূর্ত সলিসিটর সবই বুঝতে পারলো। সে তাই মৃদু হেসে বললে—হ্যাঁ, এটা হতে পারে বটে। মাদাম যদি একটি নতুন দানপত্র করে তাঁর প্রাপ্য থেকে অর্ধাংশ আপনাকে দেন তাহলেই কাজ হবে। কিন্তু কাউন্টের ভাইপো সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি?

—হ্যাঁ, ওঁকে এক লাখ ফ্রাঁ ই দিতে রাজী আছি আমরা। আমাদের প্রত্যেকের অংশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ফ্রা ওঁকে দেওয়া হবে।

দুরয়ের কথা শুনে ল্যামোনার বললে—বেশ, আগামী কাল আপনারা তাহলে আমার অফিসে আসুন। ইতিমধ্যে আমি নতুন দলিলটা তৈরি করে রাখবো।

সলিসিটরের অফিস থেকে খুশি মনে রাস্তায় বেরিয়ে এলো দুরয়। মুফতে নয় লাখ ফ্রাঁ পেতে যাচ্ছে এতে সে দারুণ খুশি। ম্যাডেলিনের ওপরও আজ সে বেজায় রকম খুশি।

পরদিন ম্যাডেলিনকে সঙ্গে নিয়ে সলিসিটরের অফিসে এলো তুরয়। মশিয়েঁ ল্যামোনায় আগে থেকেই দলিলটা তৈরি করে রেখেছিলেন। সুতরাং সই-সাবুদ হতে আধ ঘণ্টাও লাগলো না। দলিল সই হবার পরেই দু'জনে বেরিয়ে পড়লো।

ফেরার পথে একটা জহুরীর দোকান পড়ে। কিছুদিন আগে সেই দোকানে একটা ঘড়ি পছন্দ করেছিল তুরয়। আজ হঠাৎ ঘড়িটা কিনতে ইচ্ছে হলো তার। ম্যাডেলিনকেও কিছু অলঙ্কার উপহার দিতে ইচ্ছে হলো। সে তাই ম্যাডেলিনের দিকে তাকিয়ে বললে—চলো, জহুরীর দোকান থেকে তোমার জন্যে একটা অলঙ্কার কেনা যাক। আমি আজ তোমাকে একটা উপহার দেবো।

দোকানে ঢুকে এক জোড়া জড়োয়া সেট করা ব্রেসলেট পছন্দ করলো ওরা। তুরয় জিজ্ঞেস করলো—এর দমে কত?

জহুরী বললে—তিন হাজার ফ্রাঁ।

—আড়াই হাজার হলে আমি নিতে পারি।

—না মশিয়েঁ, আড়াই হাজারে হবে না।

তুরয় তখন জহুরীকে বললে—সেদিন আমি যে ঘড়িটা পছন্দ করে গিয়েছিলাম সেটি বের করুন তো!

জহুরী ঘড়িটা বের করে দিতেই তুরয় বললে—শুনুন মশিয়ে, এই ঘড়িটা আর ব্রেসলেটজোড়া যদি চার হাজারে দেন তাহলে আমি এখনই নিতে পারি।

এবার জহুরী সহজেই রাজী হলো। সে বললে—ঠিক আছে, আপন কথায় আমি রাজী।

তুরয় তখন তার চেক বই বের করে জহুরীর নামে চার হাজার ফ্রাঁর একখানা চেক কেটে তার হাতে দিয়ে বললে—শুনুন মশিয়েঁ, আমার এই ঘড়ির ডালায় একটা ব্যারনের মুকুট এবং তার নিচে জি. ডি. অক্ষর দুটো খোদাই করে দিতে হবে।

জহুরী বললে— ঠিক আছে। বৃহস্পতিবার এটা আপনি পেয়ে যাবেন।

তুরয় তখন ব্রেসলেটজোড়া নিয়ে ম্যাডেলিনের হাতে পরিয়ে দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এলো। ব্রেসলেট উপহার পেয়ে ম্যাডেলিন খুবই খুশি হলো।

রাস্তায় এসে তুরয় বললে—চলো, আজ থিয়েটার দেখে আসা যাক।

ম্যাডেলিন খুশি হয়ে বললে—বেশ চলো।

বক্সে বসে থিয়েটার দেখলো দু'জনে। থিয়েটার ভাঙলে দুরয় বললে—চলো, একবার মাদাম মোরেলের ওখান থেকে ঘুরে আসি। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে কোনো একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ডিনার খাবো আজ।

মাদামের বাড়িতে গিয়ে ওরা দেখলো যে, তার স্বামী বাড়িতে এসেছে সেই দিনই। ওরা তখন মাদাম এবং মশিয়েঁ মোরেলকে সঙ্গে নিয়ে ডিনার খেতে বের হলো।

সেদিনের সেই কাণ্ডের পর ক্লতিলদের সঙ্গে কথা বলতে ভয় হচ্ছিল দুরয়ের। কিন্তু ম্যাডেলিন এবং মশিয়েঁ মোরেল সঙ্গে থাকায় ক্লতিলদে ও নিয়ে আর কিছু বলতে পারলো না। ডিনারটা সেদিন বেশ ভালই হলো।

ডিনার শেষ হলে মাদাম এবং মশিয়েঁ মোরেলের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে খুশি মনে বাড়িতে ফিরে এলো দুরয় আর ম্যাডেলিন।

পনেরো

মাস দুই পরের কথা।

এই দু'মাসে অনেক ব্যাপার ঘটে গেছে। মরোক্কোতে অভিযান হবে না বলে সরকারী ঘোষণা জারি হয়েছে। ফলে শেয়ার মার্কেটে মরোক্কো-বণ্ডের দাম অনেক বেড়ে গেছে।

মাদাম ওয়াল্টারের কথাই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী লারোচ ম্যাথু আর ফ্রানচাইস পত্রিকার মালিক মশিয়েঁ ওয়াল্টার বহু কোটি ফ্রা পিটে নিয়েছে মরক্কো-বণ্ডের দৌলতে। ওয়াল্টারই লাভ করেছে বেশি। সে এখন পাঁচ কোটি লুইয়ের মালিক। অর্থাৎ সে আজ ফ্রান্সের কোটিপতিদের মধ্যে একজন।

কিন্তু কোটিপতি হয়েও অভিজাত সমাজে সে পাত্তা পাচ্ছে না। প্যারীর অভিজাত সমাজে স্থান লাভ করতে হলে শুধু অর্থ থাকলেই চলে না, অর্থ ব্যয় করতেও জানা চাই। তাছাড়া যেমন-তেমন বাড়িতে থাকলেও চলে না। সত্যিকারের অভিজাত ব্যক্তিরা বাস করে প্রাসাদোপম অট্টালিকায়। ওয়াল্টার তাই চেষ্টায় ছিল ভালো একটা প্রাসাদ কেনার জন্যে। সুযোগও জুটে গেল কয়েক দিনের মধ্যেই। প্রিন্স দে ক্রিসবার্গ দুরবস্থায় পড়েছেন শুনে ওয়াল্টারের মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। 'প্রিন্সের প্রাসাদটা

ভারী চমৎকার। ওয়াল্টারের মনে হলো যে, মোটা টাকা কবুল করলে প্রিন্স হয়তো তাঁর প্রাসাদটা বিক্রি করতেও পারেন। এই কথা মনে হতেই সে প্রিন্সের সঙ্গে দেখা করে তাঁর প্রাসাদটা কেনার প্রস্তাব করলো। সে প্রিন্সকে বললে যে, তিনি যদি প্রাসাদটা বিক্রি করতে চান তাহলে সে ত্রিশ লাখ ফ্রাঁ দাম দিতে রাজী আছে। আশাতীত মূল্য পেয়ে প্রিন্স তাঁর প্রাসাদটা বিক্রি করতে রাজী হয়ে গেলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই লেখাপড়া হয়ে গেল প্রিন্স তখন বাড়িটা খালি করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াল্টার সপরিবারে উঠে এলো তার নবলব্ধ প্রাসাদে।

প্রিন্স ক্রিসবার্গের প্রাসাদটা ছিল প্যারীর শ্রেষ্ঠ প্রাসাদগুলোর অন্যতম। সুতরাং ওই প্রাসাদের মালিক হবার সঙ্গে সঙ্গেই মশিয়ে ওয়াল্টার প্যারীর আভিজাত সমাজে স্থান লাভ করলো।

এরপর আরও একটা খেয়াল চাপলো ওয়াল্টারের মাথায়। প্যারীতে তখন হাঙ্গেরীর বিখ্যাত চিত্রশিল্পী কার্ল মার্কোভিচের চিত্রগুলির একটা প্রদর্শনী হচ্ছিলো। প্রদর্শনীতে যীশুখ্রীষ্টের একখানা ছবি খুব নাম করেছে। সবাই বলছে ওই ছবিখানা নাকি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ছবি। আর্ট ক্রিটিক এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকাও সেই কথাই বলছে। ওয়াল্টার সেই ছবিখানা পাঁচ লাখ ফ্রাঁ দিয়ে কিনে ফেললো।

ওই ছবিখানা কিনবার সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াল্টারের নাম প্যারীর অভিজাত মহলে আলোচনা হতে লাগলো। প্যারীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র-সমজদার বলেও ওয়াল্টারের নাম ছড়িয়ে পড়লো জনসাধারণের মধ্যে।

ওয়াল্টার তখন আর একটা চাল চাললো। কানচাইসে এক বিরাট বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে প্যারীর নরনারীদের সে আমন্ত্রণ জানালো নিজের প্রাসাদে। বিজ্ঞপ্তিতে সে লিখলো :

শতাব্দীর সেরা ছবি 'সমুদ্রের ওপর বিচরণশীল মহাত্মা যাশুখ্রীষ্টের চিত্র' যারা দেখতে চান তাঁদের জন্যে ক্রিসবার্গ প্রাসাদের দ্বার বিকেল তিনটে থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত উন্মুক্ত রাখা হবে।

ওই বিজ্ঞপ্তি ছাড়া কিছু নিমন্ত্রণ পত্রেও বিলি করা হলো বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে। নিমন্ত্রণ-পত্রে লেখা হলো :

কার্ল মার্কোভিচের আঁকা সুবিখ্যাত চিত্র সমুদ্রের ওপর বিচরণশীল মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের চিত্রটি দেখবার জন্যে মাদাম এবং মশিয়ে ওয়াল্টার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবার ফলে দলে দলে নরনারী ওয়ান্টার-প্রাসাদে আসতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় সৃষ্টি হলো যে, জনতার ভিড় নিয়ন্ত্রন করবার জন্যে পুলিশের সাহায্য নিতে বাধ্য হলো ওয়ান্টার। কিন্তু তাতেও সুবিধে না হওয়ায় ওয়ান্টার আর একটা বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে এই সুযোগ প্রত্যাহার করে নিলো। বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হলো, ফটকে প্রবেশ-পত্র না দেখালে কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। প্রবেশ-পত্র কোথায় পাওয়া যাবে সে কথাও জানিয়ে দেওয়া হলো বিজ্ঞপ্তিতে।

এই ব্যবস্থার ফলে জনতার ভিড় আর থাকলো না। ওয়ান্টার তখন খুশি মনে নিমন্ত্রিত অতিথিদের আদর-আপ্যায়ণে মেতে উঠলো। দামী মদের ফোয়ারা ছুটলো তার বাড়িতে। শুধু তাই নয়, অভ্যাগত নরনারীর জন্যে নাচের ব্যবস্থাও করা হলো প্রাসাদের বলরুমে।

এই ঢালাও ব্যবস্থার ফলে ওয়ান্টার অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠলো প্যারীর অভিজাত মহলে।

এদিকে লারোচ ম্যাথুর চাল-চলনও তখন বেশ কিছুটা বদলে গেছে। এখনও সে দুরয়ের বাড়িতে নিয়মিত ভাবেই আসছে; তবে তার কথার ঝাঁঝ এখন আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। আগে সে দুরয়কে খুশি রাখতে চাইতো। এখন সে কথায় কথায় হুকুম চালাচ্ছে।

লারোচ ম্যাথুর এই রকম লম্বা-চওড়া বচন শুনে দুরয়ের মনে হয় যে, ওর কানটা ধরে দুই গালে দুই চড় কসিয়ে দেয়। কিন্তু ওর পদ-মর্যাদার কথা ভেবে এই শুভ ইচ্ছেটাকে কাজে পরিণত করতে পারে না সে। এর ফলে সে ঝাল ঝাড়তে থাকে ম্যাডেলিনের ওপরে। এ যেন প্রবাদের সেই 'সদরে না পেয়ে ঠাঁই ঘরে এসে মাগ কিলাই'-অবস্থা।

ম্যাডেলিনও ছেড়ে কথা বলে না। দুরয় যখনই তাকে বচন শুনাতে আসে তখনই সে তাকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দেয়।

একদিন এই রকম কথা কাটাকাটির সময় ম্যাডেলিন বলে উঠলো—রোজ রোজ তুমি আমাকে ম্যাথুর সম্বন্ধে লম্বা-চওড়া কথা শুনাতে আসো কেন বলোতো! নিজের অবস্থার কথাটা একবার ভেবে দেখো। কোথায় ছিলে আর কোথায় তুমি উঠেছো! প্রথম যেদিন এ বাড়িতে ডিনারে এসেছিলে সেদিন ডিনার স্যুটও ছিল না তোমার। ভাড়া করা পোষাক পরে এসেছিলে

হয়েছিল তোমাকে। সে সব কথা কি এর মধ্যেই ভুলে গেলে ? আমার কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

মুখের ওপরে এই রকম জবাব পেয়ে চুপ করে যায় দুরয়। কিন্তু চুপ করে গেলেও ম্যাথুর প্রতি তার বিরাগ বেড়েই চলে। আরও একটা ব্যাপারে তার মনের মধ্যে আগুণ জলতে থাকে। এটা হলো মশিয়ে ওয়াল্টারের হঠাৎ ধনী হয়ে যাওয়া। দুরয়ের কেবলই মনে হতে থাকে যে, তাকে ঠকিয়েই ওয়াল্টার আজ কোটিপতি হয়েছে। ওয়াল্টার-প্রাসাদে সে যাওয়াও বন্ধ করেছে এই কারণে।

মাদাম ওয়াল্টার তাকে বারবার ডিনারে নিমন্ত্রন করেছে। কিন্তু প্রতি-বারেই সে একটা না একটা বাহানা করে নিমন্ত্রন প্রত্যাখ্যান করেছে।

ম্যাডেলিনও এটা লক্ষ্য করেছিল। সে তাই একদিন কথায় কথায় দুরয়কে বললে—ওয়াল্টারের বাড়িতে তোমার না যাওয়াটা কিন্তু অন্যায় হচ্ছে। হাজার হলেও সে তোমার মনিব, এ কথাটা ভুলে যাচ্চো কেন ?

এর উত্তরে দুরয় বললে—অন্যায় না হাতী হচ্ছে ! আমার ইচ্ছে, আমি যাবো না।

কিন্তু পরদিনই সে কেন যেন তার মতটা পালটে ফেললো। ম্যাডেলিনকে সে বললে—চলো, একবার ঘুরেই আসা যাক ওয়াল্টারের বাড়ি থেকে। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।

দুরয়ের কথা শুনে ম্যাডেলিন হেসে বললে—অবশেষে সুবুদ্ধি হয়েছে দেখছি। এই সুবুদ্ধিটা কিছুদিন আগে হলেই শোভন হতো।

দুরয়ের এই সুবুদ্ধিটা কিন্তু হঠাৎ হয়নি। সেদিন মাদাম ওয়াল্টারের কাছ থেকে একখানা গোপন পত্র পেয়েই সে তার মত পরিবর্তন করেছে। চিঠিতে মাদাম লিখেছিল যে, মরোক্কো-বণ্ডের দরুণ দুরয়ের প্রাপ্য নব্বই হাজার লুই সে আলাদা করে রেখেছে। সে যেন তার সঙ্গে দেখা করে ওটা নিয়ে যায়।

নব্বই হাজার লুই ছেড়ে দেবার মতো বোকামী করতে রাজী নয় দুরয়। সে তাই সস্ত্রীক গিয়ে হাজীর হলো ওয়াল্টার-ভবনে।

ওদের দেখেই মাদাম ওয়াল্টার এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলো। দুরয়কে দেখে খুসিতে উজ্জল হয়ে উঠলো তার চোখ-দুটি। দুরয় কিন্তু মাদামের সেই চোখের ভাব বুঝেও বুঝতে চাইলো না। ম্যাডেলিনকে মাদামের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে সরে পড়লো সে। কিন্তু ভিড়ের ভেতরে গিয়েও সে

আত্মগোপন করতে পারলো না। হঠাৎ সুজান এসে তার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। যেতে যেতে সে বললো—আপনি লুকোবার চেষ্টা করছেন কেন বেল-আমি ?

—লুকোবার চেষ্টা করবো কেন ?

—তা নয়তো কি ! এসে আমাদের সঙ্গে দেখা না করেই ভিড়ের ভেতরে ঢুকে পড়ছিলেন। এ বাড়িতে সবাই আপনাকে ভালবাসে। অথচ আপনি দেখছি আমাদের এখানে আসাই বন্ধ করে দিয়েছেন। যাই হোক, আজ যখন আপনাকে পেয়েছি তখন সহজে ছাড়ছি নে !

দুরয়ের ভাল লাগে সুজানের এই অন্তরঙ্গ কথাবার্তা। সুজানের দিকে তাকিয়ে তার মনটা খুশি হয়ে ওঠে। প্রথম যৌবনের স্পর্শে কানায় কানায় ভরে উঠেছে সুজানের সুন্দর দেহলতা। কিশোরীর সরলতার সঙ্গে মিশেছে যৌবনের নম্রতা। ওকে দেখে যেন আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে হয় না।

সুজানের হাত ধরে ছবি-ঘরের দিকে চলেছিল দুরয়। হঠাৎ পাশ থেকে কে যেন বলে উঠলো—ভারী সুন্দর মানিয়েছে ওদের দুটিকে।

কথাটা কানে যেতেই ভাবান্তর হলো দুরয়ের মনে। তার মনে হলো, এই সুজান তো আমারও হতে পারতো। চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই বিয়ে করতে পারতাম ওকে।

সঙ্গে সঙ্গে ম্যাডেলিনের কথাটা মনে হয় তার। মনে হয়, ম্যাডেলিনকে বিয়ে করে ভীষণ ভুল করেছে সে। ম্যাডেলিন হলো গাছতলায় ঝরে-পড়া বাসি ফুল, আর সুজান হলো ফুটনোন্মুখ-গোলাপ।

সুজান কথা বলতে বলতে চলেছে। যেন কথার খই ফুটছে তার মুখে। দুরয়ের কিন্তু মোটেই লক্ষ্য নেই সেদিকে! সে কেবলই ভাবছে নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা। ম্যাডেলিনকে ডাইভোর্স করার কথাও মনে হচ্ছে তার।

দুরয় কথা বলছে না দেখে সুজান বললে—কি হলো আপনার ? কথা বলছেন না কেন ? আপনাকে না দেখলে আমার ভালো লাগে না।

কথাগুলো কানে যেতেই দুরয় ফিরে তাকালো সুজানের দিকে। তার-উদ্ভিন্ন যৌবনা সুন্দর দেহটি দেখে দুরয়ের মনটা আনচান করে উঠলো। হঠাৎ নিজের ওপরে রাগ হলো তার। মনে হলো, ম্যাডেলিনকে বিয়ে করে বিরাট ভুল করে ফেলিছে সে।

সুজান ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—কি ব্যাপার ! আপনি হঠাৎ নির্বাক হয়ে গেলেন কেন ?

দুরয় বললে—কই না তো!

—তা হলে অতো ভাবছেন কি?

—কি ভাবছি শুনবে?

—নিশ্চয়ই শুনবো।

—ভাবছি তোমারই কথা।

—আমার কথা!

—হ্যাঁ, তোমারই কথা। আমার কেবলই মনে হচ্ছে শীগ্‌গিরই হয়তো কোনো কাউন্ট বা মার্কুইস এসে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন আমার কাছ থেকে।

—উহুঁ, যাকে-তাকে আমি বিয়ে করবোই না। আমি বিয়ে করলে আমার নিজের পছন্দসই পুরুষকেই করবো।

সুজানের কথার উপর দুরয় মৃদু হেসে বললে—তোমার এ প্রতিজ্ঞা টিকবে না। হয়তো ছয় মাসের মধ্যেই দেখবো, কোনো নামকরা বংশের ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে। তোমরা তো এখন বেজায় বড়লোক।

—আপনিই বা কম কিসে! আপনিও তো এখন অনেক টাকার মালিক। আপনি এবং আপনার স্ত্রী দুজনেই।

—সে এমন কিছু বেশি নয়। আমাদের দুজনের মিলিয়ে পঞ্চাশ লাখ ফ্রাঁও হবে না। থাকি ভাড়া করা ফ্ল্যাটে। একটা গাড়ি কিনবার ক্ষমতাও আমাদের হয়নি।

কথা বলতে বলতে ছবি-ঘরের কাছাকাছি এসে পড়লো ওরা। এই সময় একদল লোক এসে পড়লো ওদের সামনে। তাদের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠলো—ওই ছাখো, লারোচ ম্যাথু আর মাদাম দুরয় কেমন ঢলাঢলি করতে করতে যাচ্ছে।

কথাটা শুনে পাশের দিকে তাকাতেই দুরয় দেখলো যে, ম্যাডেলিন আর ম্যাথু হাত ধরাধরি করে বাগানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের দেখে দুরয়ের মাথার মধ্যে আগুণ জ্বলে উঠলো। মনে হলো, ছুটে গিয়ে দুটোর মুখে প্রচণ্ড দুটো ঘুষি বসিয়ে দেয়। সুজান কিন্তু দুরয়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করলো না। সে তার হাত ধরে একটু টান দিয়ে বললে— চলুন, ছবি-ঘরে যাই আমরা।

ছবি-ঘরে এসে অবাক হয়ে গেল দুরয়। এ কি আশ্চর্য সুন্দর ছবি! চারদিকে সাগরের উত্তাল তরঙ্গ, আর সেই তরঙ্গের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন

প্রভু যীশুখ্রীষ্ট। তাঁর প্রশান্ত সুন্দর মুখ থেকে যেন বাইবেলের বাণী ফুটে বের হচ্ছে—"যাহারা ধনবান, তাহারা যেন ধনগর্বে গর্বিত না হয়।" অনেকক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে থাকবার পর কথা বললো তুরয়। সে বললে—এ ছবির তুলনা হয় না। এ রকম জিনিসের মূল্য অর্থ দ্বারা নিরূপন করা যায় না।

ছবি দেখা হয়ে গেলে সুজান তুরয়কে নিয়ে পানশালায় গেল। সেখানে যেতেই মশিয়েঁ ওয়াণ্টারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তুরয়ের। সে তখন একজন সুবেশ যুবকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। তুরয়কে দেখে সে খুশি হয়ে বললে—এই যে মশিয়েঁ তুরয়! আসুন, আপনাকে মার্কুইস দে ক্যাজেলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

এই বলে পাশের যুবকটির দিকে তাকিয়ে ওয়াণ্টার বললে—ইনি হচ্ছেন মশিয়েঁ তুরয়। আমার পত্রিকার সম্পাদক।

মার্কুইস তুরয়ের সঙ্গে করমর্দন করে বললে—আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করে খুশি হলাম।

তুরয়ও সৌজন্য জ্ঞাপন করতে ভুল করলো না।

সৌজন্য বিনিময়ের পর মার্কুইস হঠাৎ সুজানের দিকে তাকিয়ে বললে—চলুন মাদাময়জেল। আমাকে ছবি দেখিয়ে আনবেন।

সুজান খুশি হয়ে বললে—আসুন।

সুজানকে মার্কুইস ক্যাজেলোর সঙ্গে চলে যেতে দেখে তুরয় মনে মনে একটু ঈর্ষামিশ্রিত ব্যথা অনুভব করলো। কেন যেন তার মনে হলো, মার্কুইস দে ক্যাজেলো তার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী।

তুরয়কে অন্যমনস্ক দেখে ওয়াণ্টার বললে—আসুন মশিয়েঁ তুরয়। এক গ্লাস স্যাম্পেন পান করে মেজাজটা ঠাণ্ডা করে নিন।

তুরয় তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বললে—আমাদের মতো কলম-পেশা মানুষদের মেজাজ সব সময়ই ঠিক থাকে, স্যার। ওটা ঠাণ্ডা রাখবার দরকার আপনাদেরই।

এই সময় একজন সিনেটরকে দেখতে পেয়ে ওয়াণ্টার বললে—আপনি পান করুন মশিয়েঁ, আমি আসছি।

এই কথা বলেই ওয়াণ্টার ছুটলো সেই সিনেটরের দিকে।

তুরয় তখন ওখান থেকে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই কবি নর্বার্ত দে ভার্ণ এসে হাজির হলো সেখানে। তুরয়কে দেখে খুশি হয় সে বললে—

এই যে সম্পাদক সাহেব! আসুন, একটু পানানন্দ উপভোগ করা যাক।

দুরয় খুশি হলো কবিকে পেয়ে। ওরা দুজনে তখন স্যাম্পেন পান করতে করতে কথাবার্তা বলতে লাগলো। পান শেষ করেই নবার্ত বিদায় দিয়ে চলে গেল। দুরয়ও তখন উঠি উঠি করছে। এই সময় হঠাৎ মশিয়ে মোরেল সস্ত্রীক এসে হাজির হলো ওখানে। তাদের দেখে দুরয় তাড়াতাড়ি তাদের কাছে এগিয়ে এসে বললে—আপনারাও এসেছেন দেখছি!

মশিয়েঁ মোরেল তো দুরয়কে দেখে মনে খুশি! দুরয়ের সঙ্গে করমর্দন করে সে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে—মরোক্কো-বণ্ড সম্বন্ধে আপনি আমাদের যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তার জন্যে আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনার পরামর্শ মতো বণ্ড কিনে আমরা আজ ধনীর পর্যায়ে উঠতে পেরেছি।

দুরয় হেসে বললে—আপনার তাহলে দেনা শোধ করা উচিত; তাই না?

এই বলে ক্লতিলদের দিকে তাকিয়ে সে বললে—আসুন মাদাম, আপনাকে যীশুখ্রীষ্টের ছবিটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।

ক্লতিলদে খুশি হয়ে বললে—হ্যাঁ, চলুন।

দুরয় তখন মশিয়েঁ মোরেলের দিকে তাকিয়ে বললে—মাদামকে আপনার কাথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি তাতে রাজী তো?

মশিয়েঁ মোরেল হাসি মুখে বললে—এই টুকুতেই যদি দেনা শোধ হয় তাহলে এক্ষুণি রাজী। আপনি স্বচ্ছন্দে ওকে নিয়ে যেতে পারেন!

দুরয় বললে—না, একেবারে হতাশ করতে চাইনে আপনাকে। ঘণ্টা-খানেক পরেই আপনার গচ্ছিত জিনিস ফিরে পাবেন।

এই কথা বলেই ক্লতিলদেকে নিয়ে ওখান থেকে চলে গেল দুরয়।

যেতে যেতে ক্লতিলদে বললে—আমার স্বামীকে সত্যিই তুমি বশ করেছো দেখছি।

দুরয় বললে—না করে উপায় কি? প্রাণের দায়েই বশ করতে হয়েছে ওঁকে।

—হ্যাঁ, এ ব্যাপারে তোমাকে বাহাদুর বলা চলে।

—বাহাদুরী কিন্তু তোমারও কম নয়।

আরও কি বলতে যাচ্ছিলো দুরয়, কিন্তু পাশের একটা ঝোপের আড়ালে ম্যাডেলিনের নামটা উচ্চারিত হতে শুনে সে কথা আর বলা হলো না। সে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

ঝোপের ওধার থেকে পুরুষ কণ্ঠে কাকে যেন বলতে শুনা গেল—ম্যাডে-লিনের কাণ্ডটা দেখেছো! ও এখন প্রকাশ্যেই ম্যাথুর সঙ্গে ঢলাঢলি করছে।

এর উত্তরে নারী কণ্ঠে কে বললে—দেখেছি বৈ কি! ম্যাথুর সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথাটা এখন আর গোপন নেই।

দুরয়ের মগজের মধ্যে যেন উত্তপ্ত সাসে শিষে ঢেলে দেওয়া হলো। তার মনে হলো, ছুটে গিয়ে ওদের মুখে দুটি চড় কসে দিয়ে পরচর্চা বন্ধ করে দেয়। হয়তো করেও বসতো একটা কিছু, কিন্তু হঠাৎ সুজান আর তার মা এসে পড়ায় আত্মদমন করতে বাধ্য হলো সে।

ক্লতিলদেকে দেখে সুজান বললে—আসুন মাদাম, আপনাকে ছবি দেখিয়ে আনি।

এই কথা বলেই ক্লতিলদের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো সে।

ওরা চলে যেতেই মাদাম ওয়াল্টার দুরয়ের কাছে এগিয়ে এসে বললে—তোমার সঙ্গে আমার কতগুলো দরকারী কথা আছে। তুমি বাড়ির পেছনের বাগানে চলে যাও। বাগানের উত্তর দিকে একটা সরু রাস্তা দেখতে পাবে। সেই রাস্তার শেষ প্রান্তে একটা কুঞ্জ আছে। সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করো। তোমার প্রাপ্য টাকাও সেখানেই দেবো।

মাদাম ওয়াল্টারের সঙ্গে গোপনে মিলিত হবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না দুরয়ের। কিন্তু নব্বই হাজার লুই-এর কথা ভেবে মনের ভাব গোপন করে সে বললে—আচ্ছা আমি যাচ্ছি!

নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির হয়ে দুরয়ের মনে হলো যে, সে যেন জেলখানায় এসে পড়েছে। মাদাম ওয়াল্টারের কথা মনে হতেই তার মনটা বিরূপ হয়ে উঠলো। এই বিগত-যৌবনা স্ত্রীলোকটির হাত থেকে কি করে রেহাই পাওয়া যায় সেই কথাই সে চিন্তা করতে লাগলো। সে মনে মনে স্থির করলো যে, আজই মাদামের সঙ্গে সম্পর্কের শেষ করবে সে।

একটু পরেই মাদাম এসে হাজির হলো সেখানে। সে এসেই দুহাত দিয়ে দুরয়কে জড়িয়ে ধরে বললে—তুমি এত নিষ্ঠুর হয়েছো কেন ডার্লিং। তুমি দেখছি আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে চাও না আজকাল। কি এমন অন্যায় করেছি আমি?

—কি করেছো শুনবে? তুমি আমার পারিবারিক শান্তি নষ্ট করে দিয়েছো।

—আমি তোমার পারিবারিক শান্তি নষ্ট করে দিয়েছি! কি ব্যাপার বলো তো?

—সেদিন তুমি আমার ওয়েষ্ট কোটের বোতামে তোমার চুল জড়িয়ে দিয়েছিলে, মনে আছে?

—আছে বৈকি! কেন, কি হয়েছে তাতে?

—কি হয়েছে তাই আবার জিজ্ঞেস করছো! তোমার ওই চুলের জন্যে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হবার উপক্রম হয়েছে।

দুরয়ের কথা শুনে প্রথমটা একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো মাদাম। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠলো—এটা তুমি বাজে কথা বলছো। স্ত্রীর সঙ্গে এ নিয়ে কোনো কথাই হয়নি তোমার। এ বিষয়ে যদি কথা হয়ে থাকে তা হয়েছে অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে। তোমার নিশ্চয়ই কোনো উপপত্নী আছে।

—আমার কোনো উপপত্নী নেই। উপপত্নী যদি থাকে সে হলে তুমি।

—যাক, আর সাফাই গাইতে হবে না। তোমার উপপত্নী আছে কিনা তা আমার জানতে বাকি নেই। তোমার কাজই হলো মেয়েদের সর্বনাশ করা। প্রেমের ফাঁদ পেতে তুমি তাদের নিজের খপ্পরে নিয়ে আসো, তারপর তার সর্বনাশ করে ছেঁড়া জুতোর মতো রাস্তায় ফেলে দাও।

—মাদাম ওয়াল্টারের কথা শুনে দুরয় মৃদু হেসে বললে—থামলে কেন, বলে যাও।

—বলবোই তো। আমার কথাই বলি। তুমি কি জানো না যে, আমি তোমাকে কতখানি ভালবাসি। কিন্তু আজকাল আমার সঙ্গে তুমি এমন ব্যবহার করছো যেন আমাকে তুমি চেনোই না।

এতক্ষণে দুরয় মুখ খুললো। মাদাম ওয়াল্টারের দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগলো—আজ তোমাকে আমি একটা স্পষ্ট কথা বলছি। আমি বিবাহিত এবং তুমিও বিবাহিত। তোমার দুটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে রয়েছে। তাছাড়া তোমার স্বামী আমার মনিব। এ অবস্থায় তোমার সঙ্গে আমার শুধু বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্কই থাকা উচিত নয়। আমি তাই স্থির করেছি, তুমি যদি আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো মেলামেশা করতে চাও তাহলেই শুধু আমার দেখা পাবে, নইলে আজই আমাদের দেখাশুনার শেষ।

—এই কি তোমার শেষ কথা ?

—হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা।

মাদাম তখন তার দুই হাত দুরয়ের কাঁধের ওপর রেখে বললে—তোমাকে একবার দেখতে পাবার জন্যে আমি যে কোনো সর্তে রাজী আছি।

—বেশ তাহলে এই কথাই রইলো।

মাদাম তখন নিজের ঠোঁট দুটি দুরয়ের ঠোঁটের কাছে এগিয়ে এনে বললে—তাহলে শেষবারের মতো আজ একটা চুমো দাও আমাকে।

দুরয় বললে—না, এতে আমাদের চুক্তি ভঙ্গ হবে।

—মাদাম ওয়াল্টারের চোখ দুটি জলে ভরে উঠলো দুরয়ের কথা শুনে। দেখতে দেখতে সে জল টপ টপ করে গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার গালের ওপর দিয়ে। দুরয় কিন্তু তা দেখেও দেখলো না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

মাদাম তখন তার জামার ভেতর থেকে রেশমি কাপড়ে মোড়া একটি প্যাকেট বের করে দুরয়ের দিকে এগিয়ে ধরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে—এই নাও তোমার লভ্যাংশ।

প্যাকেটটা নেবার প্রবল ইচ্ছে থাকলেও দুরয় মুখে বললে—না, এটা আমি নিতে পারিনে। এটা তোমার।

মাদাম বললে—তুমি না নিলে এটাকে আমি নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

দুরয় তখন প্যাকেটটা মাদামের হাত থেকে নিয়ে পকেটে পুরে কোমল স্বরে বললে—এবার ভেতরে যাও, নইলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

মাদাম তখন দুরয়ের হাত দুটি ধরে তাতে পর পর কয়েকটা চুমু দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল সেখান থেকে!

মাদাম ওয়াল্টার চলে গেলে দুরয় আবার ফিরে এলো প্রদর্শনীতে। ওখানে তখন আর ভিড় নেই। যে ক'জন তখন ছিল তাদের মধ্যে সুজানকে দেখতে পেলো সে। সুজান তার কাছে এগিয়ে এসে বললে—এতক্ষণ কোথায় ছিলেন বেল-আমি ? আমি আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।

—কেন বলো তো ?

—বারে! আমি যে আজ আপনার সঙ্গে নাচবো ঠিক করেছি। চলুন, বলরুমে যাই।

—না, বলরুমে যাবার দরকার নেই! তার চেয়ে চলো অন্য কোথাও গিয়ে তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি।

সুজান খুশি হলো ডুরয়ের কথা শুনে। সে তখন ডুরয়কে সঙ্গে করে বাগানে গিয়ে একখানা বেঞ্চে বসে তার সঙ্গে গল্প করতে শুরু করলো।

কথায় কথায় ডুরয় বললে—সুজান, আমাকে তোমার বন্ধু বলে স্বীকার করে নিতে পারবে কি?

—নিশ্চয়ই পারবো।

—বেশ, তাহলে একটা অনুরোধ করছি। অনুরোধটা রাখবে কি?

—কি অনুরোধ বলুন?

—অনুরোধটা হচ্ছে, কারো সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হলে আমাকে না জানিয়ে তুমি কোনো কথা দেবে না।

—বেশ, তাই হবে।

—কথাটা যেন গোপন থাকে।

—তাই থাকবে।

এই সময় মশিয়েঁ রিভ্যাল ওখানে এসে হাজির হলো। সুজানকে দেখে সে বললে—এই যে সুজান! তোমার বাবা তোমাকে বলরুমে যেতে বলেছেন।

এই কথা বলেই রিভ্যাল চলে গেল সেখান থেকে।

রিভ্যালের কথা শুনে সুজান ডুরয়ের দিকে তাকিয়ে বললে—আসুন বেল-আমি, আজ আপনি আমার পার্টনার হয়ে নাচবেন।

ডুরয় মৃদু হেসে বললে—কিছুক্ষণের জন্যে তোমার পার্টনার হতে আমি চাইনে, সুজান। পার্টনার হতে হলে স্থায়ী পার্টনারই হাবা।

সুজান তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে সে বললে—পারনি ভারী দুষ্টু।

সুজান চলে গেলে ডুরয়ও উঠে পড়লো। কিছুটা যেতেই ম্যাডেলিনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার। তাকে দেখে ডুরয় বললে—চলো, এবার বাড়ি ফেরা যাক।

ম্যাডেলিন বললে—সে কি! মাদাম ওয়াল্টারের সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

—না, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেই নাচে যোগদান করবার কথা বলবেন। আমার আজ নাচতে ইচ্ছে নেই মোটেই।

ম্যাডেলিনেরও আর দেরি করতে ইচ্ছে হচ্ছিলো না। সে তাই খুশি মনেই বললে—বেশ তাহলে চলো।

বাড়িতে গিয়ে ম্যাডেলিন দুরয়ের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললে—তোমার জন্তে একটি দামি জিনিস এনেছি আমি।

—কি জিনিস?

—অনুমান করো না!

—আমার এখন অনুমান করবার মতো সময় নেই। কি এনেছো বলেই ফ্যালো না!

—বলছি। আগামী কাল পয়লা জানুয়ারী, মনে আছে তো?

—হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে?

ম্যাডলিন সে কথায় উত্তর না দিয়ে তার জামার ভেতর থেকে ছোট্ট একটা ভেলভেটের বাক্স বের করে দুরয়ের হাতে দিয়ে বললে—তোমার জন্তে নববর্ষের উপহার এনেছি।

দুরয় বাক্সটা খুলে দেখলো যে, তার মধ্যে লাল রিবন দিয়ে বাঁধা ছোট একটা ক্রশ—'লিজিয়ন অব অনার'।

ম্যাডেলিন বললে—কাল সকালেই কাগজে কাগজে তোমার এই সম্মান লাভের খবর ছাপা হবে। লারোচ ম্যাথু এটা আগে থেকেই আমার হাতে দিয়েছেন।

দুরয় নিস্পৃহ কণ্ঠে বললে—এর চেয়ে কয়েক হাজার লুই পেলে বেশি খুশি হতাম আমি। এটার দাম ৬,।র ক' ফ্র। হবে।

ম্যাডেলিন অবাক হয়ে গেল দুরয়ের কথা শুনে। সে বললে—তুমি দেখছি কছুতেই সন্তুষ্ট হতে চাও না। তোমার মতো লোকের পক্ষে 'লিজিয়ন অব অনার' লাভ করা কম কথা নয়।

—সেটা মতামতের ব্যাপার। আমি মনে করি, ম্যাথুর কাছ থেকে আমার আরও অনেক বেশি পাওয়া উচিত। আমার কাছে তার দেনার পরিমাণ অনেক বেশি। এটা দিয়ে তার শতাংশের একাংশও শোধ হলো না।

ম্যাডেলিন আর কথা না বাড়িয়ে পোষাক পরিবর্তন করতে চলে গেল। দুরয়ও তার স্টাডিতে চলে গেল লেখাপড়া করতে।

পর দিন সকালে প্যারীর প্রতিটি দৈনিক পত্রিকায় দুরয়ের সম্মান লাভের খবর ছাপা হয়েছে দেখা গেল।

একটু পরেই মাদাম ওয়াল্টারের কাছ থেকে এক অভিনন্দন পত্র এলো দুরয়ের কাছে। পত্রে দুরয় আর তার স্ত্রীকে ডিনারের নিমন্ত্রণও করা হয়েছে।

চিঠিখানা পড়ে ম্যাডেলিন বললে—যাবে নাকি ?

দুরয় বললে—না যাওয়াটা কি ভাল দেখায় ?

—না, তা দেখায় না ঠিকই ; কিন্তু গতকাল তোমার যা হাবভাব দেখেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল, ও বাড়িতে আর তুমি কখনও যাবে না।

দুরয় হেসে বললে—আমার মত বদলে ফেলেছি।

যথা সময়ে ওয়াল্টার-প্রাসাদে হাজির হয়ে ওরা দেখলো যে, মাদাম ওয়াল্টার কালো পোষাক পড়ে বসে আছে। ব্যাপার দেখে বিস্মিত হয়ে ম্যাডেলিন জিজ্ঞেস করলো—কী ব্যাপার মাদাম! আপনার এ বেশ কেন ?

মাদাম ওয়াল্টার ম্লান হেসে বললে—নিজের জন্যে শোক প্রকাশ করছি আমি।

—নিজের জন্যে শোক প্রকাশ করছেন! তার মানে ?

—মানে, আমার যা বয়স তাতে নিজের জন্যে শোকপ্রকাশ করাই উচিত।

মাদাম ওয়াল্টারের এই ধরণের অসংলগ্ন কথা শুনে ম্যাডেলিনের মনে হলো, বেচারার বোধ হয় মাথা খারাপ হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

ডিনার খেতে বসে অনেককেই অভিনন্দন জানালো দুরয়কে। ডিনার শেষ হলে সবাই মিলে ছবি-ঘরে গিয়ে হাজির হলো। ওখানে গিয়ে সবাই যখন কথাবার্তায় ব্যস্ত সেই সময় দুরয়কে হঠাৎ একা পেয়ে মাদাম ওয়াল্টার তার কাছে এগিয়ে এসে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে—শোনো জর্জেস। আমি আর কোনোদিন তোমাকে বিরক্ত করবো না, কিন্তু তুমি আমাকে কথা দাও যে, মাঝে মাঝে এসে আমাকে তুমি দেখা দিয়ে যাবে! তোমাকে না দেখলে আমি বাঁচবো না।

দুরয় বললে—এ কথা আর নতুন করে বলবার দরকার নেই। বন্ধুভাবে আসবো বলেছিলাম, এই তো এসেছি।

এদিকে মশিয়ে ওয়াল্টার তার মেয়ে দুটিকে নিয়ে যীশুখ্রীষ্টের ছবির কাছে দাঁড়িয়ে দুরয়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল। দুরয় তাদের কাছে আসতেই ওয়াল্টার বললে—জানো বেল-আমি, গত রাত্রে দেখি আমার স্ত্রী এই ছবির সামনে হাঁটু গেড়ে চোখ বুজে বসে আছেন। তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে মনে হলো, তিনি যেন চার্চে বসে উপাসনা করছেন।

ওয়াল্টারের কথা শুনে মাদাম বললে—এখন প্রভু যীশুখ্রীষ্টই আমার ত্রাণকর্তা

এই সময় সুজান হঠাৎ বলে উঠলো—কী আশ্চর্য! বেল-আমির মুখখানা ঠিক যেন যীশুর মতো দেখতে।

এই বলে দুরয়ের হাত ধরে টেনে এনে ছবির পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে—আপনার মুখে দাড়ি থাকলে ঠিক যীশুর মতো দেখাতো।

ওয়াল্টার বললে—ভারী আশ্চর্য তো!

মাদাম ওয়াল্টারও দুরয়ের মুখের দিকে তাকালো। তার মুখে কোনো কথা নেই, যেন পাথরের মূর্তি।

ষোল

এরপর থেকে দুরয় ঘন ঘন আসতে লাগলো ওয়াল্টার-প্রাসাদে। ওখানে এখন তার প্রধান আকর্ষণ হলো সুজান। সুযোগ পেলেই সে সুজানের সঙ্গে গল্পগুজব করে। সুজানও খুশি হয় দুরয়কে পেলে।

এদিকে মাদাম ওয়াল্টারের অবস্থা তখন রীতিমত কাহিল। দুরয় এলেই সে তার পাশে ঘুর ঘুর করতে থাকে। সুযোগ পেলে প্রেম নিবেদন করতেও ছাড়ে না। দুরয় কিন্তু তাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। সে বলে, তুমি আমাদের সর্ত ভুলে যাচ্ছে, এখন আমরা পরস্পরের বন্ধু ছাড়া আর কিছু নই।

এইভাবে কিছুদিন চলবার পর মার্চের শেষ দিকে সুজান আর ক্যাজেলোর বিয়ের কথা উঠলো। দুরয় শুনতে পেলো যে, মার্কুইস দে ক্যাজলোর সঙ্গে সুজানের বিয়ের কথা হচ্ছে। খবরটা শুনবার পর দুরয় বেশ একটু মনমরা হয়ে পড়লো। সুজানকে অন্য কোনো পুরুষ বিয়ে করে নিয়ে যাবে, অন্য কেউ তার দেহ-সুধা পান করবে এটা তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠলো।

একদিন সুজানকে একা পেয়ে দুরয় বললে—তুমি তোমার কথা রাখলে না, সুজান!

—কি রকম?

—তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে, আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কাউকে বিয়ে করবে বলে কথা দেবে না, মনে আছে?

—আছে বৈকি!

—তাহলে সে কথা খেলাপ করলে কেন?

—কে বললে আমি কথার খেলাপ করেছি?

—কে আবার বলবে? এ কথা তো সবাই জানে যে, মার্কুইস দে ক্যাজেলোর সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে যাচ্ছে। ওই উজবুকটাকে কি দেখে তোমার পছন্দ হলো বুঝি নে।

—আপনি ওকে যতটা অপদার্থ মনে করছেন, আমি তা করি না।

—তা তো করবেই না, কারণ তোমরা শুধু টাকা আর পদবিই চেনো।

—আপনার কথাগুলো একটু বেসুরো মনে হচ্ছে আজ। কি ব্যাপার বলুন তো?

—কি ব্যাপার তা কি আজও বুঝতে পারো নি তুমি? আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে অন্য কেউ বিয়ে করবে এটা আমি সহ্য করতে পারবো না।

—আপনার দেখছি মাথা-খারাপ হয়ে গেছে।

—সত্যিই আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যখনই মনে হয় তোমার বিয়ে বতে যাচ্ছে, তখন আমার মাথায় খুন চেপে যায়।

—কিন্তু আপনি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন যে, আপনি বিবাহিত।

—আমি বিবাহিত না হলে তুমি আমাকে গ্রহণ করতে?

—নিশ্চয়ই করতাম। আপনাকে বিয়ে করতে পারলে সত্যিই আমি সুখী হতাম।

—আমার স্ত্রীর সঙ্গে যদি আইনসঙ্গতভাবে আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়, তাহলে তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারবে কি?

—এসব কি বলছেন আপনি?

—ঠিকই বলছি, সুজান। মনে করো আদালতের হুকুমে আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর হচ্ছে। সে অবস্থায় আমাকে বিয়ে করতে পারবে কি তুমি!

সুজান মাথা নীচু করে বললে—পারবো।

সুজানের কথা শুনে হুরয় খুশি হয়ে বললে—তাহলে কথা দাও, ছ'মাস আমার জন্যে অপেক্ষা করবে; ছ'মাসের আগে কাউকে কথা দেবে না।

—বেশ তাই হবে।

এরপর আর একটি কথাও না বলে হুরয় উঠে গেল ওখান থেকে। তার মনের মধ্যে তখন ঝড় বইছে।

বাড়িতে ফিরে এসে হুরয় দেখলো, ম্যাডেলিন কাকে যেন চিঠি লিখছে

দুরয়কে দেখে চিঠিখানার ওপর কাগজ চাপা দিয়ে ম্যাডেলিন বললে—কোথায় গিয়েছিলে ?

দুরয় সংক্ষেপে উত্তর দিল—ওয়াল্টার-প্রাসাদে।

—ব্যাপার কি ? ওখানে দেখছি ঘন ঘন যাতায়াত চলছে এখন।

—তা চলছে বৈকি! আচ্ছা, আমি শুতে যাচ্ছি, তুমি তোমার কাজ করো। এই বলে ওখান থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আবার কি মনে করে ফিরে দাঁড়ালো দুরয়।

ম্যাডেলিন বললে—আমাকে কিছু বলবে ?

—হ্যাঁ, আগামীকাল একটা বিশেষ কাজে আমি প্যারীর বাইরে যাচ্ছি। ফিরতে দু'দিন দেরী হবে।

এই কথা বলেই ওখান থেকে চলে গেল দুরয়।

পরদিন সকালেই বেরিয়ে পড়লো দুরয়। যাবার সময় ম্যাডেলিনকে বলে গেল, পত্রিকার জন্যে যা কিছু করবার দরকার তা যেন সে-ই করে। বলা-বাহুল্য যাবার আগে ম্যাডেলিনকে আদর করে একটা চুমু দিতেও ভুললো না সে।

রয় কিন্তু প্যারী ছেড়ে বাইরে গেল না।

সারাদিন বাইরে বাইরে কাটিয়ে সন্ধ্যার পরে একখানা গাড়ি ভাড়া করে বাড়ির দিকে ফিরে চললো।

বাড়ির কাছাকাছি এসে একটা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো সে। গাড়িখানা এমন জায়গায় দাঁড় করালো যাতে তার বাড়ি থেকে কেউ দেখতে না পায়। তার উদ্দেশ্য হলো, ম্যাডেলিন বাড়ি থেকে বের হলেই সে তাকে অনুসরণ করবে।

ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করবার পর ম্যাডেলিনকে দেখতে পেলো দুরয়। তার সাজগোছের ঘটা দেখে দুরয়ের বুঝতে বাকি থাকলো না যে, সে আজ অভিসারে বেরিয়েছে। দুরয় তখন গাড়ির জানালাগুলো বন্ধ করে পেছনের ফুকর দিয়ে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলো। ম্যাডেলিন কিন্তু জানতেও পারলো না যে, দুরয় তার ওপরে গোপনে লক্ষ্য রেখেছে। সে নিশ্চিন্ত মনে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একখানা গাড়ি ভাড়া করে উঠে বসলো তাতে।

ম্যাডেলিনের গাড়িখানা চলতে শুরু করলে দুরয় তার গাড়ির চালককে বললে—সামনের ওই গাড়িটাকে অনুসরণ করো।

মিনিট পনের পরে ম্যাডেলিনের গাড়িখানা একটা রেস্তোরাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। দুরয় লক্ষ্য করলো যে, ম্যাডেলিন গাড়োয়ানকে ভাড়া না দিয়েই রেস্তোরাঁর ভেতরে ঢুকে গেল। দুরয় তখন একটা সুবিধে মতো জায়গায় তার গাড়িখানা দাঁড় করিয়ে রেস্তোরাঁর দরজার দিকে লক্ষ্য রাখলো। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না তাকে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ল্যারোচ ম্যাথুকে সঙ্গে নিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলো ম্যাডেলিন। দুরয় বুঝতে পারলো যে, ম্যাথু আগে থেকেই ওখানে অপেক্ষা করছিল ম্যাডেলিনের জন্যে।

ম্যাথু গাড়োয়ানকে কি যেন নির্দেশ দিয়ে ম্যাডেলিনকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করলো গাড়িখানা। এদিকে পূর্ব নির্দেশ মতো দুরয়ের গাড়িখানাও সেই গাড়িকে অনুসরণ করে চলতে লাগলো।

মিনিট পনের চলবার পর সামনের গাড়িখানা হঠাৎ থেমে গেল। দুরয়ের গাড়ির চালকও থামিয়ে ফেললো তার গাড়ি। দুরয় তখন জানালা দিয়ে সামনের দিকে লক্ষ্য রাখতে লাগলো। একটু পরেই সে দেখলো যে, ম্যাডেলিন আর ম্যাথু গাড়ি থেকে নেমে পাশের একটা বাড়িতে প্রবেশ করলো। এই বাড়িটার সঙ্গে দুরয়ের আগে থেকেই পরিচয় ছিল। বাড়িটার তিনতলায় ম্যাথুর ভাড়া করা একটি ফ্লাট আছে সে খবর দুরয়ের অজানা ছিল না। ম্যাথু তাকে বলেছিল যে, ফ্লাটটা সে ভাড়া করে রেখেছে তার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করবার জন্য।

তবে ম্যাডেলিনের সঙ্গে কি ধরণের গোপন পরামর্শ চলবে তা বুঝতে মোটেই দেরি হলো না দুরয়ের। সে তাই গাড়োয়ানকে বললে—পুলিশ কমিশনারের কুঠিতে চলো।

পুলিশ কমিশনার তাঁর কুঠিতেই ছিলেন। দুরয় তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললে—আমার স্ত্রী এখন তার উপপতির সঙ্গে আনন্দ করছে।

কমিশনার হেসে বললেন—আমাকে কি তাঁদের আনন্দটা পণ্ড করতে বলছেন?

—আপনাকে একবার যেতে হবে সেখানে।

—নিশ্চয়ই যেতে হবে। আমরা তো আপনাদের জন্যেই আছি। চলুন, তাহলে আর দেরি করে দরকার নেই। রাত ন'টা বেজে গেলে আজ আর কিছু করা যাবে না।

—আপনি আরও দু'চার জন অফিসার সঙ্গে নেবেন না?

—নিশ্চয়ই নেবো। তাঁদের পুলিশ-অফিস থেকে তুলে নেওয়া যাবে।

নির্দিষ্ট বাড়িতে পেঁাছে তুরয় পুলিশ কমিশনার এবং অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে ম্যাথুর ফ্লাটের দরজার সামনে হাজির হলো। ফ্লাটের দরজাটা তখন ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

তুরয় কলিং বেল টিপলো। একটু পরে ভেতর থেকে নারী কণ্ঠে সাড়া এলো—কাকে চাইছেন?

পুলিশ কমিশনার বললেন—আইনের নামে আমি দরজা খুলতে বলছি। আমি পুলিশ কমিশনার।

ভেতর থেকে উত্তর এলো—কি চান আপনি?

এ প্রশ্নের উত্তর দিল তুরয়। সে চিৎকার করে বললে—কি চাই তা কি বুঝতে পারছো না? আমরা তোমাকে আর তোমার উপপতিকে একসঙ্গে ধরতে চাই।

আবার ভেতর থেকে নারী কণ্ঠস্বর শুনা গেল—আপনি কি বলছেন, আমি তার কিছুই বুঝতে পারছি নে। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। আপনারা চলে যেতে পারেন। দরজা আমি খুলবো না।

এই কথা শুনে কমিশনার বললেন—আমাকে তাহলে বাধ্য হয়ে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে হবে।

কমিশনারের কথা শেষ হতে না হতেই তুরয় সবলে পদাঘাত করলো দরজার ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের ছিটকিনি ভেঙে খুলে গেল দরজাটা। দরজাটা খুলে যেতেই দেখা গেল, ম্যাডেলিন একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার সারা দেহে শুধু একখানা তোয়ালে চাপা দেওয়া।

ম্যাডেলিনের এই রকম অর্ধনগ্ন মূর্তি দেখে তুরয় চিৎকার করে বললে—এই বেহায়া স্ত্রীলোকটিই আমার স্ত্রী বলে পরিচিত, কমিশনার! এতদিন পরে একে ধরতে পেরেছি।

কমিশনার তখন ম্যাডেলিনের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন—আপনি কি এই ভদ্রলোকের আইনসম্মত স্ত্রী?

ম্যাডেলিন নিরুত্তর।

তাকে নিরুত্তর দেখে কমিশনার আবার বললেন—আমার কথার উত্তর দিন। এখানে এত রাত্রে কি করছেন? আর এ অবস্থায়ই বা রয়েছেন কেন?

ম্যাডেলিন এবারও কোনো উত্তর দিল না।

কমিশনার বললেন—চুপ করে থাকলে কোনো লাভ হবে না, মাদাম। আমি তাহলে এই ভদ্রলোকের অভিযোগটা সত্যি বলে ডায়েরীতে লিখে নিতে বাধ্য হবো। তাছাড়া আমি এই ফ্লাটটা একবার তল্লাসীও করবো।

—আপনার কাছে কি কোনো সার্চ ওয়ারেন্ট আছে?

—সার্চ ওয়ারেন্টের দরকার নেই, মাদাম। ব্যাভিচারের অভিযোগে তল্লাসী করতে সার্চ ওয়ারেন্টের দরকার হয় না।

এই বলে ম্যাডেলিনের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন—আপনি যান, পোষাক পরে নিন গিয়ে।

ম্যাডেলিনকে পোষাক পরার সুযোগ দিয়ে কমিশনার তাঁর দলবল নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে পড়লেন। বলা বাহুল্য, ডুরয়ও গেল তাঁদের সঙ্গে। সেই ঘরে ঢুকতেই দেখা গেল যে, একটি লোক আপাদ-মস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে খাটের ওপর শুয়ে আছে।

কমিশনার তখন সেই খাটের পাশে গিয়ে আদেশের সুরে 'বললেন—আমি পুলিশ কমিশনার, আপনাকে উঠে বসতে অনুরোধ করছি। আশা করি আপনি আমাকে বল প্রয়োগ করতে বাধ্য করবেন না।

লোকটি কিন্তু কমিশনারের কথায় সাড়া দিল না। ডুরয় তখন এগিয়ে এসে বালিশের দিক থেকে কম্বলটা টেনে একটু সরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো একটি মুখ। সে মুখ লারোচ ম্যাথুর।

তার দিকে তাকিয়ে অসহ্য ক্রোধে ডুরয় বললে—আজ তোকে হাতে পেয়েছি বদমায়েস!

এই সময় কমিশনার জিজ্ঞেস করলেন—আপনার নাম কি মশিয়ে?

ম্যাথু কিন্তু তখনও নিরুত্তর।

তাকে নিরুত্তর দেখে ডুরয় চিৎকার করে বললে—নামটা বলতে লজ্জা পাচ্ছিস কেন শয়তান? তুই যদি না বলতে চাস তাহলে আমিই বরং বলে দিই তোর নামটা!

এতক্ষণে কথা বের হলো ম্যাথুর মুখ থেকে। কমিশনারের দিকে তাকিয়ে সে বললে—মশিয়ে লে কমিশনার, অপর লোক দিয়ে আমাকে অপমান করাচ্ছেন কেন? আমি কার কথার উত্তর দেবো বলুন!

কমিশনার বললেন—আপনি আমার কথারই উত্তর দিন। আপনি আপনার নামটা বলুন।

ম্যাথু কিন্তু এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। সে শুধু এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো।

তার হাবভাব দেখে কমিশনার এবার রেগে গেলেন। তিনি বেশ একটু রাগত স্বরেই বললেন—আমার কথার উত্তর না দিলে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবো।

কমিশনারের কথা শুনে ঘাবড়ে গেল ম্যাথু। সে বললে—আমাকে পোষাক পরে নিতে দিন। তারপর সবই বলবো।

কমিশনার বললেন—পরুন না পোষাক। কে বাধা দিচ্ছে তাতে?

কমিশনারের কথা শুনে ম্যাথু একটু ইতস্ততঃ করে অবশেষে বললে—আমার যে উঠবার উপায় নেই।

—কেন বলুন তো?

—আমি একেবারে উলঙ্গ।

ম্যাথুর মুখ থেকে এই কথা শুনে দুরয় একেবারে হো হো করে হেসে উঠলো। হাসি থামলে সে বললে—আমার স্ত্রীর সামনে উলঙ্গ হতে যখন তোমার বাধেনি, তখন আমার সামনেই বা এতো লজ্জা কিসের?

এই বলে খাটের তলা থেকে ম্যাডেলিনের পরিত্যক্ত পেটিকোটটা তুলে ম্যাথুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—এইটে পরেই বেরিয়ে এসো। আমরা ততক্ষণ পেছন ফিরে থাকি।

এদিকে ম্যাডেলিন ততক্ষণে পোষাক বদলে নিয়েছে। কমিশনার তার সঙ্গের অফিসারদের ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে বলে নিজে গিয়ে দাঁড়ালেন ম্যাডেলিনের সামনে। ম্যাডেলিন তখন একটা সিগারেট ধরিয়ে বে-পরোয়াভাবে টানছিল। কমিশনার তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে উদ্ধত স্বরে বললে—আপনি বুঝি হামেশাই এ কাজ করে বেড়ান?

কমিশনার গম্ভীরভাবে বললেন—হ্যাঁ, না করলেও মাঝে মাঝে করতে হয় বৈ কি! তবে এ ধরণের নোংরা কাজ যত কম করে পারা যায় ততই ভাল।

এদিকে ম্যাথুও ততক্ষণে পোষাক পরে নিয়েছে। পোষাক পরা হয়ে গেলে সে কমিশনারের সামনে এসে দাঁড়ালো।

কমিশনার বললেন—এবার দয়া করে আপনার পরিচয়টা দিন, মশিয়েঁ।

ম্যাথু কিন্তু নীরব।

তার নীরবতা দেখে কমিশনার রেগে উঠে বললেন—আমাকে তাহলে বাধ্য হয়েই গ্রেপ্তার করতে হবে আপনাকে।

এবার কথা বের হলো ম্যাথুর মুখে। সে বললে—আমাকে গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা আপনার নেই মশিয়েঁ কমিশনার।

ম্যাথুর কথা শুনে দুরয় চিৎকার করে বললে—এটা দেওয়ানী মামলা নয় মশাই। ব্যাভিচারের অপরাধটা ফৌজদারী আইনের আওতায় পড়ে। সুতরাং বুঝতেই পারছো যে, তোমাকে গ্রেপ্তার করবার পূর্ণ ক্ষমতা কমিশনারের আছে। যাই হোক, তুমি যখন নিজের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করছো তখন আমিই সেটি জানিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে কমিশনারের দিকে তাকিয়ে সে বললে—এই বদমাইশটা কে জানেন? এর নাম লারোচ ম্যাথু। নিজেকে এ ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলে পরিচয় দেয়।

ম্যাথুর পরিচয় শুনে কমিশনার একেবারে হতবাক হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হলো কে যেন তাঁর গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। তিনি তখন ম্যাথুর দিকে তাকিয়ে বললেন—ইনি যা বললেন তা কি সত্যি!

ম্যাথু বললে—হ্যাঁ কমিশনার। আমি ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রী।

এরপর দুরয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে বললে—ওই দেখুন, আমারই দেওয়া সম্মান-চিহ্ন কুকুরটার বুকে ঝুলছে।

ম্যাথুর কথা শুনে অপমানে দুরয়ের মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। সে তখন টান মেরে 'লিজিয়ন অব অনার' এবং তার সঙ্গের লাল রিবনটা জামা থেকে খুলে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—তোমার মতো নরপশুর দেওয়া সম্মান-চিহ্ন বহন করতে আমি ঘৃণা বোধ করি।

দুরয়ের কথা শুনে ম্যাথু হঠাৎ রুখে দাঁড়ালো তার দিকে। দুরয়ও এগিয়ে এলো আস্তিন গুটিয়ে।

ব্যাপার দেখে কমিশনার তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন—আপনারা দুজনেই এখন আইনের অধীনে রয়েছেন সে কথা ভুলে যাবেন না।

কমিশনারের কথায় কাজ হলো। ওরা পরস্পরের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালো।

এদিকে ম্যাডেলিন তখনও নির্বিকার চিত্তে সিগারেট টেনে চলেছে। যেন কিছুই হয়নি এমনি তার ভাবখানা।

কমিশনার এবার লারোচ ম্যাথুর দিকে তাকিয়ে বললেন—শুনুন মশিয়ে। নিরালা ঘরে মাদাম দুরয়ের সঙ্গে আপনাকে আমি যে ভাবে দেখতে পেলাম তাতে এ ব্যাপারটাকে ব্যাভিচার ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। এ সম্বন্ধে আপনার কোনো বক্তব্য আছে কি?

ম্যাথু বললে—আমার কিছু বক্তব্য নেই। আপনি আপনার কর্তব্য করতে পারেন।

কমিশনার এবার ম্যাডেলিনের দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনার কিছু বলবার আছে কি, মাদাম? আপনি কি স্বীকার করছেন যে, এই ভদ্রলোক আপনার উপপতি?

—অস্বীকার করি না।

কমিশনার তখন উভয়ের বক্তব্য তাঁর নোট বইতে লিখে নিলেন।

ম্যাথু এবার তার গ্রেট কোটটা গায়ে চাপিয়ে কমিশনারের দিকে তাকিয়ে বললে—আমি এবার যেতে পারি কি?

এর উত্তরে দুরয় বললে—না, না, তুমি যাবে কেন? আমরাই বরং চলে যাচ্ছি। তোমাদের সুখের পথে আর বাধা হতে চাইনে আমি। চলুন কমিশনার।

এই বলে কমিশনারকে এক রকম টেনে নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দুরয়।

বাইরে এসে কমিশনারকে বিদায় দিয়ে দুরয় সোজা চলে গেল ফ্রানচাইস অফিসে। সেখানে তখন পুরোদমে কাজ চলছে।

অফিসে যেতেই ওয়াল্টারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার। কি একটা বিশেষ কাজে অফিসেই ছিল সে। দুরয়কে দেখে সে বলে উঠলো—কি ব্যাপার বেল-আমি! হঠাৎ এতো রাত্রে?

—হ্যাঁ, একটা বিশেষ খবর ছাপার ব্যবস্থা করতে আসা দরকার হয়ে পড়লো আমার।

—কি এমন বিশেষ খবর যার জন্যে আপনাকে ছুটে আসতে হলো?

—খবরটা পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্পর্কে। মশিয়ে লারোচ ম্যাথু আর মন্ত্রীসভায় থাকছেন না।

—কি আবোল-তাবোল বকছেন! কি হয়েছে মশিয়ে ম্যাথুর?

—হয়নি বিশেষ কিছু। এইমাত্র পুলিশ কমিশনার তাঁকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যাভিচার-রত অবস্থায় দেখে এসেছেন। চার্জও তৈরী হয়ে গেছে এতক্ষণ।

মশিয়েঁ ওয়াল্টার একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল দুরয়ের কথা শুনে। অন্য-মনস্কভাবে চোখ থেকে চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে সে বললে—আপনি তামাশা করছেন না তো?

দুরয় বললে—এটা কি তামাশা করবার মতো ব্যাপার? যাই হোক, খবরটা আমি লিখে ফেলছি। অন্য কাগজে বের হবার আগেই খবরটা আমরা প্রকাশ করতে চাই।

ওয়াল্টারের হতভম্ব ভাবটা তখনও পুরোপুরি কাটেনি। সে তাই দুরয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো—আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে কি করবেন তাহলে?

দুরয় বললে—বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করা ছাড়া আর কি করবার আছে আমার?

এই কথা বলেই দুরয় তার নিজের কামরার দিকে চলে গেল।

॥ সতেরো ॥

তিন মাস পরের কথা।

ইতিমধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় ডিক্রি পেয়েছে দুরয়।

ম্যাডেলিন এখন আবার মাদাম ফরেস্তিয়েরের নাম গ্রহন করেছে।

এই সব ব্যাপারে মশিয়েঁ ওয়াল্টারও বেশ একটু মন-মরা হয়ে পড়েছে। সে তাই স্থির করেছে যে, আগামী ১৫ই জুলাই সপরিবারে একটা পল্লীগ্রামে গিয়ে কিছুদিন বাস করে আসবে সেখানে। কিন্তু তার আগে একটা দিন শহরের বাইরে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসবে বলে স্থির করলো।

পূর্ব ব্যবস্থামতো বৃহস্পতিবার সকাল ন'টায় ওরা বাড়ি থেকে বের হলো। চার ঘোড়ার একটা বিরাট ল্যাণ্ডোতে যাচ্ছে ওরা। ওরা মানে, সস্ত্রীক মশিয়েঁ ওয়াল্টার, তার দুই মেয়ে রোজ আর সুজান, মশিয়েঁ দুরয় আর রোজের ভাবী বর কাউণ্ট দে ল্যাতোর।

দুপুরের আগেই শহর ছাড়িয়ে পল্লী-অঞ্চলে এসে গেল গাড়িটা। অবশেষে পেকি নামক একটা পল্লীগ্রামে এসে ওরা গাড়ি থামালো। কথা হলো, ওখানেই লাঞ্চ খাওয়া হবে।

লাঞ্চের পরে প্যারীতে ফিরবার আয়োজন শুরু হলে দুরয় বললে—এখানে

যখন আসাই হলো তখন পাহাড়ের ওপরে একবার ওঠা দরকার। ওখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যটা দেখবার মতো।

তুরয়ের প্রস্তাবে সবাই খুশি হয়ে সায় দিল। সবাই মিলে তখন উঠে এলো পাহাড়ের ওপরে। সেখানে উঠে চারিদিকের দৃশ্য দেখে ওয়াণ্টার খুশি হয়ে বললে—এ রকম সুন্দর দৃশ্য সুইজারল্যাণ্ডেও বড় একটা দেখা যায় না।

জায়গাটা একটা উপত্যকার মতো। ওখানে গিয়ে সবাই যখন আলাপ আলোচনা করছে সেই সময় সুজানের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তুরয় একটু দুরে সরে গেল। সেখানে গিয়ে তুরয় বললে—তোমাকে ভালবেসে আমি একেবারে পাগল হয়ে গেছি, সুজান।

এর উত্তরে সুজান বললে—আমিও।

—তোমাকে না পেলে আমি প্যারী ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবো।

—বাবাকে বলো না!

—তাতে কোনোই লাভ হবে না। তোমাকে তো পাবোই না, মাঝখান থেকে আমার চাকরিটাও যাবে। তোমার বাবার ইচ্ছে, মার্কুইস দে ক্যজলোর সঙ্গেই তোমার বিয়ে দেবেন।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। ও লোকটাকে আমি দু'চোখে দেখতে পারিনে। কিন্তু কি করা যায় বলোতো?

—বলতে পারি, কিন্তু তাতে একটু বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে তোমাকে।

—কি রকম বিপদ?

—বেশ একটু গুরুতর রকমই। তুমি যদি দুই তিন দিনের জন্তে আমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে রাজী থাকো তাহলে সহজেই এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। তোমার বাবা যদি বুঝতে পারেন যে, তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে গেছো তাহলে লোকলজ্জার ভয়ে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে বাধ্য হবেন তিনি।

—আমি রাজী। কবে পালাতে চাও?

—আজই রাত্রে। কিন্তু তুমি শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যাবে না তো? এতে কিন্তু বিরাট ঝুঁকি নিতে হবে তোমাকে। বিপদও আছে।

—তা থাক। আমি মন ঠিক করে ফেলেছি।

—তুমি একা বাড়ি থেকে বের হতে পারবে কি?

—পারবো।

—বেশ তাহলে আজ রাত বারোটা থেকে একটার মধ্যে প্লেস দে লা

কনকর্দ-এর সামনে এসো। আমি গাড়ি নিয়ে তোমার জন্তে অপেক্ষা করবো ওখানে।

—ঠিক আছে। আমি যাবো।

এই সময় মাদাম ওয়াণ্টার হঠাৎ দেখতে পেলো যে, স্থজান দুরয়ের সঙ্গে কি সব আলোচনা করছে। সে তখন মেয়ের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে তাকে ডাকলো—স্থজান এদিকে এসো।

স্থজান তখন আর দেরি না করে মায়ের কাছে এসে গেল। দুরয়ও এসে যোগ দিল পার্টির সঙ্গে। পার্টির লোকেরা তখন ছুটিতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে থাকবার কথা আলোচনা করতে লাগলো। দুরয় কিন্তু সে আলোচনায় যোগ দিল না। তার মনের মধ্যে তখন রাত বারোটা থেকে একটার মধ্যে কি হবে সেই কথাটাই ঘুরপাক খাচ্ছে।

কিছুক্ষন পরেই প্যারীর দিকে ফিরে চলল ওরা। বাড়িতে ফিরে ওয়াণ্টার দুরয়কে তার ওখানেই ডিনার যেতে বললো। দুরয় কিন্তু রাজী হলো না তাতে। সে তাড়াতাড়ি বাড়িতে এসে সামান্ত কিছু খেয়ে কাগজপত্র নিয়ে বসলো। প্রথমেই সে দু'খানা চিঠি লিখলো। তারপর কিছু কাগজ পোড়ালো এবং কিছু দরকারী কাগজ ড্রয়ারে বন্ধ করলো।

এই সব কাজ করতেই রাত এগারোটা বেজে গেল। সে তখন তাড়াতাড়ি একটা স্থটকেস গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো।

রাস্তায় এসে একখানা গাড়ি ভাড়া করে সে যখন প্লেস দে লা কনকর্দ-এর সামনে হাজির হলো তখন রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। সে তখন গাড়িটাকে থামিয়ে স্থজানের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

একটু পরেই বারোটার ঘণ্টা বাজলো। তারপর একটাও বেজে গেল। কিন্তু তখনও স্থজান এলো না দেখে দুরয়ের মনে হলো যে, ও বোধ হয় আসবে না। সে যখন এই কথা ভাবছে সেই সময় একখানা গাড়ি আসতে দেখা গেল। গাড়িটা দুরয়ের গাড়ির কাছাকাছি এলেই তার ভেতর থেকে স্থজানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল দুরয়—বেল-আমি আছো কি?

দুরয় তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে—স্থজান!

—হুঁ। আমি।

—গাড়ি থেকে নেমে এই গাড়িতে উঠে এসো।

দুরয়ের কথামতো স্থজান গাড়ি থেকে নেমে দুরয়ের গাড়িতে উঠে এলো

তার পাশে বসে পড়লো। ভয়ে আর উত্তেজনায় তার সারা দেহ তখন থর থর করে কাঁপছে।

সুজান বসতেই হুয়য় গাড়োয়ানকে গাড়ি চালাতে বললো। সঙ্গে সঙ্গেই চলতে শুরু করলো গাড়িটা।

গাড়ি চলতে শুরু করলে হুয়য় বললে—এবার সব কথা বলোতো।

সুজানের অবস্থা তখন সাংঘাতিক। প্রায় মূর্ছা যাবার অবস্থা তার। সে তাই হুয়য়ের গায়ে গা ঠেকিয়ে বললে—ব্যাপার গুরুতর। মা তো একেবারে ক্ষেপে গেছে।

—কি হয়েছে খোলাসা করে বলো।

—আমি যখন মাকে বললাম যে, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই তখন মা চিৎকার করে বললেন, "এ কিছুতেই হতে পারে না।" আমিও নাছোড়বান্দা। বললাম, বেল-আমি ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করবো না। মা তখন ভীষণভাবে চিৎকার করে উঠে আমাকে বললেন যে, আমাকে তিনি আবার কনভেণ্টে পাঠিয়ে দেবেন। এদিকে মায়ের চিৎকার শুনে বাবাও তখন এসে গেছেন আমাদের সামনে। সব কথা শুনে তিনি আমাকে বললেন, "বেল-আমি তোমার উপযুক্ত পাত্র নয়।" তিনি আরও কিছু উপদেশ দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

—তারপর?

—তারপরেই আমি পালিয়ে এলাম। কিন্তু আমরা এখন যাচ্ছি কোথায় বেল-আমি?

—আজকের রাতটা সেভারসে কাটাবো। সীন নদীর ধারে একটি সুন্দর গ্রাম ওটা।

—আমি কিন্তু সঙ্গে কিছু আনতে পারি নি।

—তাতে কোনো অসুবিধে হবে না।

এরপর দুজনেই চুপ করে গেল।

একটু পরে সুজান হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। তাকে কাঁদতে দেখে হুয়য় বললে—কাঁদছো কেন, সুজান?

—মার কথা মনে হয়ে কান্না পাচ্ছে আমার।

হুয়য় তখন সুজানের হাতে আলতোভাবে একটা চুমু দিয়ে বললে—কোনো চিন্তা নেই, সুজান। দুদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

এদিকে ওয়াণ্টার-প্রাসাদে তখন গুরুতর ব্যাপার চলছে। সুজান বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে দেখে মশিয়েঁ ওয়াণ্টার বুঝতে পেরেছে যে, দুরয়ই তাকে কুঁসলে নিয়ে গেছে। সে তখন ক্রোধে আত্মহারা হয়ে স্ত্রীকে বললে —তুমিই আস্কারা দিয়ে শয়তানটাকে মাথায় তুলেছো। এবার সামলাও ঠ্যালা।

স্বামীর কথা শুনে মাদাম ওয়াণ্টার বললে—কি বললে! আমি আস্কারা দিয়েছি ওকে!

—শুধু তুমিই নও, তোমার মেয়েরাও আস্কারা দিয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি তোমাদের মুখে কেবলই শুনেছি 'বেল-আমি' আর 'বেল-আমি'! তোমরা কি মনে করো আমি চোখ কান বন্ধ করে ছিলাম?

—এ ধরনের কথা শুনতে আমি অভ্যস্ত নই। আমি তো তোমার মতো শুধু ব্যবসা আর হিসেব নিকেশ নিয়ে থাকি না। সমাজে বাস করতে হলে সবার সঙ্গেই মেলামেশা করতে হয়।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু এখন কি করা যায়? আমার তো মনে হচ্ছে দুরয়ের সঙ্গে সুজানের বিয়ে না দিয়ে উপায় নেই।

—না, এ আমি কিছুতেই হতে দেবো না। আমার এতে মত নেই।

—বোকার মত চেঁচিও না। এখন চেঁচামেচি করে লোক জানাজানি না করে বিয়েটা যাতে হয়ে যায় তাই আমাদের দেখতে হবে। বিয়েটা হয়ে গেলে অন্তত কেলেঙ্কারীর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

মাদাম ওয়াণ্টার কিন্তু স্বামীর কথা শুনতেই চায় না। সে কেবলই বলতে থাকে যে, এ বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না।

মশিয়েঁ ওয়াণ্টার তখন স্ত্রীকে ঠাণ্ডা করার জন্য দুরয়ের গুনকীর্তন শুরু করলো। সে বললে—সুজানের সঙ্গে ওর বিয়ে হলে ভালই হবে। ও যে রকম চালাক-চতুর তাতে শীগগিরই ও মন্ত্রীসভায় নিজের স্থান করে নেবে।

—তা হোক, আমি কিছুতেই সুজানকে ওর হাতে দেবো না।

স্ত্রীর কথায় ওয়াণ্টার এবার রেগে গেল। সে বললে—তুমি একটা হস্তী-মূর্খ। শুধু তুমি নও, দুনিয়ার সব স্ত্রীলোকই মূর্খ। তারা সব সময় আবেগে চলে, যুক্তির ধার ধারে না। শোনো, আমি আবার বলছি, সুজানকে বেল-আমির হাতেই দিতে হবে। এ ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

এই কথা বলেই ওয়াণ্টার নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

মাদাম ওয়াল্টার কিছুক্ষণ স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো। তার চিন্তাশক্তি তখন সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরে চিন্তাশক্তি ফিরে পেয়ে সে নিজের মনেই বলতে লাগলো—হায় ভগবান! এ কি সর্বনাশ হলো। কিন্তু আমি এখন কি করি? কার কাছে যাই? কে আমাকে সৎ পরামর্শ দেবে?

হঠাৎ তার মনে হলো সেই ধর্মযাজকের কথা। তাঁর কাছে গিয়ে নিজের প্রাণের কথা খুলে বললে তিনি হয়তো এ বিয়ে বন্ধ করে দিতে পারবেন। কিন্তু তিনি যদি কিছু না করতে পারেন? না, তিনি পারবেন না এ বিয়ে বন্ধ করতে। তার চেয়ে বরং প্রভু যীশুখ্রীষ্টের কাছে যাই। এখন যীশুখ্রীষ্টই আমার একমাত্র ভরসা।

এই কথা মনে হতেই সে একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে ছবি-ঘরের দিকে ছুটলো। সেখানে গিয়ে যীশুর মুখের দিকে তাকালো সে। কিন্তু একি ব্যাপার! যীশুখ্রীষ্টের মুখখানি যে অবিকল বেল-আমির মতো!

মাদাম যীশুকে ডাকতে গেল। কিন্তু তার মনের মধ্যে তখন ভেসে উঠলো দুরয় আর সুজানের ছবি। 'একটা ছোট ঘরে ওরা দুটিতে পাশাপাশি বসে আছে, পাশে একটা বিছানা। এরপর দেখা গেল যে, দুরয় আলিঙ্গন করছে সুজানকে। নিদারুন আক্রোশে সুজানের চুলের মুঠি ধরে ছিনিয়ে আনতে গেল মাদাম। এই তো সে ধরে ফেলছে সুজানকে! কি একি! তার হাতখানা যে ছবির ক্যানভাসের ওপরে!

হঠাৎ দৃশ্য পরিবর্তন হলো। মাদাম দেখতে পেলো যে, দুরয় আর সুজান এসে দাঁড়িয়েছে যীশুর সামনে এবং প্রভু যীশু তাঁর ডান হাতখানা প্রসারিত করে ওদের আশীর্বাদ করছেন।

সঙ্গে সঙ্গে মাদামের সারা দেহ থর থর করে কেঁপে উঠলো। জ্ঞান হারিয়ে ছবির সামনে পড়ে গেল সে।

পরদিন বাড়ির একজন চাকর মশিয়ে ওয়াল্টারের কাছে খবর দিল যে, মাদাম ওয়াল্টার ছবিঘরে অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াল্টার সেখানে গিয়ে হাজির হলো। কয়েকজন পরিচারিকাও গেল তার সঙ্গে। ওরা সবাই মিলে ধরাধরি করে মাদামকে তার শোবার ঘরে নিয়ে এলো।

তখনও তার জ্ঞান ফেরেনি।

মাদামের জ্ঞান ফিরলো পরের দিন। মশিয়ে ওয়াল্টার ইতিমধ্যে

দাস-দাসীদের বলছে যে, কনভেণ্ট থেকে জরুরী খবর পেয়ে সুজানকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সেই দিনই দুরয়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলো ওয়াল্টার। চিঠিতে সে যা লিখেছে তার সারমর্ম এইরকম :

"আমি বহুদিন থেকেই সুজানকে ভালবাসি। সেদিন সুজান আমাকে বিয়ে করার কথা বললে আমি তাতে সম্মত হই। কিন্তু আমি জানি যে, এ বিয়েতে আপনি এবং আপনার স্ত্রী কিছুতেই সম্মতি দেবেন না। আমি তাই সুজানকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। সে এখন আমার কাছেই আছে। এখন আমাদের বিয়েতে সম্মতি দেবেন কিনা সেটা আপনাকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। তবে মনে রাখবেন আপনার সম্মতি না পেলেও সুজানকে আমি বিয়ে করবো। আইনের চোখে আপনার সম্মতির চেয়ে সুজানের ইচ্ছেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ চিঠির উত্তর তাড়াতাড়িই দেবেন, কারণ আপনার চিঠি পাবার পর আমরা আমাদের পরবর্তী কর্তব্য স্থির করবো। চিঠির উত্তর আমার এক বন্ধুর কাছে পাঠাবেন। বন্ধুর ঠিকানা এই সঙ্গে দেওয়া হলো। আমি তার কাছ থেকে আপনার চিঠিখানা নিয়ে আসবো।"

মশিয়ে ওয়াল্টার সেই দিনই দুরয়ের চিঠির উত্তর দিল। চিঠিতে সে জানিয়ে দিলো যে, সুজানের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে সে সম্মত আছে। সুতরাং সে যেন অবিলম্বে সুজানকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

চিঠিপত্রের আদান প্রদানে ছয়টি দিন কেটে গেছে। এই ছয় দিন দুরয় আর সুজান সীন নদীর তীরে একটি অখ্যাত গ্রামে বসবাস করেছে। গ্রামের লোকদের কাছে সুজানকে বোন বলে পরিচয় দিয়েছে দুরয়। নিজেদের আসল নামও তাদের কাছে প্রকাশ করেনি। দুজনেই ছদ্মবেশে এবং ছদ্ম নামে বাস করেছে সেখানে। দুরয় সেজেছে এক গ্রাম্য তরুণ এবং সুজান সেজেছে মেষপালিকা। সারাদিন ওরা মাছ ধরে এবং নৌকায় করে বেড়িয়ে বেড়িয়েছে। রাত্রে অবশ্য এক ঘরেই কাটিয়েছে দু'জনে।

মশিয়ে ওয়াল্টারের চিঠিখানা যখন দুরয়ের হাতে এলো তখন ছয় দিন পার হয়ে গেছে। চিঠিখানা পেয়ে দুরয় বুঝতে পারলো যে, তার আশা পূর্ণ হয়েছে। সে তখন সুজানকে বললে—তোমার বাবা আমাদের বিয়েতে সম্মতি দিয়েছেন। আগামী কালই আমরা প্যারীতে ফিরে যাচ্ছি।

হুরয়ের কথা শুনে সুজান বললে—এতো তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে? বেশ তো কাটছিল এখানে।

হুরয় বললে—বিয়ের পরে আরো ভালভাবে দিন কাটবে আমাদের।

॥ আঠারো ॥

রুয়ে দে কনস্টান্টিনোপল-এর সেই ফ্লাটে প্রায় একই সঙ্গে ঢুকে পড়লো হুরয় আর ক্লতিলদে। ঘরে ঢুকেই ক্লতিলদে আক্রমণাত্মক স্বরে হুরয়কে বললে—শেষ পর্যন্ত সুজানকে নিয়ে পড়লে!

কথাটা শুনে হাসতে লাগলো হুরয়। তার হাসি দেখে পিত্তি জ্বলে উঠলো ক্লতিলদের। রাগত চোখে হুরয়ের দিকে তাকিয়ে সে বললে—তুমি একটা পাষণ্ড।

—রাগ করছো কেন ডার্লিং! বিয়ে করছি তাতে দোষের কি হয়েছে? ব্যাভিচারিনী বউ নিয়ে তো ঘর করা চলে না।

ক্লতিলদে আরও রেগে গেল হুরয়ের কথায়। রুক্ষ স্বরে সে বললে—তুমি যে এতো বড় শয়তান আর ধড়িবাজ তা আগে জানলে ··

তার কথায় বাধা দিয়া হুরয় বললে—যা মুখে আসছে তাই বলছো যে! মুখটা একটু সামলে কথা বলো।

—কি বললে! মুখ সামলে কথা বলবো? তুমি একটা প্রতারক। নিজের সুখ আর অর্থ ছাড়া আর কিছু তুমি জানো না। আমি আবার বলছি তুমি একটা বেইমান, জোচ্চোর এবং লম্পট।

এতক্ষণ হুরয় বসেই ছিল। এবার সে তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—তুমি যদি ভদ্রভাবে কথা বলতে না পারো তাহলে তোমাকে আমি ঘর থেকে বের করে দিতে বাধ্য হবো।

—কি বললে! বের করে দেবে আমাকে? এটা কার ফ্লাট? কে এটা ভাড়া নিয়েছিল? মাসের পর মাস কে এর ভাড়া গুনেছে? আমাকে তুমি যেভাবে তোমার শয্যা-সঙ্গিনী করে আমার অর্থ দোহন করেছো, সুজানকেও তুমি সেইভাবেই অঙ্কশায়িনী করে তোমাকে বিয়ে করতে তার সম্মতি আদায় করেছো।

হুরয় আর সহ্য করতে পারলো না। হঠাৎ সে ক্লতিলদের কাঁধটা ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে—খবর্দার! সুজানের নাম তুমি মুখে আনবে না।

—নিশ্চয় আনবো। তুমি তার ইজ্জৎ নষ্ট করেছো।

—চোপরও বেহায়া! সুজান তোমার মতো বাজারের মেয়ে নয়।

—তবে রে শয়তান! আমি বাজারের মেয়ে? এ কথা তোর মতো লম্পট ছাড়া আর কে বলতে পারে? মেয়েদের সর্বনাশ করাই তোর পেশা। ফাঁদ পেতে তুই মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলিস। সুজানের ইজ্জৎ নষ্ট করে আজ তাকে বিয়ে করতে চলেছিস।

তুরয় আর রাগ সামলাতে না পেরে ঠাস করে একটা চর মারলো ক্লতিলদের গালে। চড়টা এত জোরে মারলো যে, ক্লতিলদে টাল সামলাতে না পেরে দেয়ালের গায়ে গিয়ে পড়লো। তুরয় যে তাকে এই ভাবে আঘাত করবে এ কথা সে ভাবতেও পারে নি। সে তখন রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চিৎকার করে বললে—তুই সুজানের ইজ্জৎ নষ্ট করেছিস এ কথা আমি সবাইকে শুনিয়ে বলবো।

এবার আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলো না তুরয়। সে ছুটে গিয়ে ক্লতিলদেকে এমন এক ঘুষি মারলো যে, সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মেঝের ওপরে। তুরয় কিন্তু তখনও তাকে রেহাই দিল না। সেই অবস্থায়ই তাকে সে কীল চড় আর ঘুষি মারতে লাগলো। মারের চোটে ক্লতিলদে মেঝের ওপরে পড়ে কাত্‌রাতে লাগলো।

তুরয় তখন পেটানি থামিয়ে শোবার ঘরে চলে গেল। সেখানে গিয়ে বেসিনের জলে মাথাটা ধুয়ে নিয়ে তোয়ালে দিয়ে ভাল করে মুছে ফেললো। তারপরে আবার বাইরের ঘরে ফিরে এসে বললে—কি, কান্না থামাবে এবার?

ক্লতিলদে তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তুরয়ের কথায় কোনো উত্তর দিল না সে।

তুরয় তখন তার টুপিটা টেনে নিয়ে মাথায় দিয়ে বললে—গুড নাইট! এবার আমি চললাম। তোমার জন্যে আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না।

বাইরে এসে তুরয় বাড়ির দরোয়ানের হাতে ফ্লাটের চাবিটা দিয়ে বললে—বাড়ির মালিককে বলো আগামী ১লা অক্টোবর থেকে ফ্লাটটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আজ ১৬ই আগস্ট। নোটিশ সময়মতোই দেওয়া হলো।

* * *

বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। আর মাত্র চারটি দিন বাকি। ২০শে অক্টোবর প্যারীর বিখ্যাত প্রোটেস্টান্ট চার্চে বিয়ে হবে।

এদিকে মাদাম ওয়াল্টারের অবস্থা তখন আরও খারাপ হয়ে পড়েছে। বিয়ের তারিখ স্থির হবার পর থেকেই তার শরীরটা ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছে। এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে, সারাদিন সে ঘর থেকেই বের হয় না। তার মাথার চুলগুলোও একেবারে সাদা হয়ে গেছে। তার এখন একমাত্র কাজ হয়েছে প্রতি রবিবার চার্চে গিয়ে উপাসনা করা।

এদিকে ফ্রানচাইস পত্রিকায় ঘোষণা প্রচার করা হয়েছে যে, এখন থেকে ব্যারণ ডুরয় দে ক্যানতেল ফ্রানচাইস পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হলেন। মশিয়েঁ ওয়াল্টার শুধু ডিরেক্টর রইলেন।

বিয়ের দিন এসে গেল।

সেদিন সকাল আটটা থেকেই তোড়জোড় শুরু হলো চার্চে। এখানে কোনো বড় রকমের অনুষ্ঠান হচ্ছে মনে করে পথচারীরা উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগলো। দেখতে দেখতে ভিড় হয়ে গেল সেখানে। অবশেষে এমন অবস্থায় সৃষ্টি হলো যে, ভিড় সামলাবার জন্যে পুলিশের সাহায্য নিতে বাধ্য হলো চার্চের ফাদাররা।

বেলা এগারোটার পর থেকেই নিমন্ত্রিতের দল আসতে শুরু করলো। প্যারীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সবাই নিমন্ত্রিত হয়েছিল বিয়েতে। তারা যে যার গাড়িতে করে আসতে লাগলো। দেখতে দেখতে চার্চের হল ঘরের চেয়ারগুলি প্রায় ভরতি হয়ে গেল।

বেলা প্রায় বারটার সময় কবি নবার্ত দে ভার্ন এলো। সে আসতেই মশিয়েঁ রিভ্যাল এগিয়ে গেল তার কাছে। নবার্ত হঠাৎ মন্তব্য করে বসলো—এখন দেখছি দুষ্ট বদমাইসদেরই জয়জয়কার।

রিভ্যাল বললে—আমি কিন্তু ডুরয়কে বদমাইস বলে মনে করি নে। তবে সে যে চালাক লোক এটা স্বীকার করতেই হবে। যাই হোক, ম্যাডেলিনের খবর কিছু জানেন কি?

—শুনলাম সে নাকি এখন কোনো এক পল্লীঅঞ্চলে অবসর জীবন-যাপন করছে। তবে আমার কিন্তু মনে হয় সে এখন প্লুম পত্রিকায় কাজ করছে। ওই পত্রিকায় এমন সব প্রবন্ধ বের হচ্ছে যেগুলির ভাষা এবং বর্ণনাভঙ্গি অবিকল ফরেস্তিয়ের আর ডুরয়ের প্রবন্ধের মতো। এই সব প্রবন্ধ বের হচ্ছে 'লি দল-এর' নামে। আমি আরও শুনেছি যে, লি-দল-এর সঙ্গে

ম্যাডেলিনের একটা সমঝোতা হয়েছে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে স্বামী-স্ত্রীরূপে দেখা যাবে ওদের।

নবার্তের কথা শুনে রিভ্যাল বললে—মেয়েটার ট্যালেণ্ট আছে এটা স্বীকার করতেই হবে।

নবার্ত বললে—ট্যালেণ্ট না থাকলে কি ভাত্রেক আর লারোচ ম্যাথু শুধু শুধু ওর পেছনে ঘুর ঘুর করতো!

—ও কথা যাক। এবার বলুন তো, ম্যাজেলিনের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে ত্যুরয় আবার চার্চে বিয়ে করবার সুযোগ পাচ্ছে কি করে?

—এ খবরটা জানেন না বুঝি?

—না তো!

—তা হলে শুনুন। ম্যাডেলিনের সঙ্গে ত্যুরয়ের যে, বিয়ে হয়েছিল সে বিয়েকে বিয়ে বলে স্বীকারই করেন না ধর্মযাজকরা।

—কেন বলুন তো?

—ওদের বিয়ে হয়েছিল টাউন হলে। ধর্মীয় বা সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানও হয়নি সে বিয়েতে। চার্চের আইনে এরকম বিয়ে বিয়েই নয়।

—আচ্ছা, আপনার তো ওয়াল্টার-ভবনে যাতায়াত আছে। শুনেছি মাদাম ওয়াল্টার নাকি ত্যুরয়ের সঙ্গে কথা বলেন না। কথাটা কি সত্যি?

—হ্যাঁ, এটা খুবই সত্যি। মাদামের এ বিয়েতে মত নেই। কিন্তু তাঁর স্বামীকে হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে ত্যুরয়। ওয়াল্টার এখন লারোঁচের দুর্দশার কথা মনে করে ত্যুরয়কে চটাতে চান না। চটালে ও হয়তো মরোক্কোর ব্যাপারটা ফাঁস করে দেবে, এবং তা করলে ভীষণ ফ্যাসাদে পড়বেন মশিয়েঁ ওয়াল্টার।

ওদের যখন এইসব কথাবার্তা হচ্ছে সেই সময় চার্চের পেটা ঘড়িতে তিনটে ঘা পড়লো। এর মানে হলো, কনে আসছে চার্চে।

একটু পরেই মশিয়েঁ ওয়াল্টার এবং চারজন সহচরীর সঙ্গে সুজান প্রবেশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে অর্গান বেজে উঠলো। সুজান তার মাথাটা একটু নিচু করে এগিয়ে আসছে। তাকে দেখে অনেকেই বলে উঠলো—বাঃ, খাসা মেয়ে! সুজানের পাশেই আসছে মশিয়েঁ ওয়াল্টার। তার মুখখানা বেজায় গম্ভীর।

এর পরেই দেখা গেল মাদাম ওয়াল্টারকে। সে তার বড় জামাই মার্কুইস দে লেওর ম্যেডালিনের বাবার হাত ধরে আসছে। বেচারা ঠিকমতো

হাঁটতেও পারছে না। পা দুটি যেন আটকে আটকে যাচ্ছে। কোনো দিকে সে তাকাচ্ছে না।

এর পরেই বর এলো। তাকে নিয়ে এলো এক অপরিচিতা বৃদ্ধা মহিলা। স্থির পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে সে।

পুরোহিতের নির্দেশে সে কনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

এরপরেই আসতে লাগলো দুরয়ের বন্ধু-বান্ধবরা। দেখতে দেখতে হলঘর একেবারে ভরতি হয়ে গেল।

অর্গান বেজেই চলেছে। চার্চের ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পুরোহিতের কাজ করছেন ডানজিয়ারের নতুন বিশপ। তিনি একটা ক্রশ হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে বর কনেকে বেদীর সামনে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলো দু'জনে। বিশপ তখন কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন বর-কনেকে। বর-কনে নত মস্তকে তাঁর প্রশ্নগুলির উত্তর দিল। এরপর তিনি বর আর কনের আংটি বদল করে পরমপিতা পরমেশ্বরের নামে দু'জনকে এক মধুর বন্ধনে বেঁধে দিলেন।

এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে মাদাম ওয়াল্টার হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। তার অবস্থা দেখে একজন মহিলা তার পার্শবর্তিনী অপর এক মহিলাকে বললে —কনের মা দেখছি পাগল হয়ে গেছেন!

এদিকে বিশপ তখন দুরয়ের উদ্দেশে আশীর্বাণী উচ্চারণ করে চলেছেন:

"ধনে মানে প্রতিভায় আপনি সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। আপনি সাংবাদিক। সাংবাদিক হিসেবে মহান কর্তব্য রয়েছে আপনার সামনে। জনগণকে শিক্ষা দেওয়া, উপদেশ দেওয়া এবং সঠিক পথে চালনা করাই আপনার ব্রত। এই ব্রত আপনি যথাশক্তি পালন করবেন।"

বিশপের কথা শুনে দুরয় রোমাঞ্চিত হয়। তার কেবলই মনে হতে থাকে, এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে ঠেলে উপরে তুলে দিচ্ছে। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় বাবা-মার কথা। সে যেন মানস-চক্ষে দেখতে পায়, এই সময় তাঁরা গ্রামের চাষী আর মেহনতী মানুষদের পানীয় পরিবেশন করছেন।

ভাত্রেকের কাছ থেকে সে যা পেয়েছে তা থেকে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ সে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে বাবার কাছে। এবার সে আরও পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ পাঠাবে। তাহলে ওঁরা ছোট-খাটো একটা জমিদারি কিনে সুখে দিন কাটাতে পারবেন

বিশপের বক্তৃতা শেষ হতেই উচ্চনাদে অর্গান বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সমাগত নরনারীর আনন্দ-উচ্ছ্বাস যেন চার্চের ছাদ ভেদ করে উন্মুক্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়লো।

বাজনা থেমে গেল। এরপর শুরু হলো ধর্ম-সঙ্গীত। সঙ্গীত শেষ হলে বিশপ আশীর্বাদ করলেন নব দম্পতিকে।

হৃদয় তার নব পরিণীতা স্ত্রীর সঙ্গে নতজানু হয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করলো। হৃদয় যেন হঠাৎ আজ ধর্মপ্রাণ হয়ে পড়েছে। কার দয়ায় তার জীবনে এই সাফল্য এসেছে, এটা ভাল করে না বুঝলেও সে মনে মনে তাকে ধন্যবাদ জানালো। কিন্তু কাকে সে ধন্যবাদ জানালো তা হয়তো সে নিজেও জানে না।

চার্চের অনুষ্ঠান শেষ হলো। হৃদয় তখন তার নবপরিণীতা পত্নীকে বাহুবদ্ধ করে বেরিয়ে চলেছে বাইরের দিকে। এই সময় হঠাৎ মাদাম মোরেলকে দেখতে পেলো সে। ওদের চলার পথের পাশেই মাদাম মোরেল দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখে হৃদয়ের বুকটা কেঁপে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে অতীত দিনের কথাগুলি মনে পড়লো তার। কত দিনের কত মধুর মিলন, কত চুম্বন, কত আদরের কথা, কত আবদার—সব কিছু একে একে মনে পড়তে লাগলো তার। ওর ওষ্ঠের স্বাদ যেন এখনও লেগে আছে তার জিহ্বায়। এসব কথা মনে পড়ায় হৃদয় হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়লো।

মাদাম মোরেল ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো হৃদয়ের সামনে। তারপর মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। হৃদয় কম্পিত বক্ষে অথচ খুশি মনে করমর্দন করলো। ওর হাতের কোমল স্পর্শে হৃদয়ের মনে হলো যে, ও তাকে ক্ষমা করেছে। সঙ্কোচ কেটে গেল তার। এরপর উভয়ে উভয়ের দিকে হাসিমুখে তাকালো। মাদাম মোরেল মধুমাখা কণ্ঠে বললে—আ রেভা বেল-আমি।

হৃদয়ও উত্তর দিল আ-রেভা বলে।

এর পরেই মাদাম মোরেল সরে পড়লো ওখান থেকে। সে সরে যেতেই দলে দলে লোক আসতে লাগলো বর কনেকে অভিনন্দন জানাতে।

সুজানকে বাহুবদ্ধ করে সারিবদ্ধ নরনারীর ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে হৃদয়। তার মনশ্চক্ষে তখন ভেসে উঠছে অতীত দিনের একটি ছবি—ঘুম থেকে উঠে ক্লতিলদে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করছে।'